তিয়ান আন মেন স্কোয়ারের রক্তপাত ও অতঃপর!

মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা

আলোকপাত

আগস্ট ১৯৮৯ ● মূল্য ৬·০০

যাদুবিদ্যার শক্তি!

মোহনবাগান: কিস্‌সা কুরশি কা!

পাশ্চাত্য নাচের স্কুলগুলিকে ঘিরে সন্দেহ

রামকৃষ্ণ মিশনের মহাজীবন

ভরত মহারাজ: ত্যাগব্রতের ৮০টি বছর

বহুতল বাড়ি দুর্ঘটনা: হাইরাইজ কলকাতার দুর্ভাবনা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

৪র্থ বর্ষ * সপ্তম সংখ্যা * আগস্ট ১৯৮৯

আলোকপাত

প্রধান সম্পাদক: আলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক: রমাপ্রসাদ ঘোষাল
সহ সম্পাদক: প্রদীপ বসু
উপ সম্পাদক: গুরুপ্রসাদ মহান্তি
সংবাদদাতা
দিল্লি: পুষ্কর পুষ্প
হায়দরাবাদ: পারভেজ খান
মাদ্রাজ: লক্ষ্মী মোহন
লণ্ডন: বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন: শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস: আফসান সফি
বম্বে ব্যুরো প্রধান: রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী: বিকাশ চক্রবর্তী
ভিস্যুয়ালাইজার: শান্তনু মুখার্জি
দিল্লি কার্যালয়:
সঞ্জয় লাল: ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক
৩০৫ রোহিত হাউস, ৩ তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি–১১০০০১
দূরভাষ: ৩৩১৪৫৩০
টেলেক্স: ০৩১ ৬৭১৫ নিউজ'ইন
বম্বে কার্যালয়:
অনুপ জুৎসি: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৮১০ এমব্যাসি সেন্টার
নরীম্যান পয়েন্ট
বম্বে–৪০০০২১
দূরভাষ: ২৪৩৫৭৭, ২৪৪৮৪৬
টেলেক্স: ০১১ ২৫৫৭ মায়া ইন
লখনউ কার্যালয়:
বি–১০৩, গোপালা অ্যাপার্টমেন্টস,
৫০, রামতীর্থ মার্গ, হজরতগঞ্জ, লখনউ–২২৬০০১
দূরভাষ: ৩৬২৬২/৩৪৪৭৭
ব্যুরো প্রধান: অজয় কুমার
কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয়:
স্টিফেনস কোর্ট
ফ্ল্যাট–৫ এ (পাঁচতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা–৭০০০১৬
দূরভাষ: ২৯০৩৫, ২৯৮৫৪০, ২৯৭৮২৮
টেলেক্স: ০২১ ৫১৭৩, নিউজ ইন
আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক: অমিত সেন
প্রধান কার্যালয়:
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ: ৫৩৬৮১, ৫১০৪২, ৫৫৮২৫, ৫৫৭৭৩
গ্রাম: মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স: ০৫৪–২৮০
প্রকাশক: দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ–২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে অশোক মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং: মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ–এর একটি ইউনিট– সুরুচি অফসেট।

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY
for Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Shilong, Kathmandu and Agartala

সূচীপত্র

পশচাদপট পৃষ্ঠা-৪

ভবানীপুরের ভেঙ্গে পড়া বহুতল বাড়ির দুর্ঘটনার পর কলকাতার বহুতল বাড়িগুলো যে দুর্ভাবনার জন্ম দিয়েছে তারই সঙ্গে সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহে আলোকপাত।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন পৃষ্ঠা-৩০

দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দী অনলস সেবাব্রতের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন যে সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মিশনের সেই প্রবীণতম পুরুষ ভরত মহারাজকে নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যাঁর কাছে বারবার ছুটে আসতেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী থেকে শুরু করে মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পর্যন্ত যাঁর শরণাগত হন, সেই মহাজীবনের অজানা অধ্যায়ে আলোকপাত।

বিশেষ প্রতিবেদন পৃষ্ঠা-২৬

চীনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ছাত্রবিক্ষোভের আভ্যন্তরীণ কারণ কি ছিল? চীনা নেতৃত্বের রাজনৈতিক ক্ষমতাবিরোধের বলি হতে হল কি ছাত্র সমাজকে? চীনের বর্তমান অবস্থা কি? একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন।

আদিবাসী ও হিন্দু কি আলাদা?

আমি আলোকপাতের নিয়মিত পাঠক। 'আলোকপাত' জুন '৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'পাঠকের অধিকার' শীর্ষক প্রতিবেদনে বাঁকুড়ার জগন্নাথ হেমব্রমের 'দলমা পাহাড়ের হাতি' বিষয়ক প্রতিবেদনটি পড়ে দুঃখিত হলাম। মার্চ '৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'জলে-জঙ্গলে' দলমা পাহাড়ের হাতি' প্রতিবেদনটির সমালোচনা করতে গিয়ে জগন্নাথ বাবু দু-একটি ভুল মন্তব্য করেছেন। তার জন্য আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মন্তব্যটি এই রকম—'গণেশ ঠাকুর হিন্দুদেরই দেবতা বরং আদিবাসীদের নয়। আমি জানি আদিবাসীরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী নয়; তারা প্রকৃতির পূজা করে।' আদিবাসী ও হিন্দুদের মধ্যে তফাৎ কোথায়? আপনি কি বলতে চাইছেন যে, আদিবাসীরা হিন্দু নয়? আমি গ্রামে বসবাস করি এবং আমাদের গ্রামে ও পার্শ্বের অন্যান্য গ্রামে বহু আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা বসবাস করেন। আমাদের এলাকাতে কয়েকটি আদিবাসী ক্লাব আছে। তাঁরা আনন্দের সঙ্গে কালিপূজা, লক্ষ্মীপূজা সরস্বতী পূজা ইত্যাদি পূজা করে থাকেন। তাহলে আপনি কেন বলছেন যে, আদিবাসীরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী নয়?

শ্রী বিজয় কুমার মাহাতো।
বালরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

ফিলমডম প্রেম অবৈধ নয়

আলোকপাত জুন '৮৯ সংখ্যার ফিলমডম-এ প্রকাশিত 'বম্বে স্টারদের প্রেম বৈধতার সীমা পেরিয়ে'—পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগল প্রেম জিনিসটি কতদূর পর্যন্ত বৈধ হতে পারে; কখন এটা বৈধতার সীমা পেরিয়ে যায়? আসলি প্রেম বলে সত্যি কিছু আছে কি? ইতিহাসে অনেক অমর প্রেমের কাহিনী শুনে এসেছি, কিন্তু এসব ইতিহাসে সবটাই কি সত্য কথা লেখা আছে? প্রতিষ্ঠিত কাহিনীর মধ্যে কোন খাদ নেই নাকি? কোন না কোন স্বার্থ ছাড়া কি প্রেম হতে পারে? আমার তো একদিক দিয়ে মার্কস সাহেবকে খাঁটি মনে হয় যখন তিনি বলেন যে পৃথিবীতে মানুষের সম্পর্ক অর্থনৈতিক বুনিয়াদের দ্বারা নির্ণীত হয়। পুরুষরা মেয়েদের কাছে কি চায়? একটু নৈকট্য, মিলন, মাধুর্য্য ও সেবা। মেয়েরা পুরুষদের কাছে চায় নিরাপত্তা ও বন্ধুত্ব। প্রেমের মূল ভিত্তি আকর্ষণ। নারী পুরুষকে আকর্ষণ করে তার সৌন্দর্য ও কমনীয় ব্যবহারে, দেহ সৌন্দর্য ব্যাভিচারী পুরুষকে আকর্ষণ করে সব থেকে বেশি পরিমাণে। নারী পুরুষের শক্তিমত্তা, বুদ্ধি, সৌন্দর্য, সামাজিক মর্যাদা, বিত্তর যে কোনটি দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে। আকর্ষণের স্থিতিকাল ও সংযত আচরণ ধারার মধ্য দিয়ে প্রেম বৈধ কি অবৈধ তা নির্ণীত হতে পারে। সেক্স দিয়ে মানুষের চিন্তাভাবনা, অস্থিরতা, বুদ্ধিবৃত্তি সব কিছু প্রভাবিত হয়ে থাকে এমন কথাও শোনা যায়। যে যত বড় মহাপুরুষ বলে নিজেকে জাহির করুন না কেন—তিনি যে কোন ভাবে সেক্স বা যৌনতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। আজকালকার যুবকদের মধ্যে আবার আর এক ধরনের কালচারাল এলিট তৈরি হচ্ছে যারা আকর্ষণ ব্যাপারটাকে নিছক বন্ধুত্ব বলে মনে করে। তাই এক চিত্র নায়িকা যদি এক সুপারস্টারকে ছেড়ে অন্য স্টারকে নিয়ে হোটেলে রাত কাটায় তাতে কিছু বলার নেই। ছায়াছবির জগতে ওসব চলতেই পারে; ওসব না চললে নায়ক নায়িকার গ্ল্যামার থাকে না। এখানে বৈধতার প্রশ্নগুলো রঙ্গ রসিকতার মধ্যে ডুবে যায়। আমাদের দেশে প্রেমের ব্যাপারে বৈধতা নিয়ে এত টানাটানি, পাশ্চাত্য দেশে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, অথচ কালচারের বন্যা ওসব দেশে বেশি, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা এখানকার থেকে ভালই।

রমেন্দ্রনারায়ণ দে
দিনহাটা
কোচবিহার

কলকাতার জ্যোতিষ চক্রে জ্যোতিষী চক্রান্ত

জুন '৮৯ সংখ্যা আলোকপাতে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে অনেক খবর জানলাম। কিন্তু ভারতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির ভবিষ্যৎবাণীতে খুশি হতে পারলাম না। জোতিষচক্র কি বিজ্ঞান না অপবিজ্ঞান তা এই বিজ্ঞানের যুগে ভাববার সময় এসেছে। আপনারা জ্যোতিষীদের নিয়ে যে মতামত জানিয়েছেন তার সঙ্গে আমিও কিছু যুক্তিগ্রাহ্য মতামত এই প্রসঙ্গে রাখতে চাই।

জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতিষচর্চার বিরুদ্ধে প্রথম কলকাতাতেই লড়াই শুরু হয় তা নয়, বহুকাল আগে থেকেই সমাজের কিছু বিদগ্ধ মানুষ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু কালের গভীরে যে কুসংস্কারের শিকড় বহুকাল ধরে গেড়ে আছে, তাকে সহজে উৎপাটন করা যাবে না ভেবেই একশ্রেণীর জ্যোতিষী লোক ঠকিয়ে অর্থ উপার্জনের আশায় জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের যুক্তি দেখিয়ে টিকে থাকলেন। মানুষ যত দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয় ততই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি তাদের বিশ্বাস জন্মায়। স্বামী বিবেকানন্দ জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'জ্যোতিষে বিশ্বাস সাধারণতঃ একটি দুর্বল মনের লক্ষণ। সুতরাং মনে এই দুর্বলতা এলেই আমাদের উচিত ডাক্তার দেখিয়ে ভাল ভাবে খাওয়া আর বিশ্রাম করা।'

নব জাগরণের ফলে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত ইউরোপীয় মহাদেশে জ্যোতিষশাস্ত্র ও অপবিজ্ঞানের ধ্বজাধারী ভক্তরা মাথা তুলতে পারেন নি। মানুষের মনোজগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কোপারনিকাস, ব্রুনো, কেপলার, নিউটনের মতো মনীষীদের মতাদর্শে। কিন্তু বিংশশতাব্দীর দুটো বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমাজ সংকটে, পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অবক্ষয়ে, নৈরাশ্যে, হতাশায় মানুষ যখন সব দিক থেকে অস্থির, অসহায়, দিশেহারা ঠিক সেই মুহূর্তে বিজ্ঞান বিরোধী যুক্তিবাদীরা লুপ্তপ্রায় ভুয়াবিদ্যাকে পুনরায় কবর থেকে তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিশেষ না হলেও অনুন্নত ও উন্নতশীল দেশগুলিতে অদৃষ্টবাদীর দল প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেন।

১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে ১৮ জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সমেত ১৮৬ জন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী জ্যোতিষ শাস্ত্রের মোহসৃষ্টিকারী ভুয়া দাবির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এক ইস্তাহারের মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, 'মানুষ নিজের অসহায় অবস্থায় ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে চায়। অন্যের পরামর্শে সুখের সন্ধানে ছোটে। সমস্যার অকুল সমুদ্রে পড়ে ভাবতে চায় পৃথিবীর কোনও অলৌকিক শক্তিই বুঝি তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু পৃথিবীতে সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। এটা বোঝা দরকার, আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের নিজেদের ওপরেই নির্ভর করছে। কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের ওপর নয়।'

জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় সূর্য ও নক্ষত্রের দ্বারা। জ্যোতিষ শাস্ত্রের জন্মলগ্নে দূরবীক্ষণ যন্ত্র, টেলিস্কোপ, গণিত বা বিজ্ঞানের অবিষ্কার না হওয়ায় জ্যোতিষ শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা উভয়েরই অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান ছিল নিম্নমানের। ইউরোপীয় নবজাগরণের কালে কোপারনিকাস, জিওদার্ণ ব্রুনো, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে জ্যোতির্বিদ্যা জ্যোতিষশাস্ত্রের অপবিজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের রূপ পায়।

জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে মানুষের ভাগ্যের শুভাশুভ নির্ধারিত হচ্ছে মহাকাশের কয়েকটি গ্রহ ও নক্ষত্রের দ্বারা। পদার্থবিদ্যার সূত্রের সমর্থন নিয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি ও গুণাবলী মানুষের জীবনে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবের কথা প্রমাণ করার চেষ্টা হলেও বিজ্ঞানের সূত্রের সাথে মিল হচ্ছে না। কেননা জ্যোতিষশাস্ত্রে মাত্র কয়েকটি গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রভাবকে স্বীকার করা হচ্ছে। বস্তুগত গুণাগুণ ও বিকিরণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের কি কোন প্রভাবই নেই? গ্রহনক্ষত্র সম্পর্কেও জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদদের সঠিক ধারণা নেই।

মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মতে সূর্য একটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র একটি উপগ্রহ। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রে সূর্য এবং চন্দ্রকে গ্রহ হিসাবে ধরা হয়েছে। টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পরও ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো গ্রহগুলির স্থান নেই অথচ রাহু ও কেতু নামে দানবরূপী দুটি গ্রহের স্বীকৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রে আজও পাওয়া যায়। বিজ্ঞানে এদের কোন অস্তিত্বই নেই।

পথিক মণ্ডল
নিউ ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা।

প্রধান সম্পাদকের কলমে
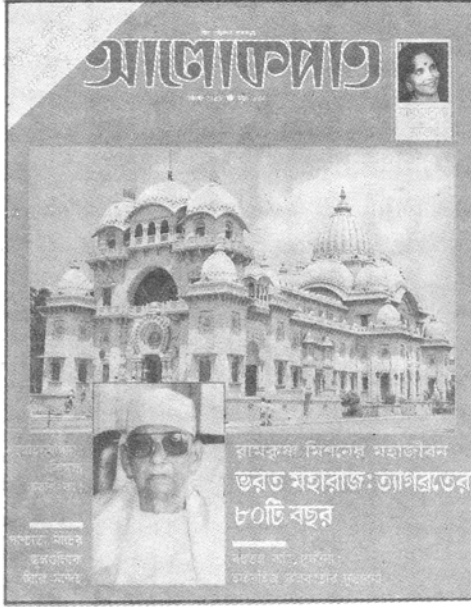
শ্রাবণের ধারাবর্ষণ চলেছে—গ্রাম বাংলার দুর্দশাক্লিষ্ট ছবি কিছু সম্ভাবনাকে উপ্ত করে রাখলেও শহরে রাস্তাঘাট যখন মহানদী তখন কোনও আশু সম্ভাবনাই নজরে আসেনা। বৈচিত্র্যহীনতাও কমে আসে শহরে এ সময়, কদম কেয়ার সৌরভও এখানে নেই—শুধু সার সার জলবন্দী গাড়ি, আমলা আর নেতাদের উতোরচাপান, আশ্বাসবাণী, আলোকশূন্য শহরে একঘেয়েমি আনে। আমাদের পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই অবশ্য এই একঘেয়েমির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অভিনবত্ব বয়ে আনার চেষ্টা করে যায়, যেমন এবারেও।

এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণতম সন্ন্যাসী ভরত মহারাজকে নিয়ে। ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের প্রধান ব্যক্তিত্বগুলি থেকে শুরু করে সাধারণতম মানুষ পর্যন্ত যাঁর আধ্যাত্মিক আশ্রয়ে ছুটে আসেন, ত্যাগব্রতের দিশারী সেই সন্ন্যাসীর জীবন ও জীবনদর্শন নিয়ে একটি বিস্তৃত পরিচয় দানের প্রয়াস করেছে 'আলোকপাত'। রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের বিগত প্রায় এক শতকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই মহাজীবনের অজানা অধ্যায়ের অনুচিত্রণ।

ফরাসী বিপ্লবের দ্বিশতবর্ষপূর্তির বছরটি যেন মুক্তির হাওয়া নতুন করে বয়ে নিয়ে এল বিশ্বের বিস্তীর্ণ এলাকায়। আফ্রিকায়, লাতিন আমেরিকায়, আমাদের এই মহাদেশে—প্রতিবেশি রাষ্ট্র চীনে। চীনের ছাত্রবিক্ষোভের সাগ্নিক দিনগুলো আজ শোকদ স্মৃতির ফ্রেমে বন্দী। তারুণ্যের সেই জলতরঙ্গে নির্মম আঘাত এসেছে অচলায়তন নেতৃত্বের সহযোগী সেনাবাহিনীর বেয়নেটে, বুলেটে, ট্যাঙ্কের উদগ্র চাকায়! কিন্তু মুমুক্ষার, পরিবর্তনাকাঙ্খার, ব্যাপ্তির এই স্বতঃস্ফূর্ত পরিবাহ রোধার ক্ষমতা কি চীনা শাসনের আছে? এই বিক্ষোভের কারণ ও উত্তরাধিকারই বা কি? এনিয়ে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে এই সংখ্যায়।

কলকাতার বহুতল বাড়ি দুর্ঘটনা নিয়ে অনেক সন্দেহ ও সম্ভাবনা উপ্ত হয়েছে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে। প্রদীপ কুন্দলিয়াই কি একমাত্র দায়ী এই দুর্ঘটনার জন্য, নাকি তাঁকে সামনে রেখে নিজেদের বাঁচাতে চাইছেন ক্ষমতাশালী রাঘব বোয়ালেরা? একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

নালন্দার সমকালীন এক বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে, সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে মহেঞ্জোদরোর চেয়েও প্রাচীন এক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম ধর্মের সঙ্গে পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট বালান্দার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আখ্যান শুনিয়েছেন আমাদের প্রতিবেদক।

যাদুবিদ্যার শক্তি নিয়ে অনেক অজানা তথ্য বিবৃত করেছেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ডাকিনীবিদ্যা চর্চায় এক পরিচিত ব্যক্তিত্ব ঈপ্সিতা রায় চক্রবর্তী।

অস্ট্রেলিয়ার এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গার্ডেন হ্যাম্পেল। অনাথ শিশুদের জন্য তাঁর মমতার প্রকাশ ঘটেছে এক আশ্চর্য শখের মধ্য দিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার এক প্রধান উটপালক এই লোকটি সম্প্রতি এসেছিলেন, ভারতে—রাজস্থানের উটপালন-কেন্দ্রগুলি দেখতে। এই বর্ণময় ব্যক্তিত্বের এক বর্ণময় ধারাবর্ণন।

অভিযান পর্যায়ে রয়েছে বিপজ্জনক খেলা হ্যাং গ্লাইডিংয়ের ভারতে ক্রমপ্রচারিত হওয়ার এক আকর্ষণীয় বিবরণ। এছাড়া রয়েছে দুর্গম হিমালয়ের বুকে লামাদের দেশ থিয়াংবোচে যাত্রার বিবরণ।

কলকাতার পাশ্চাত্য নাচের স্কুলগুলির ওপর একটি প্রতিবেদন রয়েছে। এছাড়া মোহনবাগান ক্লাবের শতবর্ষপূর্তির বছরটিতে ক্লাবে ঘনিয়ে ওঠা ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ের দুর্বিপাক নিয়ে একটি বিশেষ রচনা লিখেছেন ক্লাবের দীর্ঘদিনের খেলোয়াড় সুব্রত ভট্টাচার্য। সব মিলিয়ে 'আলোকপাত'—এর এই সংখ্যাটিও সমান আকর্ষণীয়।

আলোকপাতের পাঠক পাঠিকাদের বর্তমান সংখ্যার অভিনবত্ব আর বৈচিত্র্যের জগতে আমন্ত্রণ জানাই।

আলোক মিত্র

বহুতল-বাড়ি দুর্ঘটনা : কলকাতার দুর্ভাবনা

দুর্ঘটনার পর কলকাতার আকাশচুম্বী বাড়িগুলির বাসিন্দারা ভবিষ্যতের ভয়ে সন্ত্রস্ত। প্রদীপ কুণ্ডলিয়ার গড়া ৯টি হাইরাইজ বিল্ডিং—এর মধ্যে ভবানীপুরের বাড়িটি এরকম হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ল কেন ? কুণ্ডলিয়ার সঙ্গে পুলিশ কমিশনারের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক কিসের ? কোন মার্ক্সবাদী মন্ত্রীপুত্র এ ঘটনায় জড়িত ? বিতর্কিততম ঘটনাপ্রবাহে আলোকপাত।

২৭ জুন ১৯৮৯–র রাত সাড়ে নটা। পদ্মপুকুরের নার্সিংহোম 'হেলথ পয়েন্ট ভিউ'এর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে এক ঝাঁক সাদা পোশাকের পুলিশ। নার্সিংহোমটির দিকে এক পলক তাকালে বোঝার উপায় নেই যে কলকাতার সব থেকে চাঞ্চল্যকর অপারেশান এখানেই ঘটতে চলেছে। যার দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে শহরের তামাম নাগরিকেরা। এবং এই অপারেশানটি সাকসেস্‌ফুল হলে আগামী কালই কলকাতার সমস্ত প্রভাতী সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করে ছাপা হবে এই সংবাদটি।

সাড়ে নটা নাগাদ নার্সিং হোমের অদূরে একটি ট্যাক্সিকে থামতে দেখা গেল। ট্যাক্সির দরজা খুলে সতর্কভঙ্গিতে নেমে এলেন বছর ত্রিশের ছিপছিপে চেহারার এক তরুণ। যুবকটি নার্সিংহোমে ঢোক-বার মুখেই সাদা পোশাকের পুলিশ গ্রেফতার করল তাঁকে। বিতর্কিত ডেভেলপার প্রদীপ কুণ্ড-লিয়াকে গ্রেফতার করে পুলিশের গাড়িতে নিয়ে আসা হল লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে। তত-ক্ষণে মিডিয়ার কাছ থেকে লালবাজারে বেজে চলেছে একের পর এক টেলিফোন। রাত বারোটার পরে ডি সি ডি ডি প্রসূন মুখার্জির মুখ থেকে জানা গেল—হ্যাঁ, প্রদীপ কুণ্ডলিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভবানীপুরের অভিশপ্ত হাইরাইজ বিল্ডিং-এর ডেভেলপার প্রদীপ কুণ্ডলিয়াকে নিয়ে যখন সারা কলকাতা শহর তোলপাড় হয়ে উঠেছে, তখনই বিভিন্ন সূত্র থেকে এই বিতর্কিত মানুষটি সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য ফাঁস হতে শুরু করল। জানা গেল, খোদ কলকাতা শহরেই তাঁর তৈরি নটি হাইরাইজ বিল্ডিং রয়েছে। এবং বছর ত্রিশের এই তরুণ সামাজিকভাবে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। সেইসঙ্গে বেরিয়ে আসতে শুরু করল বিভিন্ন চমকপ্রদ খবর। সত্যি মিথ্যার পাশাপাশি গুজব ও গুঞ্জনও। কলকাতা কর্পোরেশানের ডেপুটি মেয়র মণি সান্যাল অভিযোগ করে বসলেন, কলকাতা পুলিশের টপ অফিসিয়ালদের সঙ্গে প্রদী-পের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এমন কি এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার বি কে সাহা। যিনি তাঁর কক্ষ প্রদীপের একটি নির্মীয়মান ছবিতে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে-ছিলেন। অনেকেই প্রশ্ন তুললেন, কিসের ভিত্তিতে পুলিশ কমিশনার ওই ডেভেলপারকে লালবাজারের একটি ঘর ব্যবহার করার অনুমতি দিলেন ? তাহলে

ভবানীপুরের সেই অভিশপ্ত হাইরাইজ বিল্ডিং

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

কারণ কমপ্লান ওদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়।

সাধারণত ১৫/১৬ বছর পর্যন্তই ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার বয়েস।
প্রোটিন হোল এমন এক পুষ্টিকর উপাদান, যা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দৈহিক গঠনে সরাসরি কাজ দেয়। তাই এখন থেকে আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যেও চাই কমপ্লান।
কমপ্লান-এ আছে সেরা প্রোটিন অর্থাৎ দুধের প্রোটিন (২০%)।
এছাড়া আছে আরো ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ।

কমপ্লান বিভিন্ন মুখরোচক স্বাদগন্ধে পাওয়া যায়।

23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়, ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান®
সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GX/38/244 BEN

বাংলার আপন ঐতিহ্য...আপন মাধুর্য্য!

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট— কত হালকা, মুচমুচে
আর হজম করাও কত সহজ—সেই অনন্য স্বাদের বিস্কুট,
যা দিতে পারে শুধু ব্রিটানিয়াই। তাই, গত পঁয়ষট্টি বছর ধরে
এটিই যে ঐতিহ্যগতভাবে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিক্ষণে খাবার
বিস্কুট হয়ে রয়েছে, তাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে।

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

**বাংলার আপন ঐতিহ্য...
আপন মাধুর্য্য!**

LINTAS BIN BTA 7 254 BG

কি প্রদীপের খুঁটি অনেক শক্ত জায়গাতে বাঁধা আছে ?

একদিকে যখন ভবানীপুরের ওই ভেঙে পড়া বাড়ি নিয়ে শোরগোলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী প্রদীপ কুণ্ডলিয়াকে গ্রেপ্তারের ওপর জোর দিলেন, তখন সাংবাদিকেরা বার করে আনতে লাগলেন নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য। কলকাতা পুলিশ তাঁদের যাবতীয় শক্তি খরচ করে খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে লাগলেন প্রদীপ কুণ্ডলিয়াকে। কেননা ভেঙে পড়া হাইরাইজ বিল্ডিং এর নায়ককে গ্রেপ্তার না করে কলকাতা পুলিশের উপায় ছিল না।

যতদিন যাচ্ছিল, ততই যেন প্রদীপ কুণ্ডলিয়ার সঙ্গে কলকাতা পুলিশের বেশ কিছু অফিসিয়ালদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আবিষ্কৃত হতে শুরু করল। ফলে প্রদীপকে গ্রেপ্তার করে জেলে চালান দিয়ে প্রদীপ—অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাইলেন কলকাতা পুলিশ। ব্যক্তিগত তদন্তে নেমে জানা গেল, কলকাতা পুলিশের বহু উঁচু মহলের অফিসার প্রদীপের নানা ধরনের অনুগ্রহ লাভ করেছেন।

প্রদীপ কুণ্ডলিয়াকে নিয়ে প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করার পেছনে কারণ রয়েছে। বিশেষত এটি জনস্বার্থ সম্পর্কিত, এরকম আরও ঘটনা যে ঘটবেনা তার নিশ্চয়তা কোথায় ? রাতারাতি বিতর্কের নায়কে রূপান্তরিত হলেন এই ডেভেলপারটি। জানা গেল, প্ল্যান পাশের অনেক আগেই কুণ্ডলিয়া তাঁর বাড়ির কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে অন্যের জমি নিজের নামে মিউটেশান করতে গেলে দু বছর লেগে যায়। তারপর আসে প্ল্যান স্যাংশানের প্রশ্ন। এই দুটি ক্ষেত্রে কলকাতা কর্পোরেশানের 'সাত্ত্বিক' অফিসার কেরানিরা অর্থ নিয়ে থাকেন। অবশ্যই তা আনঅফিসিয়াল মানি। কিন্তু প্রদীপের এ ব্যাপারে কোন অসুবিধেই হয়নি। হাই অফিসিয়ালদের তিনি মোটা টাকার বিনিময়েই মুখ বন্ধ করে তড়িঘড়ি মিউটেশান এবং প্ল্যান পাশ করে নিয়েছেন। কর্পোরেশান কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন ছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রদীপকে নিয়ে জলঘোলা হবার পর তারা অবশ্যই সাফাই গাইতে শুরু করেছেন। এমন কি নজর ঘোরাবার জন্য আক্রমণের তীর তাক করেছেন রাজ্য প্রশাসনের ওপর।

পুলিশ পরিবেষ্টিত, ডেভেলপার প্রদীপ কুণ্ডলিয়া

সিনেমা–শিল্পের সঙ্গে আত্মিক যোগ : রূপা গাঙ্গুলীর জন্মদিনে প্রদীপ কুণ্ডলিয়া

প্রদীপের গ্রেপ্তারের এক সপ্তাহের মধ্যে খেলা জমে ওঠে। গোয়েন্দা অফিসাররা জানতে পারেন প্রদীপ কুণ্ডলিয়ার সঙ্গে বামফ্রন্টের জনৈক মন্ত্রীপুত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা বিশদ কিছু বলতে না চাইলেও এই প্রতিবেদক অনুসন্ধানের মারফত জানতে পারেন যে বামফ্রন্টের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের ছেলে রনজিৎ শূরের সঙ্গেই প্রদীপের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এমন কি প্রশান্তবাবুর ওই ব্যবসায়ী পুত্রটির সঙ্গে প্রদীপের ব্যবসাও চলত। তবে নামে নয় বেনামে। সেই সময় অবশ্য রণজিৎ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন নি যে এই প্রোমোটার ব্যবসায়ীটি শেষ পর্যন্ত এমন কেঁচিয়ে বসবেন। তবে এই বিষয়টি কোনভাবেই স্বীকার করেননি রনজিৎ শূরের ঘনিষ্ঠ লোকজনেরা। কিন্তু কংগ্রেসের জনৈক প্রভাবশালী নেতা এই প্রতিবেদককে সরাসরিই মন্ত্রী পুত্রের নাম জানিয়ে বললেন, 'প্লিজ, আমার নাম কোট করবেন না। কিন্তু ওই মন্ত্রীপুত্র যে রণজিৎ শূর, আমরা এ ব্যাপারে একশোভাগ নিশ্চিত। তদন্ত করলেই সব বেরিয়ে আসবে। এবং প্রশান্ত শূরের কাছ থেকে ছেলে হিসাবে রণজিৎ বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধে নিত বলে আমাদের অনুমান।'

মজার কথা, বামফ্রন্ট আবার এইসব অবাঙালি ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এই প্রাধান্যের কারণ বিশ্লেষণের ব্যাপারে কংগ্রেস বিধায়ক সুলতান আমেদের বক্তব্য, কলকাতার জমিগুলি বামফ্রন্ট অবাঙালি ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে। এর কারণ খুবই পরিষ্কার। কারণ ফ্রন্ট ধরেই নিয়েছে কলকাতা থেকে তাদের ভোটের আশা নেই। সুতরাং এইসব এলাকা থেকে অর্থ রোজগার করে ফাণ্ড ভরতে হবে। এই পরিকল্পনা মাথায় রেখেই বামফ্রন্ট এই ব্যাপারটায় মদত যোগাচ্ছে। প্রদীপ কুণ্ডলিয়া এই জনস্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্রেরই ফসল বলে সুলতান আমেদের বক্তব্য। আরও জানা যায়, আর পাঁচ বছরের মধ্যেই নাকি কলকাতার ৯০ শতাংশ অবাঙালিদের হাতে

তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই তার চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

বহুতল বাড়ি নিয়ে কলকাতা শহরে এই রকম তোয়াজ তোষামোদের ঘটনা নতুন নয়। বাঙালি জমির মালিককে নামমাত্র টাকা দিয়ে জমি কিনে অবাঙালি ডেভেলপাররা একের পর এক হাইরাইজ বিল্ডিং বানাতে শুরু করেন। কর্পোরেশানের বিশেষ দাক্ষিণ্যে তামাম কলকাতা শহরের সর্বত্রই এখন এই হাইরাইজ বিল্ডিং-এর মিছিল। এ ধরনের প্রায় ৫,০০০ বিল্ডিং তৈরি করার পরিকল্পনা পেশ হয়ে গেছে। অভিযোগ উঠেছে, এইসব ক্ষেত্রে অবাঙালি ডেভেলপাররা কর্পোরেশানকে মোটা টাকা দিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করে থাকেন। কলকতা কর্পোরেশানের সমস্ত মহলেই এদের অবাধ যাতায়াত। এই কারণে কর্পোরেশানকে নীরব দর্শক বানিয়ে একের পর এক বিপজ্জনক হাইরাইজ বিল্ডিং হয়ে চলেছে।

হাইরাইজ বিল্ডিং কেলেঙ্কারির ব্যাপারে পুর-দপ্তরের বক্তব্য, সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন। একই সুর ধ্বনিত হয়েছে মেয়র কমল বসু ও ডেপুটি মেয়র মণি সান্যালের গলায়। কেউই ব্যাপারটা পুরোপুরি খোলসা করে বলতে চাইছেন না। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, হাইরাইজ বিল্ডিং এর ব্যাপারে সরকার অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, সময়ে যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে কলকাতার ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়বে। পুর দপ্তরের বক্তব্য অনুযায়ী, অযথা হইচই না করে পুর দপ্তর নিজেদের কাজ করতে চান। কর্পোরেশানের আওতায় হাইরাইজ বিল্ডিং-এর তালিকা তাদের হাতে এসে গেছে। এবার কাজ শুরু হবে। তবে কি কি করতে চান এ বিষয়ে কি কর্পোরেশান কি পূর্ত দফতর কেউই কিছু ভেঙ্গে বলতে চান নি।

ভবানীপুরের হাইরাইজ বিল্ডিং এর প্রোমোটার প্রদীপ কুণ্ডলিয়াকে নিয়ে যখন একের পর এক দোষারোপ, তখন কলকাতা কর্পোরেশানের সাধু সাজার ব্যাপারটিও বেশ কৌতূহলোদ্রেক করে। সমস্ত দোষ চাপানো হয়েছিল আর্কিটেকট দিলীপ চ্যাটার্জির ওপর। বিপদ বুঝে দিলীপবাবু কলকাতা কর্পোরেশানকে উকিলের চিঠি দিয়ে জানান যে ২৮ নভেম্বর ১৯৮৮ তে তিনি কর্পোরেশানকে জানিয়েছিলেন যে তিনি ওই বাড়ি নির্মাণের সঙ্গে জড়িত নন। তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই ভেঙে পড়া বাড়িটির সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না। তাহলে সতিই কে দায়ী? প্রদীপ কুণ্ডলিয়া? সত্যিই কি অপরাধী—না যারা তাকে মাল মশলা সরবরাহ করেছেন—তারা? অনেক আইনজীবীর মতে, প্রদীপের বিরুদ্ধে ৩০৪ ধারার মামলা দাঁড়ায় না। এটি সম্পূর্ণত জামিনযোগ্য অপরাধ। কিন্তু নিতান্তই পাবলিক ইন্টারেস্টের কথা ভেবে প্রদীপকে জামিন দেওয়া হয়নি। জনরোষ স্তিমিত হলেই তাঁকে জামিন দেওয়া হবে। কিন্তু গত দোসরা জুলাই রবিবার সাধন গুপ্তের অভিযোগক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করা হয়। সাধনবাবুর অভিযোগ, প্রদীপ তাঁর সই জাল করেছে। সেই সঙ্গে তাঁদের একটি র‍্যাকেট হাইরাইজ বিল্ডিং তৈরি করে জনসাধারণকে প্রতারণা করে চলেছে। সাধন গুপ্তের অভিযোগক্রমে প্রদীপকে পুলিশ কাস্টোডিতে রাখার আদেশ দেন ব্যাংকশাল কোর্ট।

ভবানীপুরের হাইরাইজ বিল্ডিং ভেঙে পড়ার পরে একে একে বিভিন্ন তথ্য বেরিয়ে আসার ফলে কলকাতা কর্পোরেশানের বহু অজানা অধ্যায়ও জানা গেছে। আজ সকলেই প্রদীপ কুণ্ডলিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে চলেছে। কিন্তু এর সাথে সাথে কলকাতা কর্পোরেশানও কি নিজেদের দায়িত্ব

পুলিশ কমিশনার বি কে সাহা: কুণ্ডলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ!

এড়াতে পারে? বোধহয় পারে না। কারণ প্রদীপ কুণ্ডলিয়া যখন এইসব হাইরাইজ বিল্ডিং—এর প্ল্যান স্যাংশান করছিলেন তখন কি কর্পোরেশান কর্তৃপক্ষ কিছুই জানতেন না?

কিন্তু কে এই প্রদীপ কুণ্ডলিয়া? যিনি এক পক্ষ কাল ধরে তামাম কলকাতার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন? রাজস্থানের ব্যবসায়ী পরিবারের মানুষ প্রদীপ কুণ্ডলিয়ার বাবা রায় চাঁদ কুণ্ডলিয়াও ছিলেন ব্যবসায়ী। প্রদীপের যখন চোদ্দ বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মারা যান। ওই সময়ই প্রদীপকে সংসারের গুরু দায়িত্ব নিতে হয়। গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউতে কুণ্ডলিয়াদের একটা মেশিনারি ও পার্টসের ছোট দোকান ছিল। বাবার মৃত্যুর পর একদিকে পড়াশুনো, অন্যদিকে জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসা চালাতেন প্রদীপ। বি.কম পাশ করে পরবর্তী পর্যায়ে হায়দ্রাবাদ থেকে নেন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা। এর দরুন ব্যবসাতে এল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। পৈতৃক ব্যবসার পাশাপাশি শুরু করেছিলেন হাইরাইজ বিল্ডিং কনস্ট্রাকশানের ব্যবসা। পাশাপাশি ছায়াছবির ওপরও তাঁর দারুণ আকর্ষণ ছিল। ছবিতে নায়ক হবার জন্য তিনি পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছিলেন। এরপর তাঁর সঙ্গে আলাপ হল স্বরাজ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। যোগাযোগ ঘটে গেল প্রভাত রায়ের সঙ্গে। প্রযোজক হলেন 'অগ্নিতৃষ্ণা' ছবিরও। এছাড়াও কয়েকটি ছবিতে নাকি প্রদীপ অভিনয় করেছিলেন। এ হেন তরুণ তাঁর তৈরি বাড়ি ভেঙ্গে পড়ার দৌলতে তামাম কলকাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেন হাইরাইজ বিল্ডিং-টির ভেঙ্গে পড়ার মত প্রদীপ কুণ্ডলিয়ার হাইরাইজ কেরিয়ারটিও ভেঙ্গে পড়েছে।

ভবানীপুরের ভেঙ্গে পড়া বাড়ির শোরগোলের মধ্যে একসঙ্গে অনেক গোপন তথ্যই বেরিয়ে এসেছে। জানা গেছে, এই হাইরাইজ ব্যক্তিটির সঙ্গে এক দিকে যেমন কলকাতা পুলিশের যোগাযোগ রয়েছে, তেমনই বামফ্রন্টের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতাও ফাঁস হয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশান এখন নিজেদের বাঁচাবার জন্য অনেক সাফাই গাইবেন। কেননা ঝুলি ধরে টান দিলে হয়তো অনেক গোপন তথ্যই বেরিয়ে আসতে পারে। এবং সাত্বিক বলে পরিচিত অনেক শুদ্ধ চরিত্রের আমলার মুখোশ বেরিয়ে পড়বে। সেইসঙ্গে আরও বড়সড় ভি আই পিদের নাম বেরিয়ে পড়তে পারে বলে অনেকেরই অনুমান। তবে প্রদীপের ঘনিষ্ঠরা বলেছেন, 'দুমাস পরেই সব চাপা পড়ে যাবে। প্রদীপকে কলকাতা পুলিশ কিছুই করতে পারবে না!' পুলিশ কাস্টোডিতে তাঁকে নাকি জামাই আদরেই রাখা হয়েছে। রোজই কলকাতার একটি নামী পাঁচতারা হোটেল থেকে খাবার আসছে। পুলিশ কিছুতেই তাঁকে চটাতে চাইছে না। কলকাতা পুলিশের কোন না কোন অফিসার কোনও না কোনও দিন তাঁর অনুগ্রহ পেয়েছেন, তারই প্রতিদান কিনা কে জানে!

লক্ষণীয়, সাধন গুপ্ত প্রদীপকে প্রতারণামূলক কাজকর্মের গ্যাং লিডার বলে অভিযুক্ত করেছেন। এবং সর্বশেষ মামলাতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও সই জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। আসলে প্রদীপের বিরুদ্ধে ৩০৪ ধারার মামলাটি কোনমতে গ্রাহ্য হবে না। প্রথমবার জামিন না পেলেও পরবর্তী পর্যায়ে তিনি জামিন পেয়ে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রদীপকে বেকায়দাতে ফেলার জন্য তড়িঘড়ি আরেকটি বড়সড় মামলা দায়ের করা হল। যার অর্থ হল এই বিতর্কিত ডেভেলপারটির মুখ চেপে দেওয়া। পুলিশ কাস্টোডি থেকে বেরিয়ে এসে প্রদীপ হয়তো অনেক নতুন তথ্য ফাঁস করতে পারেন—যাতে করে অনেক নামী দামী ভি আই পিদের নাম বেরিয়ে পড়তে পারে। তাই কি এত তড়িঘড়ি করে রবিবারের মত ছুটির দিনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হল? অভিযোগকারীরা কোন ঝুঁকিই নিতে চান নি। প্রদীপকে কি শুধু জনস্বার্থের খাতিরেই জেলে রাখা প্রয়োজন, নাকি ভি আই পিদের নিরাপদ রাখার জন্যই এই মামলা? কে কাকে কেন বাঁচাতে চাইছেন?

মণিশঙ্কর দেবনাথ

ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

ইপ্সিতা রায় চক্রবর্তী

যাদুবিদ্যার শক্তি প্রদর্শন

বিদ্যাকেও অনেকে অপব্যবহার করেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। পুরুষ প্রাধান্য ও চার্চের প্রভুত্বের শিকার হয়ে অনেক ডাকিনী মারা গেছে। পুরুষ কখনই সমাজে নারীর প্রাধান্য মেনে নেয় নি। তাই ডাকিনীদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে শুরু হল অপপ্রচার।

তাদের নির্যাতন করা হত, অঙ্গহানিও করে দেওয়া হত ও শেষ পর্যন্ত পুড়িয়ে মারা হত। এমন কি ফরাসি ইতিহাসের নায়িকা জোয়ান অব আর্ককেও একসময়ে ডাকিনী বলা হত। অত্যাচার চলে তাঁর ওপরেও।

প্রকৃত ডাকিনী যারা তাঁরা কিন্তু কুৎসিৎ দেখতে নয়। তাঁদের ত্বক দ্যুতিময়, কেশ নরম, প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁরা রীতিমত পড়াশুনো করেছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁরা জীবনের পরশমণির আবিষ্কারক। তারাও পরিবেশের শিকার হয়েছেন।

এইভাবে মায়াবী ডাকিনীদের জন্ম হয়, যাঁরা চোখের দ্যুতি ও মৃদু হাসি দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করে।

বিভিন্ন ধরনের ডাকিনীদের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যাক

প্রাচীন গ্রীসে সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী মহিলা পুরোহিত শুধুমাত্র যে ফারাওর উপদেশ্টা ছিলেন তাই

নয় তার থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁর ছিল। সাধারণ লোকের নৈতিক চেতনা বা বিবেক বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন ঠিক তাই। সেই সময়ে নাগরিক জীবনে মন্দিরের ভূমিকা ছিল বিরাট। সাধারণ লোককে পরিচালনা, সামরিক ও অসামরিক শক্তির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রক ছিল মন্দির। খুব অল্প বয়স থেকেই যেসব মহিলা ডাকিনীবিদ্যা চর্চা করতেন, পরবর্তীকালে সেইসমস্ত উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন মহিলা পুরোহিতরা ওষুধের যথার্থ প্রয়োগ করতেন। সাধারণ রাজকুমারীদের জীবন থেকে তাঁদের জীবন ছিল আলাদা। যৌবন থেকেই তাঁদের নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হত। উচ্চবংশগত মহিলা-দের থেকেই পুরোহিত নিয়োগ হত। উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মহিলা পুরোহিতদের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এমন কি ফারাওদের তাঁর নিয়ম অনুযায়ী চলতে হত। পার্থিব বিষয়ে তার উপদেশের কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু চরম সাম্যবাদের থেকেই মেয়েদের দাসীর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছিল। পুরুষের অজ্ঞতা, কামুকতা ও উগ্র স্বাদেশিকতা তাঁদের জোর করে নিচে নামিয়ে এনেছিল।

ভারতে এখন মেয়ে-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। কোনও কোনও রাজ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের থেকে বেশি হলেও মেয়েরা এখনও ছেলেদের অধীনে, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থা চোখ বাঁধা ক্রীতদাসের মতন। কিন্তু তাঁরাও পুরুষদের সমান বুদ্ধিমান, সক্ষম ও উপযুক্ত অথচ শৈশব থেকে আমৃত্যু গরু ভেড়ার মত দেখা হয়। গণতন্ত্রের নামে তাঁদের ওপর নির্মম অত্যাচার করা হয়। বিয়ের সময় যৌতুক না দিতে পারায় অনেক মেয়েকেই আগুনে পুড়ে মরতে হয়েছে, আর আমাদের গণ-তন্ত্র প্রকৃত দোষীদের চিরদিন বাঁচিয়ে রেখেছে। আমাদের সংবিধানে মেয়ে পুরুষের সমান অধিকার থাকলেও চাকরির সময়ে তাঁদের আলাদা করে দেখা হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাবা মা ছেলেদের থেকে মেয়েদের আলাদা করে দেখেন কেননা তাঁদের মতে পুরুষকে সুখী করে তোলা ও সন্তান পালন করাই তাদের একমাত্র কাজ।

সব মেয়েরাই যে সুযোগ থেকে বঞ্চিত তা কিন্তু বলা যায় না। যারা সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা কিন্তু অন্যদের সুযোগ দিয়ে সাহায্য করেন না। আজকের এই যুগ আত্মকেন্দ্রিকতার যুগ। তা শুধু নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য কিছু করতে শেখায়। হতে পারে আত্মকেন্দ্রিকতাই তাদের এ ধরনের করে তুলেছে।

প্রাচীন ডাকিনীবিদ্যাকে আমি আবার জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছি। কেবল মহিলারাই এই বিদ্যার চর্চা করতেন। যেসব অসুখ ডাক্তারি ওষুধে সারে না সেগুলির চিকিৎসা করে এই বিদ্যায় সারানো হয়। ক্রিস্টাল থেরাপি বিভিন্ন ধরনের উপাদান পদ্ধতিতে তৈরি। এর জন্য প্রচুর পড়াশুনো দরকার, দরকার অধ্যবসায়, একান্তভাবে নিজেকে নিয়োগ। শুধুমাত্র অর্থ, প্রভাব কিংবা সময় দিয়ে এই বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না। ডাকিনীবিজ্ঞান নানাভাবে

সময়কে ধরে রাখার ক্রিয়া!

রক্-ক্রিস্টালের সম্মোহনী শক্তি!
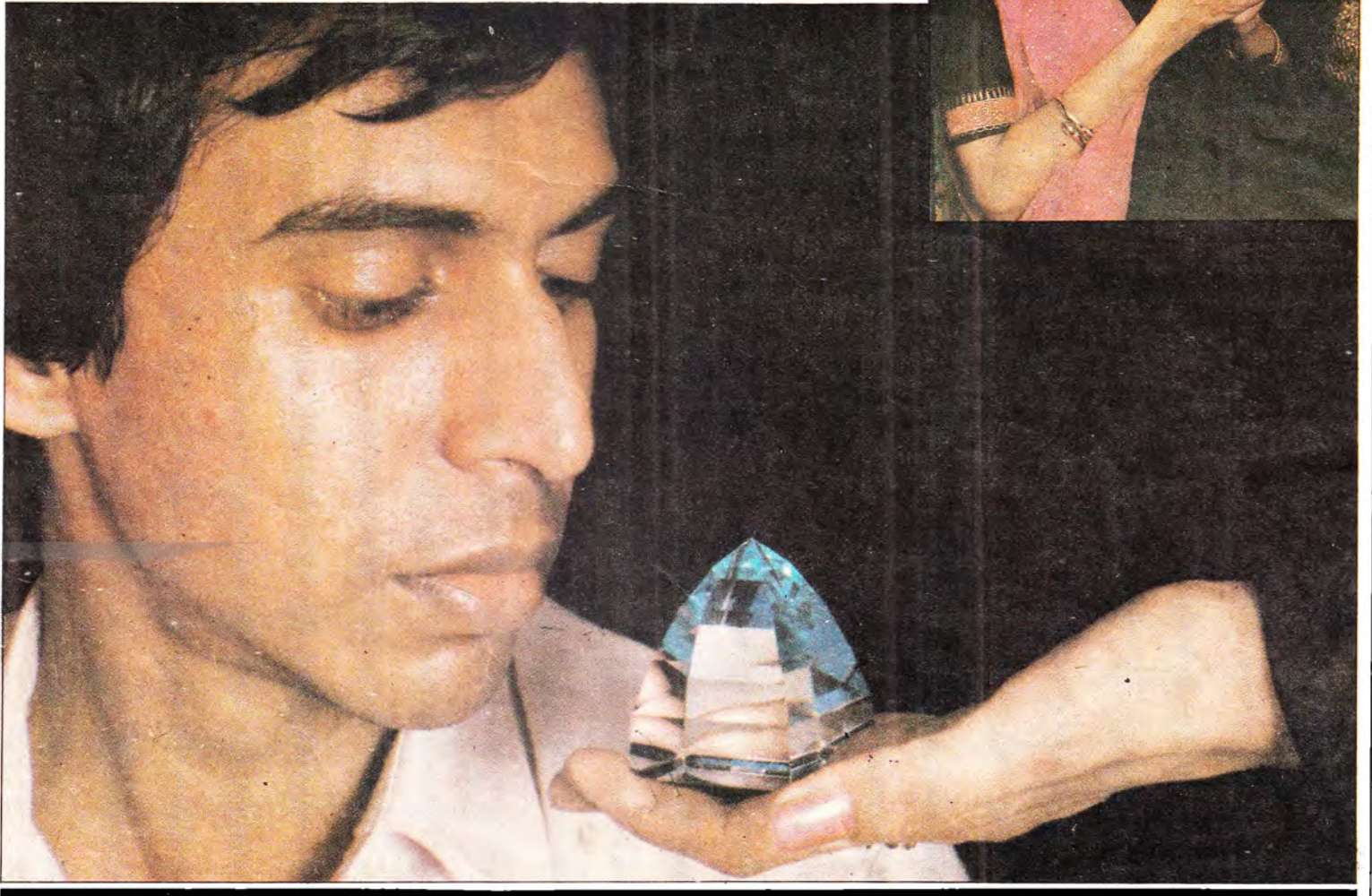
রোগীর উপকার করে থাকে । এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই । এর মূলে রয়েছে কিছু মৌলিক নীতি যেটা মনের ও শরীরের মধ্যেকার পুনর্জন্ম থেকে উৎসারিত আর এর উল্টোটা সেরকম দেখা যায় না । আরও বলা যায় এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে কোন ব্যথা বা যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, দামী কোন ওষুধ ব্যবহারের দরকার হয় না । স্বাস্থ্যের মূল কথাই হল দেহ ও মনের ভারসাম্য রক্ষা করা ।

আমাদের দেশে যে সমস্ত মেয়েরা এই বিদ্যার চর্চা করে তাদের স্বভাবতই ডাকিনী বলে । এখনও আমাদের দেশে তাদের মেরে ফেলা হয় । ডাইনী বলে বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য মেয়েকে মেরে ফেলা হয়েছে । বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে একাজ করা হয়েছে । এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, দোষীরা শাস্তি পায় নি !

আমি সোচ্চারে এর প্রতিবাদ করেছিলাম । কিন্তু রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে যায় । তা সত্ত্বেও প্রচুর শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত মহিলা আমার কাছে আসেন । ডাকিনীবিদ্যায় ট্রেনিং দেওয়ার অনুরোধ জানান । তাঁরা জানেন আসলে ডাকিনী বিদ্যাচর্চা এক ধরনের প্রাচীন বিজ্ঞান যা মানুষের উপকারে লাগে । যতদূর সম্ভব আমি তাঁদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করি । কারণ ডাকিনী-বিদ্যায় বিশেষ কিছু বাধা-নিষেধ আছে, যা সচরা-চর বলা যায় না । বিশেষত প্রার্থীর আত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তবেই তাকে নির্বাচন করা হয় । ভাবছি এবছর আগস্ট থেকে কলকাতায় ডাকিনী বিদ্যা চর্চা নিয়ে গবেষণা শুরু করব । মেয়েদের জন্যই এই গবেষণা । আমাদের গবেষণায় যোগ দেওয়ার জন্য ভর্তি হওয়া কঠিন । এই বিদ্যা যারা চর্চা করবেন তাঁদের কিছু শারীরিক ও মানসিক গুণের অধিকারী হতে হবে কারণ ভবিষ্যতে তাঁরা নিজেদের তো উপকার করবেনই সেইসঙ্গে আরও পাঁচজন তাঁদের কাছ থেকে উপকৃত হবেন । আমি মনে করি এই অধ্যায় এখানেই শুরু হওয়া দরকার, যেহেতু আমি ওই মহিলাদের বুঝিয়েছি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার, সমান অংশগ্রহণে এই বিদ্যা তাঁদের সাহায্য করবে । পুরুষেরা মেয়েদের শাসন করছে । মেয়েরা কিন্তু সহজে তাদের একাধিপত্য ছেড়ে দেয় নি । তফশিলি জাতি ও উপজাতিরা নিজেদের রক্ষার্থে বিশেষ সুযোগ সুবিধে পায় কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা এদের থেকেও অনেক বেশি শোষিত । চূড়ান্ত অব-মাননার শিকার তাঁরা । তাঁদের কিন্তু বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয় না । এ বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্তা মেয়েদেরই প্রতিবাদ করতে হবে । যথার্থ ভাবে মেয়েদের এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে যার যুক্তিগ্রাহ্য উপসংহার হল-ডাকিনী বিদ্যার চর্চা ।

আজ সারা দেশে পরিচ্ছন্নতা ও অপরিচ্ছন্নতার একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে । একজন আরেকজনকে কলংকিত করতে কত টাকা, সময় যে ব্যয় করছেন তার ইয়ত্তা নেই । ভারতে আজ জীবনের মূল কথাই হল-কোন কিছুই যেন পরিষ্কার নেই । বাড়ির ভিত হল মেয়েরা আর সমাজের ভিত হলেন বাড়ির মালিকেরা । সেই মেয়েরা যদি শোষিত হয়, তারা যদি অসৎ হয়, বঞ্চিত হয়, তাহলে একটি পরিচ্ছন্ন গৃহ কিংবা ভালো সমাজ কি আশা করা যায় ? তাই মেয়েদেরই জেগে উঠতে হবে আর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে । তাদের অভিষ্ট পূরণ হলেই পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ে উঠবে । 'ডাকিনী বিদ্যাচর্চা' এই আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তুলবে ।

ভাবছি এবছর আগস্ট থেকে কলকাতায় ডাকিনী বিদ্যা চর্চা নিয়ে গবেষণা শুরু করব । মেয়েদের জন্যই এই গবেষণা । আমাদের গবেষণায় যোগ দেওয়ার জন্য ভর্তি হওয়া কঠিন । এই বিদ্যা যারা চর্চা করবেন তাঁদের কিছু শারীরিক ও মানসিক গুণের অধিকারী হতে হবে কারণ ভবিষ্যতে তাঁরা নিজেদের তো উপকার করবেনই সেইসঙ্গে আরও পাঁচজন তাঁদের কাছ থেকে উপকৃত হবেন ।

প্রাচীনকালে ডাকিনীবিদ্যায় ড্রাগন ও সর্পচর্চার গুরুত্ব ছিল । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রাচীন ফারাওদের গ্রীসে বিষধর গোখরো সাপ যে মহিলা শাসক পুরোহিতের মাথায় থাকত, তিনি সর্বোচ্চ পার্থিবজ্ঞানের অধিকারিণী হিসেবে বিবেচিত হতেন । তৃতীয় নয়ন হল সেই জিনিসটি যা স্রষ্টা যাকে পছন্দ করেন তাঁর কপালে স্থাপন করেন । এই তৃতীয় নয়নকে যে মুহূর্তে কাজ করতে বলা হবে সেই মুহূর্তেই এটি সক্রিয় হয়ে উঠবে । এটা খুবই মজার ব্যাপার যে, নীলনদ উপত্যকায় বস-বাসকারী কিছু সাপের পাইনাকৃতি শরীরের সেরি-ব্রাল করটেক্সের নিচে চক্ষুদ্বয়ের ঠিক পাশে একটি প্রকৃত তৃতীয় চক্ষুর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় । পাইনাল গ্ল্যান্ডের কাজ সম্পর্কে খুব অল্প কিছুই জানা যায় । গ্যালেনের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্ট পূর্ব ১৩১-২০১ অব্দে কিছু রচয়িতার মনে হয় যে এই তৃতীয় নয়ন আত্মিক ভারসাম্য রক্ষায় স্লুইস গেট হিসেবে কাজ করত । পিরামিড টেক্সটে একটি আশ্চর্যজনক পথ লক্ষ্য করা যায়, যেটি সাতটি গোখ্‌রো সাপকে জড়িয়ে থাকা একটি রাজার কথা বর্ণনা করেছে । এটি খোদিত কশেরুকা হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এটি পিঠের সামগ্রিক মেরুদণ্ডকেই পরিচালনা করে । এই গোখ্‌রো সাপগুলি অগ্নি নির্গত করে । এই সামগ্রিক ব্যাপারটি হিন্দু শাস্ত্রে কুণ্ডলিনি সর্পের কথা মনে করিয়ে দেয় । প্রাচীন চীনে স্বর্গ থেকে উদ্ভূত যৌগিক শক্তির প্রধান প্রতিরূপ ছিল সাপ ও ড্রাগন । এদের ক্রিয়াকলাপ ছিল জড় জগতে । পরবর্তীকালে তা সাম্রাজ্যবাদী প্রতীকের চিহ্ন হয়েছিল । এটা সব সময় স্বর্গীয় ঘূর্ণমান শক্তির প্রতীক ছিল । কাজেই ডাকিনীবিদ্যার চর্চা শক্তি ও জ্ঞানের চিহ্নস্বরূপ । এ প্রতীক শক্তির প্রতীক, যে প্রতীকের তলায় আমাদের মেয়েরা সমবেত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের মেয়েরা যদি এইভাবে সমবেত হয়ে একটি দল গঠন করে, তাহলে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে ক্ষমতায় থাকা সম্ভব নয় ।

ইতিমধ্যে, ডাকিনীবিদ্যার চর্চায় সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী মহিলা পুরোহিত হিসেবে আমি সমস্ত মেয়েদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা মেয়েরা পুরুষদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী । মানসিকভাবেও আমরা অনেক বেশি উন্নত । শারীরিক ভাবে আমরা অনেক বেশি যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি । পুরুষের থেকে আমরা অনেক বেশী সৃষ্টিশীল । ডাকিনীবিদ্যার চর্চা পুরুষানুক্রমে ছেলেরা নয় মেয়েরাই করে আসছে । আমাদের দেশে খনা, গার্গীর নাম কে না শুনেছে । বর্তমান পণ্ডি-চেরীর মা মেয়েদের অদ্ভুত গুণগুলি দেখিয়েছেন । শক্তিতে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে শ্রদ্ধা অর্জন এখন দীর্ঘ সংগ্রামের পর্যায়ে পড়ে । এ ব্যাপারে ডাকিনী-শক্তি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে ।

ছবি : রণজয় ঘোষ

নীতিন বিশ্বাস : তুলিতে অপরাধীর আঁচ

লালবাজারে গোয়েন্দা পুলিশের শিল্পী নীতিন বিশ্বাস রঙ–তুলির মাধ্যমে অপরাধী চিহ্নিতকরণের দুরূহ কাজটি কিভাবে করেন, কয়েকটি কেসহিস্ট্রি সহযোগে তারই চাঞ্চল্যকর কাহিনী।

নীতিন বিশ্বাস : অপরাধীর চিত্রশিল্পী

গভীর রাত । সবাই ঘুমিয়ে তখন। ঝুপড়ির ছাউনি ভেদ করে হিম পড়ছে। কিন্তু অসহায়, সহায়সম্বল-হীন মানুষেরা সে সব পরোয়া করে না। গার্ডেন-রিচের ব্রেসব্রিজ রেল স্টেশনের কাছে তেমনি এক ঝুপড়ির বাসিন্দা গীতা মালি। ষোলদিনের শিশুকে নিয়ে ঝুপড়িতে ঘুমিয়ে । সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত গীতা শিশুকে বুকের কাছে নিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন । সময়টা ১৯৮৬ সালের ২ ডিসেম্বর । এক সময় ঘুম ভেঙে যায় গীতার । পাশ ফিরে দেখে তার নবজাতক শিশু সন্তানটি নেই। প্রথমটা হতচকিত হয়ে গেল । তারপরই এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল গীতা এবং প্রতিবেশী কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করল তার খুঁজে না পাওয়া শিশুর কথা। কিন্তু কোন হদিস না পেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো গীতা মালি ও তার আত্মীয় স্বজনেরা। নিরুপায় হয়ে শেষ রাতে গার্ডেনরিচ থানায় একটি জেনারেল ডায়েরী করে গীতা । তাতে বলা হয় ২ ডিসেম্বর সন্ধ্যে ছটা নাগাদ এক অজ্ঞাত মহিলা তার ডেরায় আসে । ওই মহিলা দেখতে সুশ্রী এবং বয়স কুড়ির মত। সে তাকে বলে ব্রেসব্রিজ স্টেশন থেকে তার স্বামীকে সে আর খুঁজে পাচ্ছেনা । রাতটুকুর জন্য আশ্রয় চায় সে। কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে সে ওই রাতে তাকে ঝুপড়িতে থাকতে দেয়। কিন্তু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ১৬ দিনের শিশু এবং আশ্রিত মহিলাকে না পেয়ে হতবাক হয়ে ছুটে যায় থানায় । পুলিশ ঘটনার বিবরণ শুনে অনুমান করতে পারে ওই মহিলা আসলে শিশুচোর ।

গীতা মালির হারানিধি উদ্ধারে গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগ সক্রিয় হয়ে ওঠে । গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ শিল্পী ফটোগ্রাফার নীতিন বিশ্বাস গীতা মালির বর্ণনা মত একটি মহিলার ছবি এঁকে-ছিলেন। সেই স্কেচটি হল নাসিমার।

নীতিন বিশ্বাসের আঁকা জনৈক অপরাধী

অভিযুক্তা নাসিমা–র স্কেচ

গোয়েন্দা পুলিশ স্কেচটি নিয়ে নাসিমার আক্রা-ফটকের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নেন । শেষে ওর মামা ছবিটি দেখে নাসিমাকে সনাক্ত করেন। তবে তিনি তখনও জানতেন না যে ওর ভাগ্নি বাচ্চা-টাকে চুরি করেছে । ঘটনার পাঁচদিনের মাথায় ৭ ডিসেম্বর গার্ডেনরিচ পুলিশ একটি খবর পায় । সেই সূত্র ধরে পুলিশ ওইদিনই চলে যায় বিহারে। গোপালগঞ্জ থানার ফকিরটোলা গ্রামের এক বাড়ি থেকে উদ্ধার করে অপহৃত শিশুটিকে । গ্রেপ্তার করে নাসিমা খাতুন ওরফে বিউটি নামে কুড়ি বছরের বিবাহিতা তরুণীকে । ওখান থেকে ওই শিশুটিকে ও নাসিমা খাতুনকে আলিপুরের বিচার বিভাগীয় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হল । খবর পেয়ে শিশুটির মা গীতা মালিও আদালতে হাজির। তদন্তকারী অফিসারের আবে-দনক্রমে বিচারক টি.কে. গুপ্ত শিশু সন্তানটিকে একশো টাকার বণ্ডে গীতা মালির কোলে ফিরিয়ে দেন । বলাবাহুল্য এই ঘটনার উদ্ঘাটনের পেছনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করলেন গোয়েন্দা পুলিশের কনস্টেবল ফটোগ্রাফার নীতিন বিশ্বাস।
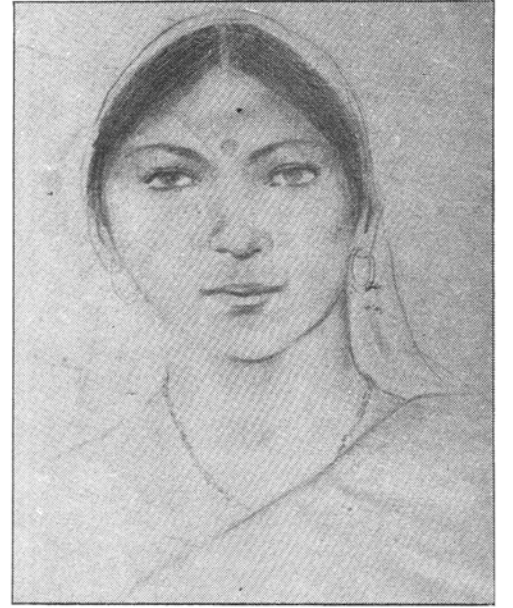
ছেলেবেলা থেকে রঙ–তুলির সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নীতিনবাবুর । এই ছবি আঁকাকে অবলম্বন করে এক সময় পড়াশুনায় গাফিলতি করেন। যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন ছবি আঁকাকে কেন্দ্র করে নীতিনবাবুকে দাদা শাসন করায় বাড়ি থেকে পালিয়ে যান, এমন ঘটনা ঘটে পরপর দু'বার । প্রথমবার বজবজ পার্কের বেঞ্চে শুয়ে ছিলেন দীর্ঘক্ষণ । হঠাৎ দু'তিনজন পুলিশ এসে হাজির হল তাঁর সামনে, নানা ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর থানায় নিয়ে গেলেন ওঁরা। নীতিনবাবুর কথায়, 'তখন আমি রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পরে অবশ্য আমার সঙ্গে ভীষণ ভাল ব্যবহার করেছিলেন ওঁরা । এমন কি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন থানা থেকে। দ্বিতীয়বার পালিয়ে

নোংরা পটি, দূষিত হাত
অবস্থা আরও বিগড়োয়, বাড়ায় ক্ষত!

দেশের ভাবী নাগরিকদের জন্যে জি আই সি সুরক্ষা-শিক্ষার ছ'টি কার্যবিধি তৈরী করেছে, যার মধ্যে একটি হ'ল, প্রাথমিক চিকিৎসা।
সুরক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা লোকের জীবন, ধনসম্পত্তি এবং জাতীয় সম্পদের হানি হওয়া রোধ করতে পারি।

ঐ কার্যবিধির সাহায্যে দেশের 3,000 স্কুলে 5,00,000 বাচ্চাদের সুরক্ষার পাঠ পড়ানো হবে।

নেহেরু চাচার জন্মশতাব্দী বছরে,
এই হ'ল আমাদের
ভাবপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জেনারেল ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসিওরেন্স বিল্ডিং, চার্চগেট, বম্বে 400 020
জাতির সেবায়

R K SWAMY/GIC/4148-BN

ছিলাম চন্দননগর। সেবারেও একই রকম ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্যই উদ্দেশ্যবিহীন। বয়সে কিশোর ফলে সন্দেহজনক ভাবে কয়েকজন যুবক নানা-রকম প্রশ্নও করতে থাকেন। কিন্তু পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটু সংযতভাবে উত্তর দিতে থাকি। শেষমেষ যুবকদল বিরক্ত হয়ে চলে যায়। কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন হাজারো রকমের হতাশা। নৈরাশ্য যেন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে। কিছুই হচ্ছে না ঠিকমত। রং তুলি কেনার পয়সাই পাচ্ছি না। ফলে যন্ত্রণা আরও প্রকট রূপ ধারণ করল। নিরূপায় হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম বাড়ি ফিরে যাই। ফিরেও এলাম। এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে এলাম যে পড়াশুনায় এবার মনোযোগী হব। তারপর থেকে জোর কদমে শুরু করি পড়াশুনা।'
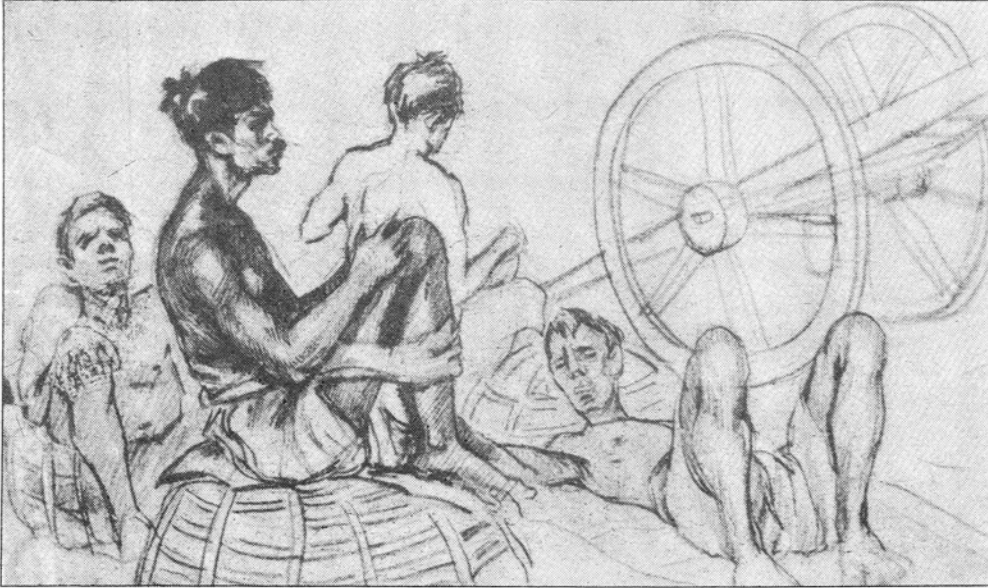
শ্রী বিশ্বাসের করা পেন্সিল স্কেচ

১৯৬৬ সালে গ্রামের স্কুল বেড়াচাঁপা দেউলিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দিলেন, পাশও করলেন তৃতীয় বিভাগে। কিন্তু স্বপ্ন আঁকাকে ঘিরে। বড়দি জীবন বিশ্বাস ও জামাইবাবু মহাদেব বিশ্বাস থাকতেন কলকাতার বেলগাছিয়া অঞ্চলে। তাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছার কথা ওঁর দিদি জামাইবাবু সবই জানতেন। ফলে নীতিনবাবুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁরা তাঁকে নিয়ে চলে এলেন কলকাতায় এবং ভর্তি করলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে। সালটা ১৯৬৮। পাঁচ বছরের কোর্স। অন্যদিকে নাইটে বি এ তে ভর্তি হলেন রাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজে। কিন্তু পার্টওয়ানে ব্যাক পাওয়ায় স্থগিত হল পড়াশুনা। দিলেন ফাইন আর্টস–এর পরীক্ষা। '৭২–এ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন নীতিনবাবু। তার আগেই '৬৮ তে বিড়লা অ্যাকাদেমীতে একটি চিত্র প্রদর্শনী করে ফেলেছেন নীতিন বিশ্বাস। সেটি উদ্বোধন করেছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষ। এরপর একের পর এক প্রদর্শনী করেছেন কলকাতা ও দিল্লির আর্ট গ্যালারিতে। অবশ্যই নিজস্ব প্রচেষ্টায়। চাকরির চেষ্টায় বিভিন্ন জায়গায় আবেদন করতে লাগলেন বিজ্ঞাপন দেখে দেখে। অবশেষে একটা ডাক পেলেন ওয়েস্ট-বেঙ্গল হোমগার্ড থেকে। সমস্ত কিছু পরীক্ষার পর চাকরি পেলেন, সালটা ১৯৭৪।

সাত, আটমাস কাটার পর পদোন্নতি হল কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদে। ওই বছরই নীতিনবাবুর জীবনের একটা বড় প্রাপ্তি ঘটে। পুলিশ ট্রেনিং স্কুল এর কিছু স্কাল্পচার এবং পেইন্টিং নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো শিল্পী নীতিন বিশ্বাস তাঁর তুলির আঁচড়ে নতুন করতে সক্ষম হন। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য দেখে তৎকালীন গভর্নর একটা রিওয়ার্ড দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরই সি বি আইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টর নীতিনবাবুকেএকটি গুরুদায়িত্ব দেন। দিল্লির সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে রাখা কিছু অপরাধীর ছবি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। নীতিনবাবুকে বলা হল ওই ছবি দেখে নতুন ছবি আঁকতে। নীতিনবাবু অপরাধীদের ছবির এক অংশ দেখে কল্পনায় অপর অংশগুলো এঁকে দিলেন। এরপর থেকেই নীতিনবাবুর ডাক আসতে লাগল অপরাধী ধরার কাজে সাহায্যের জন্য।

পুলিশের চাকরিতে কাজে লাগবে ভেবে নীতিনবাবু দিল্লির ইন্সটিটিউট অব ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড ফরেনসিক সায়েন্স থেকেও বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে আসেন। এছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বছরের শিল্প সমালোচনায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটিও পাশ করেন। শুধু আঁকার নয় আর একটি বিষয়েও তিনি তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, যা থেকে কলকাতা পুলিশ বিভাগকে সাহায্য করে চলেছেন। এটি হল ফটোগ্রাফি। রঙ তুলি, পেন্সিল নিয়ে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে পটু এই শিল্পী ক্যামেরার শাটার টেপার কাজে। দমদম ফটোগ্রাফি অ্যাসোসিয়েশন থেকে তিনি এ জন্য সার্টিফিকেট কোর্সও করেছেন। কিন্তু এত সব করার পরেও আর্থিক দৈন্যতার জন্য চিত্রকর নীতিন বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না। রুটি রুজির তাগিদে তাকে যোগ দিতে হল হোমগার্ড–এ, সেখান থেকে কলকাতা পুলিশের মামুলি সিপাই পদে। তবে সান্ত্বনা ছিল একটাই। সিপাই হলেও পুলিশের কাজে সাহায্যের জন্যই তাঁকে ছবি আঁকা এবং তোলা দুটোই করতে হবে বলা হয়েছিল। শিল্পী হিসাবে অনেক কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও নীতিনবাবু কিন্তু খুশিই হয়েছিলেন সেদিন। সেই থেকেই চলা শুরু হল পেশাগত জীবনে। নিজের স্বপ্নকে জড়িয়ে দিলেন পেশার সঙ্গে। অত্যন্ত লাজুক, স্বল্পভাষী মানুষটি হতে চেয়েছিলেন এক ক্ল্যাসিক চিত্রশিল্পী কিন্তু তা যখন আর্থসামাজিক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে আর হয়ে উঠল না তখন পুলিশের চাকরির মধ্যেই নিজেকে শিল্পী হিসাবে বড় মর্যাদা, সম্মান পেতে হবে এই চেষ্টাটাই হল তাঁর চ্যালেঞ্জ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমেরিকার বিজ্ঞানী হিউ ম্যাকডোনাল্ড ছবি আঁকার এই প্রথাটি আবিষ্কার করেন, পদ্ধতিটির নাম দেন 'আইডেন্টিফিট'। একই পদ্ধতিতে ফটো জোড়া দিয়ে নতুন মুখ সৃষ্টি করলেন তিনি। নাম হল তার 'ফটোফিট'। আইডেন্টিফিট এবং ফটোফিট পদ্ধতির কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশ হতেই লাফিয়ে উঠলেন আমেরিকার পুলিশ বাহিনীর সদর দপ্তর। বহু অপরাধীর হদিশ পাচ্ছিলেন না তাঁরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা চেহারার যে বিবরণ পুলিশকে দিয়েছেন তা দিয়ে পুলিশ অপরাধীদের খুঁজে বার করতে পারছিলেন না। হিউ ম্যাকডোনাল্ড প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ শুনলেন। তারপর নিজস্ব আইডেন্টিফিটের অ্যালবাম খুলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দেখাতে শুরু করলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা অ্যালবাম থেকে বেছে ছিলেন তাঁদের দেখা অপরাধীর মুখের টুকরো টুকরো অংশের ড্রইং। সেগুলো জড়ো করতেই ফুটে উঠল প্রকৃত অপরাধীর মুখ। ১৯৬০ থেকে আমেরিকার পুলিশ বাহিনী অপরাধী ধরতে চালু করল আইডেন্টিফিট এবং ফটোফিট পদ্ধতি। একে একে ব্রিটেন এবং জাপান বহুদেশই এই পদ্ধতি চালু করেছে। হিউ ম্যাকডোনাল্ডের সেই পদ্ধতি অবশেষে চালু হল এদেশেও। দিল্লির ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ–এ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ওই একটি জায়গা ছাড়া এদেশের অন্য কোন রাজ্যে এখনও ওই পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়নি। অথচ প্রতিটি রাজ্যের পুলিশ বাহিনীই স্বীকার করেছেন অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি যথেষ্ট সহায়ক। তবু করা সম্ভব হয়নি। মূলত পরিকল্পনার অভাবে। হিউ ম্যাকডোনাল্ডের সেই বৈজ্ঞানিক শিল্প এ দেশে ব্যাপক প্রচলন না হলেও কলকাতা পুলিশের

विशेष पुलिस स्थापना
SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT
कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग
Deptt. of Personnel and Adm. Reforms
(गृह मंत्रालय)
(Ministry of Home Affairs)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
प्रशंसा पत्र
COMMENDATION CERTIFICATE

श्री........................
के हेतु........................को........................

Granted to Mr. Nitin Kumar Biswas, Const., GOW/CBI/Calcutta........ प्रदान किया गया
for Rs. 100/-(Rs. One hundred only) for his good work done in RC 2/82-GIU(F).
(attempt was made on the life of Jordanion Ambassador.)

तारीख
Dated.....................197

पुलिस अधीक्षक
SP/Deputy Inspector General of Police
विशेष पुलिस स्थापना
Special Police Establishment

Rajasthan Police
Commendation Certificate

Granted to SH. NITIN KUMAR BISWAS, PHOTOGRAPHER OF CALCUTTA POLICE (D.D.) resident of CALCUTTA
Village ____ Police station - District -
in recognition of rendering valuable assistance in the investigation of Case FIR No. 139/86 U/s 302 IPC P.S. Sojat City (Rajasthan).
with Cash Reward of Rs. 100/-.

(R.K. BAIJAL)
Special Inspector General of Police
C.I.D. (Crime & Vigilence)
Rajasthan, JAIPUR

Place JAIPUR.
The 30th Aug.' 1986

সি বি আই ও রাজস্থান পুলিশের দেওয়া প্রশংসাপত্র

কনস্টেবল ফটোগ্রাফার শিল্পী নীতিন বিশ্বাস সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় শুধুমাত্র তুলির আঁচড়ে এবং পেন্সি-লের সাহায্যে এ পর্যন্ত বহু রহস্যের উদ্ঘাটন করে-ছেন। শুধুমাত্র মুখের বর্ণনা শুনেই মানুষের মুখমণ্ডলের হুবহু ছবি এঁকে দেওয়ার এক বিরল প্রতিভার অধিকারী এই চিত্রকরটি কলকাতা পুলিশ সহ সারা দেশের পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগকে গত কয়েক বছর ধরে সাহায্য করে আসছেন। একমাত্র নীতিনবাবুর জন্যই বহু বড় বড় ক্রাইমের হিল্লে করতে পেরেছেন ঝানু গোয়েন্দারা। মুখে বা কাগজে কলমে বিভাগীয় প্রশংসাও পেয়েছেন তার জন্য। ভারত সরকারও তাঁকে বহু অ্যাওয়ার্ড—এ প্রশংসিত করেছেন। কিন্তু ব্যস, এই পর্যন্তই। বিভাগীয় কর্ণধাররা এই পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান এবং সৎ শিল্পীটিকে উৎসাহিত করার জন্য আজ পর্যন্ত একটি প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেন নি। অথচ যে কাজে রয়েছে জীবনের ঝুঁকি এবং প্রতিকূলতা সব কিছুকে উপেক্ষা করে নীতিনবাবু একের পর এক বড় বড় চাঞ্চল্যকর ডাকাতি, অপহরণ বা খুনের ঘটনায় দুঁদে দুঁদে গোয়েন্দারা যখন হিমসিম খেয়েছেন তখন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা শুনে আসামীর মুখের সম্ভাব্য ছবি এঁকে কেল্লাফতে করেছেন নীতিনবাবু। এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য কলকাতার বাইরেও ডাক পড়েছে তাঁর বারবার। সি.বি.আই. কর্তাদের কাছে তিনি তো এখন প্রায় অপরিহার্য। সারা ভারত জুড়ে হৈ চৈ হয়েছে এমন মারাত্মক ক্রাইম—এরও হিল্লে করেছেন। এই ধরনের বিশেষ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। ১৯৮২ সালে দিল্লিতে নিরঙ্কারীবাবা খুন হন, ওই একই বছরে রাজধানীতে কুয়েতের রাষ্ট্রদূত খুন হলেন। ১৯৮৩ তে দিল্লিতে জর্ডনের রাষ্ট্রদূত নিহত হলেন। ১৯৮৭ সালে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে শিখ উগ্রপন্থীদের ছ' কোটি টাকা লুঠ। কলকাতার বা স্থানীয় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—৮৭—তে শিয়ালদা—রানাঘাট ট্রেন লাইনে ইছাপুর, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি স্টেশনের মাঝে ডাকাতি করে চলন্ত ট্রেন থেকে তিনজন যাত্রীকে ঠেলে দিয়ে খুন, এরপর একই বছরে আলিপুর মার্ডার কেস, ঐ '৮৭'তেই গড়িয়াহাটের খ্যাত শিল্পপতি টাটাদের বাড়ি ডাকাতি। ১৯৮৭ সালের আরও কয়েকটি উল্লেখ্য ঘটনা হল—ফুলবাগানে ডালমিয়ার বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকার জিনিসপত্র চুরি, বিখ্যাত সেতার শিল্পী জয়া বিশ্বাসের বাড়িতে বড় ধরনের চুরি, এবং লেখার শুরুতে যে ব্রেসব্রিজের ঝুপড়ি থেকে গীতা মালির ১৬ দিনের শিশু চুরির চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এর পরের বছরে অর্থাৎ ১৯৮৮ তে বেনেপুকুর থেকে এক বছরের আর একটি শিশু চুরির ঘটনা। অবশ্য নিজের প্রতিভা বা দক্ষতার জন্য উনি কলকাতা সি.বি.আই. বা বাইরের রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন প্রচুর। কিন্তু মৌলিক সমস্যার সমাধান কেউ করেন নি এখনও পর্যন্ত। মাস পেরিয়ে একের পর এক বছর কেটে যাচ্ছে, কিন্তু কলকাতা পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা তাঁর এই বিশেষ প্রতিভা দক্ষতা এবং সর্বোপরি কাজের প্রতিদান স্বরূপ একটা পদোন্নতির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন নি আজও। এমন কি একটি কোয়ার্টারের ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়নি। সেই সুদূর উত্তর ২৪ পরগণার বেড়াচাঁপা থেকে প্রতিদিন হাসনাবাদ ও বসিরহাট এক্সপ্রেস বাসে বহু কষ্ট করে তাঁকে লালবাজারে আসতে হয়। এইভাবেই তাঁকে তাঁর ছবির কাজ করতে হয়, রাত্রিতে ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত ছবি আঁকেন। সহকর্মী ফটোগ্রাফার বন্ধু অনিরুদ্ধ চক্রবর্তীর সঙ্গে শিল্পের বিনিময় হয় খুব ভাল। ফলে বহু রাত তাঁরা কর্মস্থলে রাত জেগে ছবি আঁকেন। ফটোগ্রাফি বিভাগের ও.সি. পরিমল মিত্র নীতিনবাবুর নিষ্ঠা এবং দক্ষতায় পঞ্চমুখ। এবং সহকর্মী সকলেই একবাক্যে তাঁর প্রশংসা করলেন। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্য, তাঁকে এখনও মাত্র বারোশ টাকার বেতনভোগী একজন সামান্য সিপাই—এর পদমর্যাদা ছাড়া আলাদা কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়নি।

তবে এ বিষয়ে নীতিনবাবুর বক্তব্য খুব পরিষ্কার। বললেন, রুটি রুজির তাগিদে ছবিকে নেশা থেকে পেশায় পরিণত করেছি। পেয়েছি অনেক কিছুই। তবে যতটা আশা করে মানুষ ততটা হয়ত পাওয়া যায় না। তবুও মানুষ আশাবাদী। দেখা যাক, অনাগত ভবিষ্যত কি ইঙ্গিত দেয়? মানসিক দিক থেকে আমি খুবই তৃপ্ত। কারণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত বড় বড় ঘটনার কিনারা করতে পারছেন না গোয়েন্দা বিভাগ, তখন আমাকে সম্মান জানিয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং আমার সাধ্যমত ক্ষমতা দিয়ে আমি চেষ্টা করি ঘটনা শুনে তা উদ্ঘাটন করার। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিশ্চয় দেখেছেন আমি কৃতকার্য হয়েছি। এবছরই বিখ্যাত খেলোয়াড় সৈয়দ মোদী হত্যার ব্যাপারে ডাকা হয়েছিল আমাকে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমাকে আর প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু এটাই আমার কাছে বড় মেন্টাল স্যাটিসফেকশন। ইচ্ছে আছে আগামী দিনগুলিতে পেশাদার নয় সম্পূর্ণ শৈল্পিক ছবি এঁকে নিজের শিল্পী—সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো।

আবদুল কাইউম

খাসি সম্প্রদায়ের সংস্কারগত কারণে মৃতদের আত্মার প্রতি নিবেদিত শিলার্খণ্ড–গুলি এখনও মেঘালয়ের প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আত্মাদের সেই আশ্চর্যজনক বিশ্রাম শিলাগুলি নিয়ে প্রতিবেদন।
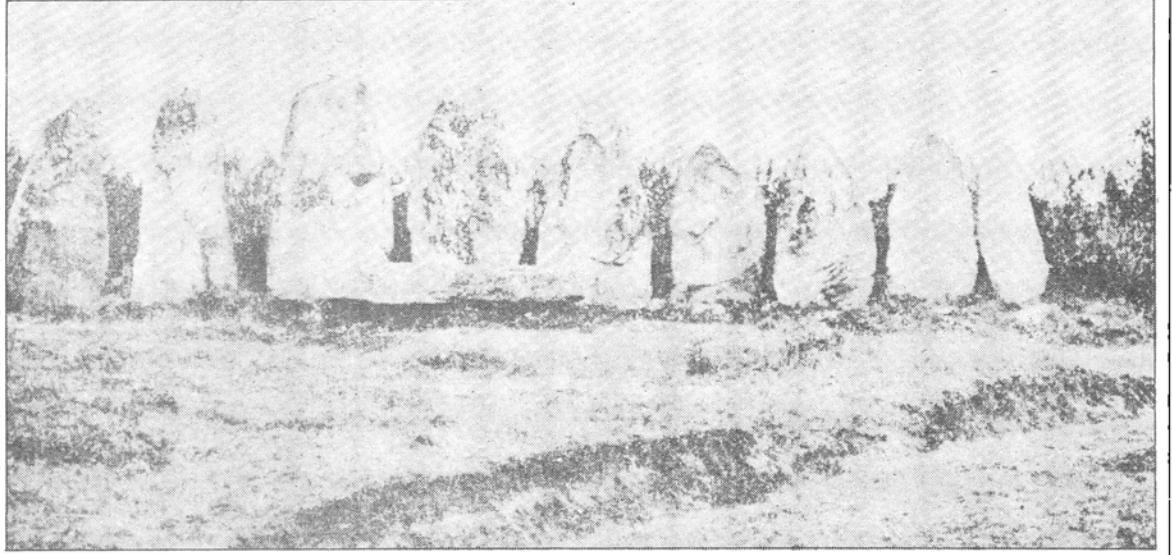
লায়েতকরের বিখ্যাত একশিলা স্মৃতিস্তম্ভ

মেঘালয়ের মনোলিথ : আত্মার বিশ্রামশিলা

অন্যমনস্ক দৃষ্টি মেলে চেরাপুঞ্জির পাহাড়ের কোলে ভেসে যাওয়া ছাই রংয়ের মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুচিয়াং। তৃণাবৃত পাহাড়ের গায়ে ঢেউ তোলা মেঘের খেলা। বাতাসে বয়ে যাওয়া মাতাল করা নেশা।

বলি, থামলেন কেন? আপনার কা–রাইতিয়াং-এর গল্পটা শেষ করুন।

শিলং এর একটি কলেজের ভূ–তত্ত্বের অধ্যাপক ফ্রেডরিক সুচিয়াং মৃদু হেসে বলেন, চলুন, ওই একশিলার ধারে বসে কা–রাইতিয়াং এর গল্প শেষ করব।

চেরাপুঞ্জি থেকে দু' কিলোমিটার নিচে থেরিয়া সড়কের ধারে ছোট নদীর বুকে মেঘালয়ের বিখ্যাত একশিলা বা মনোলিথ এখনও পড়ে আছে। ১৮৯৭ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের আগে পর্যন্ত এই মনোলিথ নদীর উপর সেতুর কাজ করেছে। ভূমিকম্পে একশিলা দিয়ে তৈরি আশ্চর্য সেতুটি ধ্বসে গেলেও, বিরানব্বই বছর ধরে বিস্ময়কর এই শিলাটি নদীর বুকে মেঘালয়ের মনোলিথের অনন্য সাক্ষী হয়ে আছে।

নদীর ধারে এসে পাথরটির দিকে তাকিয়ে সুচিয়াং বলেন, এখন কি আমরা এই শিলাখণ্ডটি দিয়ে নূতন করে সেতু নির্মাণ করতে পারব? সম্ভবত নয়। কিন্তু কা–রাইতিয়াং পেরেছিলেন।

–কা–রাইতিয়াং এর গল্প বলুন।

সিয়েম গোত্রের রাজদুহিতা ছিল রাইতিয়াং। কুমারী রাইতিয়াং প্রতিদিন নদীতে মাছ ধরত। একদিন নদীতে মাছ ধরছিল সে। হঠাৎ জলের মধ্য থেকে একটি অনুপম পুরুষ তার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার দেহের জ্যোতিতে চোখ মেলে তাকাতে পারে না রাইতিয়াং। গম্ভীর অথচ সুমধুর কণ্ঠ তার। স্বর্ণদেহী পুরুষটি তার দিকে এক থলে মোহর এগিয়ে দিয়ে বলে, ধর। সম্মোহিতা রাইতিয়াং মোহরের থলেটি হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করে।

পুরুষটি আদেশের সুরে বলে ওঠে, তুমি কখনো বিয়ে কোরো না। আজীবন কুমারী থেকো। আর এই মোহর দিয়ে নদীর উপর একশিলার একটি সেতু তৈরি কোরো। নদীর দু'পাড়ের মানুষের মিলন ঘটবে।

সুচিয়াং থামেন। শিলাটির দিকে তাকিয়ে বলেন, এটাই হচ্ছে সেই শিলা। এত বড় মনোলিথ সম্ভবত দেশের আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

সুচিয়াং বলেন, খাসিদের ইতিহাস আর ধর্মীয় আচারের সঙ্গে মনোলিথের সম্পর্ক বড় নিবিড়!

–আপনি মনোলিথের গল্প শোনান।

মেঘালয়ের নিয়ত পরিবর্তনশীল মেঘ, তৃণাবৃত পাহাড় আর ঘন সবুজ বনানীর মধ্যে যেমন রূপকথার মত রোমাঞ্চকর প্রেম আছে, তেমনি মনোলিথ দিয়ে নির্মিত খাসি স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পূর্বসূরীদের অর্চনার ধারাবাহিকতা মেঘালয়ের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে মাথা উঁচু করে যত্রতত্র দাঁড়িয়ে আছে একশিলা স্মৃতিসৌধ।

সুচিয়াং বলেন, বিস্ময়ের বিষয় কি জানেন? একশিলা স্মৃতিসৌধগুলি মানুষের মনের আড়ালেই থেকে যায়। বড় কেউ একটা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে না। সুচিয়াংয়ের কথা শুনে মনে হয়, এই অকারণ অবহেলায় তিনি দুঃখিত।

সুচিয়াং ভূ–তাত্বিক। হয়ত সেজন্যেই মনোলিথ তাঁর মনকে বারবার আকৃষ্ট করে।

বলি, খাসি ভাষায় আপনারা স্মৃতিসৌধকে কি বলেন?

–কিনমোউ–অর্থাৎ শিলা দিয়ে নির্দিষ্ট স্মরণ চিহ্ন।

–প্রিয়জনের স্মৃতিকে অক্ষয় করতে স্মৃতি-সৌধ তো প্রায় সব দেশেই নির্মাণ করা হয়।

সুচিয়াং বলেন, একমত। কিন্তু জেনে রাখুন, খাসি মনোলিথ কোনদিক থেকেই সমাধিস্তম্ভ নয়। খাসি একশিলা মূলত সিনোটাফ্ অর্থাৎ অন্যত্র সমাধিস্থ আপনজনের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতিসৌধ।

মাতৃতান্ত্রিক খাসিয়ারা কা–ইয়োবেই বা আদি মায়ের আরাধনা করে। সুচিয়াং বলেন, খাসি মেন্‌হিরে উর্ধমুখী দাঁড়ানো সব মনোলিথের সামনে যে অজস্র চ্যাপ্টা একশিলা সমভূমিতে স্থাপিত-এ সবই আদি মা কা–ইয়োবেইর সম্মানে নির্মিত। কোন এক কালে সমভূমিতে রক্ষিত শিলার উপর আদি মায়ের উদ্দেশ্যে খাবার রাখা হত। এখনও কিন্তু খাসি সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মান্তর্করণের পর, পূর্ব সমাজব্যবস্থার সব রূপ রস পাল্টে গেছে। যারা এখনও ধর্মান্তরিত হয়নি, তাদের মধ্যে এখনও এই সংস্কার কিছু কিছু বহাল রয়েছে। অবশ্য জৌলুস কমে আসছে।

খাসিরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর, তাদের আদি সমাজ, সংস্কার, ধর্মীয় আচার আচরণ ও শব সৎকারের অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে। খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পূর্বে তারা শবদাহ করতো। এখন কবর দেয়। সুচিয়াং বলেন, মাতৃশাসিত হলেও খাসিরা আদি পিতা বা কা–ইয়োবেইর স্বামী উ-থাওলাঙকে সমান শ্রদ্ধা জানাত।

গাঁটের ব্যথা ?

মুভ লাগান, আরাম পান

কোমরের ব্যথা ?
হাঁটুর ব্যথা ?

বেশী বয়স বা অত্যধিক পরিশ্রমের জন্যে প্রায়ই আপনার দেহের গাঁটে-গাঁটে যেমন হাঁটু, পিঠ, কোমরের সন্ধিতে রীতিমত বেদনায় ভুগতে হয়। দেহের গ্রন্থিতে যে পিচ্ছিল তরল থাকে তা কমে যাওয়াতেই এরকম হয়। এতে হাড়ে-হাড়ে ঘষা লাগে আর আপনাকে যাতনায় উঃ আঃ করতে হয়।

ব্যথার মূল অবধি চট্‌পট্‌ পৌঁছে যায়

মুভ-এ আছে ভাপ হয়ে উড়ে যাওয়া তীব্র প্রভাবশালী ঘনীভূত প্রাকৃতিক তেল, যা আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ ক'রে ব্যথার একেবারে মূল জায়গায় অর্থাৎ গ্রন্থিতে গিয়ে পৌছায় ও বেদনার উপশম করে।

দ্রুত কার্যকরী

ভাপ হয়ে উড়ে যাওয়া প্রাকৃতিক তেল দিয়ে তৈরী মুভ একবার লাগালেই রক্তসঞ্চালন দ্রুত হয়, উপরন্তু এটি ফিরিয়ে আনে পিচ্ছিলতাদায়ী তরল, আর যাতনা থেকে দ্রুত আরাম পেয়ে আপনিও ফেলেন স্বস্তির নিশ্বাস।

বহুক্ষণ প্রভাবশালী

মুভ লাগাতেই এর অনন্য ফর্মূলায় তৈরী আধার অবিরত স্বাভাবিক পিচ্ছিলতাদায়ী তেল নিসৃত হতে দেয়, ফলে ব্যথার জায়গাটি বেশ গরম হয়ে থাকে ও গতিশীল হয়ে ওঠে, অথচ মোটেই ত্বক জ্বালা করেনা। বরং বেদনার উপশমে আপনি হাসিমুখে কাজকর্ম চলাফেরা সবই করতে পারেন।

দ্রুত কার্যকরী। শীঘ্র আরাম।

গাঁটের ব্যথার মহৌষধ

পরশ ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
জিতেন্দ্র চেম্বার্স, আশ্রম রোড, আহমেদাবাদ ৩৮০ ০১৪
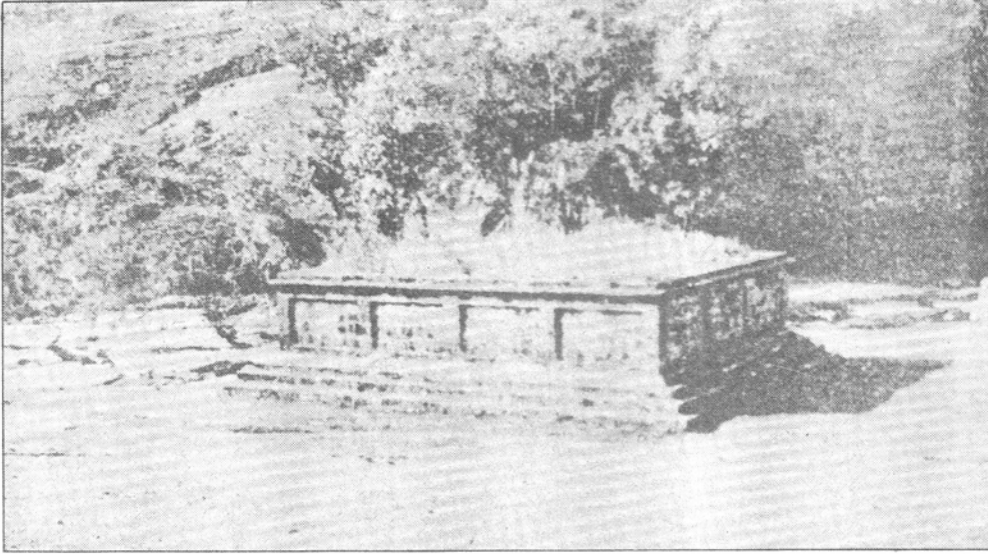
অ-ধর্মান্তরিত খাসিরা এখানে শবদাহ করে

রাইতিয়াং সেতুর পাশ থেকে হাঁটতে হাঁটতে আবার কিছুটা উপরে উঠি আমরা। মেঘেরা আপন পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঢেউ তুলেই চলেছে। পাইনের পাতায় শন্‌শন্‌ শব্দ। আরও তিন কিলোমিটার উপরে উঠে প্রায় এক কিলোমিটার অন্যদিক দিয়ে নামতে হবে। রাইতিয়াং থেকে আমরা যাব উম্‌প্টো। সেখানে মনোলিথের সারিবদ্ধ স্মৃতি-সৌধ রয়েছে। প্রতি সারিতে পাঁচটি করে মনোলিথ। উম্‌প্টোতে পৌঁছবার আগেই সুচিয়াং বলেন, এখানেও ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের চিহ্ন দেখতে পাবেন।

উম্‌প্টো মেন্‌হিরের কোন এককালের উর্ধ-মুখী সব মনোলিথ এখন ধরাশায়ী। একটি মাত্র মনোলিথ ভূমিকম্পের ধাক্কা থেকে বেঁচে আছে। কবে কোন্‌ সিয়েম (খাসি রাজা) পূর্বসূরীর উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিল, জানা যায় না। বিরানব্বই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কিন্তু ধরা-শায়িত মনোলিথগুলিকে কেউ উর্ধমুখী করেনি।

জিজ্ঞাসা করি, এর পেছনে কি কোন সংস্কার কাজ করে? সংস্কার যে নেই এমন কথা জোর করে বলতে পারেন না চার পুরুষের ধর্মান্তরিত সুচিয়াং। ধর্মান্তরিত জীবনে তাঁরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আদি খাসি সমাজের অনেক প্রথাই এখন ধরতে গেলে উঠে গেছে। স্মৃতিসৌধ পুনরায় স্থাপনে সংস্কারগত কোন বাধা আছে কি না, সুচিয়াং সে বিষয়ে কিছু জানেন না। একটি মনোলিথ দেখিয়ে সুচিয়াং বলেন, ভাল করে লক্ষ্য করুন, এই শিলাটির মাথায় একটি মুকুট রয়েছে। আর এটিকে রাখা হয়েছে সারির মাঝখানে। খাসি ভাষায় একে বলা হয়, মৌক্‌নি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সব শিলাগুলি নিখুঁত ভাবে কোঁদানো। মাওকিনথেই বা ডোলমেন যা নারীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় তা বড় সুচারুভাবে কোঁদাই। একশিলায় কোঁদানো মুকুট খাসিদের মেন্‌হিরে খুবই কম দেখা যায়। মনে মনে ভাবি, ধরায় শায়িত অপূর্ব মনোলিথগুলিকে আবার সারিবদ্ধভাবে সাজালে শুধু সৌন্দর্য্যই বৃদ্ধি পাবে না-খাসি একশিলা স্মৃতিসৌধ মানুষের কাছে নূতন করে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

সুচিয়াং বলেন, সমতলে রক্ষিত চ্যাপ্টা সব চেয়ে বড় একশিলা দেখতে পাবেন জয়ন্তিয়ার নার্তিয়াং-এ আর খাসি পাহাড়ের লায়েত ইন্‌কটে।

আমরা শিলং ফিরে গিয়ে নার্তিয়াং যাব। নার্তিয়াং এর মনোলিথ স্মৃতিসৌধ উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। লায়েত ইনকটের মনোলিথের আয়তন অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য। তার আয়তন-দৈর্ঘ্যে সাড়ে আটাশ ফুট আর প্রস্থে সাড়ে তের ফুট। এবং উচ্চতায় এক ফুট আট ইঞ্চি।

মাটিতে শায়িত নার্তিয়াংয়ের মনোলিথ যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি, টেবিল-স্টোন, তার দৈর্ঘ্য সাড়ে ষোল ফুট আর প্রস্থ সাড়ে চৌদ্দ ফুট।

অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত খাসি, জয়ন্তিয়া আর গারোদের জীবন-সমাজ ও পরিবেশ নিয়ে অনেক সমীক্ষা করেছেন। কিন্তু খাসিদের একশিলা স্মৃতি-স্তম্ভ ও মেঘালয়ের মেগালিথ নিয়ে বিশেষ কোন সমীক্ষা আজও হয়নি।

স্মৃতিসৌধ নির্মাণে খাসিরা কেন মনোলিথ ব্যবহার করে তার কারণ খুব স্পষ্ট নয়। ধর্মান্তরিত হবার পর খাসি সমাজে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আদি সংস্কার ও প্রথাগুলি ধর্মান্তরিত সমাজ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। সুচিয়াং বলেন, ভাল কি মন্দ জানি না। তবে কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতি হারিয়ে গেলে আমার কষ্ট হয়। জানি, সভ্যতা এক জায়গায় স্থায়ী নয়। পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতিও তার গতিপথ পরিবর্তন করে। কিন্তু অতীতের মূল্যমানকে বর্তমানের আলোকে বিচার করে অপ্রচলিত বলতে আমি রাজি নই।

সুচিয়াং বলেন, খাসিদের মনোলিথ ব্যবহারের রহস্য আমার কাছে অজানা। যারা জানেন, কেন জানি না, তারা রহস্যটাকে শামুকের খোলের মধ্যে গুটিয়ে রাখেন।

বলি, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পি-আর গর্ডন মনোলিথ নিয়ে কিছু কাজ করেছিলেন। তাই না?

-হ্যাঁ। সুচিয়াং বলেন, সম্ভবত তিনি তাঁর নিজের বিচারবুদ্ধির অনুসারী কথাই আমাদের বলেছেন। প্রকৃত রহস্য তিনিও উদ্ধার করতে পারেন নি। তবে, তাঁর ধারণাভিত্তিক সিদ্ধান্তকে আমরা কমবেশি মেনে নিতে পারি।

খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের বহু জায়গায় এই স্মৃতিসৌধ দেখতে পাওয়া যায়। এই শিলা-সৌধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মৃত ব্যক্তির অস্থি আর ভস্ম। স্মৃতিসৌধর কোন গবাক্ষ থাকে না। বৃহদাকার পাথরের সম্মুখ ভাগের কিছু অংশ খোদাই করে ভস্মাবশেষ মনোলিথের অন্তরস্থ করা হয়।

সুচিয়াং বলেন, মনোলিথ ব্যবহারের গোপন রহস্য সবটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে কিছু সংস্কারের কথা আপনাকে বলতে পারব।

বলি, তার আগে আপনি লায়েতকুরের শিলা-সৌধের কথা বলুন।

বলছি। তবে একদিন আপনাকে সেখানে যেতে হবে। নিজের চোখে দেখে আসুন মেনোলিথের স্মারক চিহ্ন। একটা কথা মনে রাখবেন-খাসি স্মৃতিসৌধ কখনোই জোড় সংখ্যায় হয় না। শিলা-সৌধ সব বিজোড় সংখ্যায় নির্মিত হয়। যেমন, এক-তিন-পাঁচ। সাধারণত তিন বা পাঁচের মধ্যেই মনোলিথ নির্মিত স্মৃতিসৌধ দেখা যায়। ব্যতিক্রম লায়েতকরের স্মৃতিসৌধ। স্মৃতিসৌধটি নয়টি মনোলিথ দিয়ে তৈরি। সম্মুখে বিরাট চ্যাপ্টা টেবিল-স্টোন ডানদিক থেকে বাঁদিক গুনে গেলে পঞ্চম মনোলিথকে খাসি ভাষায় বলা হয়, উ মওনি অর্থাৎ মামার স্মৃতিস্তম্ভ। আর তার ডানে বাঁয়ের সৌধদু'টিকে বলা হয়, কি মউ পিরসা কিপারা-অর্থাৎ মামাতো ভাই ও ভাইপোদের স্মৃতি-সৌধ। ভূ-পৃষ্ঠে শায়িত বিরাট টেবিল স্টোনকে বলা হয় কা ইয়োবেই টিস্মেন আদি মায়ের স্মরণ সৌধ।

আজ পর্যন্ত কেউ জানে না, কে কবে প্রথম মনোলিথ দিয়ে পূর্বসূরীদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। ধর্মান্তরিত হবার পর সৌধ নির্মাণে ভাঁটা পড়েছে। নির্মিত সৌধগুলি যত্নের অভাবে ক্ষয় পেতে শুরু করেছে। প্রকৃতির নিয়মেই হয়ত একদিন লায়েতকরের অপূর্ব মনোলিথের স্মৃতিসৌধ ভূমিশয্যা নেবে। হয়ত একদিন নার্তি-য়াংয়ের মহৎ স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বসে পড়বে। সুচিয়াং বলেন, লায়েতকরের মনোলিথ গ্রানাইট্‌ ও স্যান্ড-স্টোনের। খাসি পাহাড়ে এই দু'টি শিলার কোন অভাব নেই।

মনোলিথ দিয়ে স্মৃতি সৌধ নির্মাণে খাসিরা

কিছু নিয়ম–কানুন পালন করে । সবচেয়ে বড় মনোলিথকে মাঝে রেখে অন্যান্য মনোলিথ উচ্চতা অনুসারে সাজায় ।

নংক্রেমে যে স্মরণ সৌধ রয়েছে তার উপরিভাগ সুন্দরভাবে খোদানো । দূর থেকে মনে হয় মানুষের একটি মুণ্ডিত মস্তক ।

নার্তিয়াং–এ আমাদের সঙ্গী হয় সারজা ভিয়েংদো । প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মী । প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রী । মনোলিথ নিয়ে কাজ করছে ।

সুচিয়াং বলেন, নার্তিয়াং পৌঁছুবার আগে জয়ন্তিয়াদের মনোলিথ ব্যবহারের একটি গল্প শোনাব ।

সারজা বলে, আপনি কি নার্তিয়াং স্মৃতি স্তম্ভের গল্প শোনাবেন ?

সুচিয়াং বলেন, না প্রথমে একটি অজানা কাহিনী শোনাব ।

কাহিনীটির সঙ্গে জনৈকা ডাকসাইটে মহিলা জড়িত । সারজা হেসে বলে, আবার মহিলা কেন ?

সুচিয়াং গম্ভীর হলেও তাঁর ভেতরে ভেতরে একটা রসবোধ মাঝে মাঝে সক্রিয় হয়ে ওঠে । তখন ভূতত্ত্বের অধ্যাপকের মুখের গাম্ভীর্যের আবরণ মুক্ত হয়ে যায় । তখন তিনি হয়ে ওঠেন এক দিলখোলা গল্পকার ।

বলি, ক্ষতি কি ? শিলং থেকে নার্তিয়াং ঘন্টা দু'য়েকের পথ বেশ আনন্দেই কেটে যাবে । কিন্তু মহিলাটিকে আপনি ডাকসাইটে বললেন কেন ?

সুচিয়াং বলেন, গল্পটি শুনলেই বুঝতে পারবেন ।

সারজা তার জেন সেম্ ঠিক করে নিয়ে সুচিয়াংয়ের দিকে ঘুরে বসে বলে, তা হলে শুরু করুন ।

ডাকসাইটে মহিলার গল্পের চেয়ে খাসিদের মনোলিথ ব্যবহারে আমার আগ্রহ বেশি । বলি, মনোলিথের গোপন কথা আগে বলুন ।

সারজা বলে, আমি বলব ?

সুচিয়াং তার মুখের দিকে একবার তাকান । সারজা মুখ নামিয়ে নেয় । তার সঙ্গে যে সুচিয়াংয়ের হৃদয়ের একটা সম্পর্ক আছে, তা আমার জানা ছিল না । কেউ না বলে দিলে, তাদের ব্যবহারের মধ্যে তা কিছুতেই ধরা পড়ে না ।

সুচিয়াং বলে, বল । কোথাও ভুল হলে আমি শুধরে দেব । সারজা বলে, খাসিরা নিজেদের মত মনোলিথের নামকরণ করে নিয়েছে । বিভিন্ন নামের মনোলিথ দিয়ে তারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্মরণচিহ্ন নির্মাণ করে । একটা শিলার নাম মউলাইন্তি । মউলাইন্তি তৈরি করা হয় আত্মার বসার জন্যে । মৃত্যুর পর সমাধিক্ষেত্রে যাবার পথে মউলাইন্তিতে বসে তারা বিশ্রাম করে ।

অদ্ভুত !

সারজা বলে, মউনাম নির্মাণ করা হয় পিতা-মাতা বা নিকট আত্মীয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ।

সারজা সুচিয়াংকে জিজ্ঞাসা করে, মউ–উম্‌কোই কেন তৈরি করা হয় ?

বলি, নামটা আবার বলুন ।

মউ–উমকোই ।

সুচিয়াং বলে, উম্‌কোই মানে জলাশয় । মউ-উম্‌কোই জলাশয়ের নির্দেশ বহন করে । সেই জলাশয়ের জল দিয়ে অপঘাতে মৃত ব্যক্তির ভস্ম আর অস্থি পরিষ্কার করা হয় ।

সারজা বলে, মউলাইন্তি হচ্ছে আত্মার চলার পথের বিশ্রামের শিলা ।

সবই কি মনোলিথ ?

সুচিয়াং বলেন, হ্যাঁ । সব মনোলিথ ।

আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে এক সময় আমাদের গাড়ি জোয়াই পৌঁছে যায় ।

আমরা যাব নার্তিয়াং । এই নার্তিয়াং–এ কোনও এক সময় জয়ন্তিয়া রাজাদের রাজধানী ছিল । জোয়াই থেকে মাত্র মিনিট কুড়ির পথ । সারজা বলে, মউলাইন্তি মউনামের মত বড় নয় । এখনও পথ চলতে অনেক মউলাইন্তি দেখতে পাবেন । স্মৃতি-সৌধের কাছাকাছি তাদের বেশি দেখা যায় ।

মউনাম তৈরি করা হয় মৃত পিতা–মাতা অথবা পূর্ব পুরুষদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে । মউনাম সব সময় বি–জোড় হবে । তিন পাঁচ–সাত, নয় বা এগারো । বেশির ভাগ শিলাসৌধ তিন বা পাঁচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । শুধু লায়েতকর ব্যতিক্রম । সেখানে নয়টি মনোলিথের সমাবেশ । সুচিয়াং বলেন, একটা কথা মনে রাখা দরকার । সোজা দাঁড়ানো একশিলা হল পুরুষ স্মৃতিসৌধ–আর চ্যাপ্টা টেবিল–স্টোন নারীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মাটিতে রাখা হয় ।

সারজা বলে, এ দুটিরও খাসি নাম আছে । সোজা দাঁড়ানো স্মৃতিসৌধকে খাসিরা বলে, মউ-সিনর‍্যাঙ আর ভূমিতে শায়িত টেবিল স্টোনকে বলা হয় মউকিন্‌থেই । এই মউকিন্‌থেইয়ের উচ্চতা মাটি থেকে প্রায় দু'ফুট । পূর্ব পুরুষদের আত্মার তৃষ্ণা আর ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাসিরা এই মউকিন্‌থেই–এ খাবার রাখে । অবশ্য দিন-কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আচার আচরণের পরিবর্তন এসে গেছে । ধর্মান্তরিত খাসিরা এখন আর এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না । আর যারা এখনও

নার্তিয়াংয়ের মনোলিথ
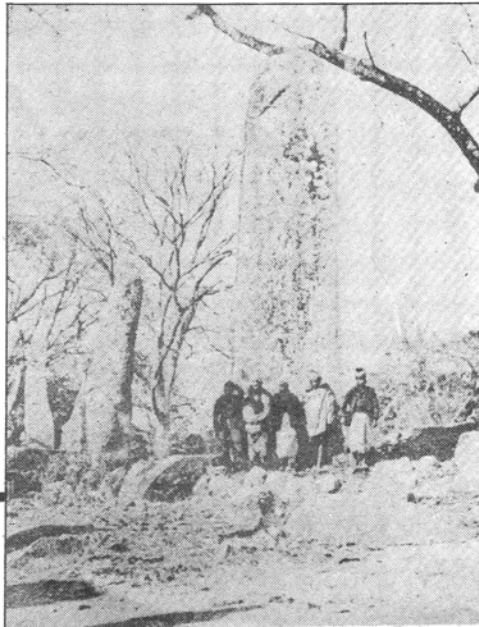
ধর্মান্তরিত হয়নি তারা নিজের ঘরে এই কাজ সম্পন্ন করে । এর জন্য তাদের আলাদা ঘর থাকে । ঠিক হিন্দুদের মন্দিরের মত । তারা এই ঘরকে বলে ইউসেঙ । সুচিয়াং বলেন, খাসিদের মত গারোরাও মনোলিথ দিয়ে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে । গারো ভাষায় তাকে বলা হয় কিমা ।

কিমা ?

সারজা বলে, হ্যাঁ । মণিপুরে নাগা পাহাড় আর আসামের মিকির হিলের খাসিদের অনুকরণে পূর্বপুরুষদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একশিলা দিয়ে, স্তম্ভ তৈরি করা হয় ।

বলি, এবার আপনি ডাকসাইটে মহিলার গল্প বলুন ।

সুচিয়াংয়ের ঠোঁটের ফাঁকে একচিলতে হাসির রেখা ফুটে ওঠে । বলেন, আমরা প্রায় ডাকসাইটে মহিলার স্মৃতিসৌধের কাছাকাছি এসে গেছি ।

সারজা বলে, তাহলে সেখানেই আগে যাওয়া যাক ।

সুচিয়াং বলেন, আগে মহিলাটির নাম বলি । কা–কামপাতওয়াত্ ।

কা–কামপাতওয়াত্ । মনে মনে বার কয়েক-নামটি উচ্চারণ করি ।

সুচিয়াং বলেন, কা–কামপাতওয়াত্ ছিলেন বড় একগুঁয়ে আর অত্যন্ত বদমেজাজী । তিনি জীবনে ত্রিশবার বিবাহ বিচ্ছেদ করেছেন ।

–ত্রিশবার !

সারজা আর আমি প্রায় একসঙ্গেই বিস্ময় প্রকাশ করি ।

সুচিয়াং বলেন কোন স্বামীর সঙ্গে এক বছরের বেশি ঘর করেন নি । সুতঙ্গাতে সেই স্বামীদের শিলাসৌধ আছে । ত্রিশটি মনোলিথ সেই সব স্বামী-দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পোঁতা হয়েছিল । আর কা-কামপাতওয়াতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেখানে রাখা আছে বিরাট টেবিল স্টোন । অবসন্ন পথিক ঐ শিলায় বসে বিশ্রাম নেয় ।

গল্পটি খুবই তাড়াতাড়ি শেষ করেন সুচিয়াং । বলেন, আমাদের এখন যেতে হবে নার্তিয়াং । মেঘালয়ের সবচেয়ে বড় একশিলা স্মৃতিসৌধ ।

সুচিয়াংদের মুখে শুনেছি, সাতাশ ফুট উঁচু নার্তিয়াং শিলা স্মৃতিসৌধ ভারতের অন্যতম বিস্ময় । জয়ন্তিয়ারা এই সৌধকে নিজেদের ভাষায় বলে, কি–মাউ–জং–সিয়েম । বহুকাল আগে এই বিখ্যাত মনোলিথ স্মৃতিস্মারকটি তৈরি করে-ছিলেন জয়ন্তিয়া রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্য লস্কর । সৌধের সম্মুখভাগে যে বিরাট টেবিল স্টোনটি রাখা আছে–জয়ন্তিয়াদের রাজা ছাড়া আর কারো তাতে বসবার অধিকার নেই !

মেঘালয়ের মনোলিথের সঙ্গে খাসিদের অনেক রূপকথা আর কিম্বদন্তী আছে । সমীক্ষা হোক আর না–ই হোক, মনোলিথ মেঘালয়ের অনন্য সম্পদ ।

গোপালকৃষ্ণ রায়

মধ্যকলকাতার মেট্রোপোল বারের নর্তকী–সুখের নীড় রচনা করে বাঁচবে বলে বিয়ে করল। অগাধ অর্থ কি সুখ আনল জীবনে ? লিলির রহস্যজনক মৃত্যুর করুণ কাহিনী।

মেট্রোপোল বার

লিলি চক্রবর্তী

জীবন ঘূর্ণিতে নগরনটী

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে হলুদ রঙের ট্যাক্সিটা দ্রুতগতিতে এসে দাঁড়াল যাদবপুরের রাজা সুবোধ মল্লিক রোডের একটি ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে। রাত একটা কি সওয়া একটা। তাঁমাম এলাকা নিঝুম। শুধু মাঝে মাঝে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে রাস্তার কুকুর-গুলো চিৎকার করে উঠছে। ট্যাক্সির ভেতরে আলো জ্বলে উঠেছে। জনৈকা তরুণীকে দেখা গেল মানিব্যাগ বের করতে। টাকা বের করে ড্রাইভারকে দিয়ে সে নিচে নেমে এল। যুবতীটির সারা মুখ ঘামে ভেজা। পরনে দামী শাড়ি। সে তাড়া-তাড়ি ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

তামাম এলাকা ঘুমিয়ে থাকলেও দোতলার ফ্ল্যাটে আলো জলছে। বেল টিপতে টিপতে সে ক্লান্ত হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল। অনেকক্ষণ বেল বাজার পর দরজাটি সশব্দে খুলে গেল। একজন খালি গায়ে টলতে টলতে দরজাটা খুলে দিল। তার চোখ দুটো লাল। যুবতীটি ঘরে ঢুকেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর যুবকটির দিকে তাকিয়ে কড়া গলাতে বলে উঠল, 'বলো, আর কত মিথ্যে বলবে ? দ্য লায়ার !' দু–চোখে যেন আগুন ঝরছে। যুবকটি আচমকা দু–পা পিছিয়ে

গেল। তারপর আমতা আমতা গলাতে বলে উঠল, 'তুমি কি বলছ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না লিলি।'

—'বুঝতে পারছ না ? মিথ্যুক কোথাকার ! কতদিন মিথ্যে বলে চালাবে ?' লিলি রাগে প্রায় জ্বলতে থাকে। এক পা এক পা করে সে এগিয়ে আসে ঘরের ভেতর, 'এই সুন্দর চমৎকার ফ্ল্যাটটা দেখছ, এই ফ্ল্যাটটা আমার। এত আরাম, বিলাস ভোগ করছ, সবই আমার। আর তুমি দিনের পর দিন আমাকে শুধু প্রতারণা করে চলেছ ! তোমার সব জারিজুরি আমি ধরে ফেলেছি।'

যুবকটি এবার ছোট টেবিলটার কাছে এগিয়ে এসে মদের গ্লাসটা তুলে নিল। গ্লাসে তখনও বেশ কিছু তরল পানীয় রয়েছে। সেটা কয়েক চুমুক খেয়ে সশব্দে রেখে সে বলে ওঠে, 'লিলি, তুমি যদি ভালভাবে বাঁচতে চাও তাহলে এভাবে আমাকে ডিস্টার্ব করো না।'

এবার লিলি হাসতে থাকে, 'বউ এর টাকায় ফুর্তি করতে খুব মজা লাগে না—! খুব ফুর্তি, না শ্যামল ?'

—'লিলি !' শ্যামলের গলা কেঁপে ওঠে 'আমি তোমাকে শেষবারের মত বলছি, তুমি আর বাড়া-বাড়ি করো না।' বলতে বলতেই সে কাঁচের গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে।

লিলি তখনও উত্তেজিত, 'বিয়ের আগে তুমি একটার পর একটা মিথ্যে বলেছ। বলেছ তুমি ব্যবসা কর। কিন্তু এসবই মিথ্যে। তোমার কোন বিজনেস নেই। যেই দেখেছ লিলি ড্যান্স করে টাকা রোজগার করে আনছে—ভেবেছ, আমার চাকরি করার দরকার নেই ! পায়ের ওপর পা তুলে ফুর্তি করব। বলো প্রতারণা কর নি ?'

শ্যামল টলতে টলতে বিছানার ওপর বসে পড়ে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে লিলির দিকে তাকিয়ে থাকে।

লিলি বলতে লাগল, 'দিনদিন তুমি আমাকে শেষ করে দিচ্ছ শ্যামল ! একটা মেয়ের মন নিয়ে তুমি দিনের পর দিন জুয়া খেলেছ !'

এবার চকিতে উঠে দাঁড়াল শ্যামল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে কোমরের বেল্ট খুলে সপাৎ করে লিলির গায়ে চালিয়ে দেয়। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে লিলি। শ্যামল আবার বেল্ট চালাতে থাকে। তারপর বেল্টটা কোমরে পরে নেয়।

বেশ রাতের দিকেই অভিজাত অঞ্চল নিউ আলিপুরের পোর্ট হসপিটাল পার্কের ব্লক 'জি'র ফ্ল্যাট নম্বর ফাইভে ঝন্‌ঝন্ করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। রাতের ডিনার সেরে সমীরবাবু সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। এমন সময়ই টেলি-ফোনটা বেজে উঠল। সমীরবাবু ছুটে গেলেন ছোট টেবিলটার কাছে। সেখানেই টেলিফোনটা রাখা আছে। রিসিভার তুলতেই ভেসে এল মেয়ে লিলির আর্ত কণ্ঠস্বর, 'বাবা, আমি লিলি বলছি। আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে বাঁচাও।'
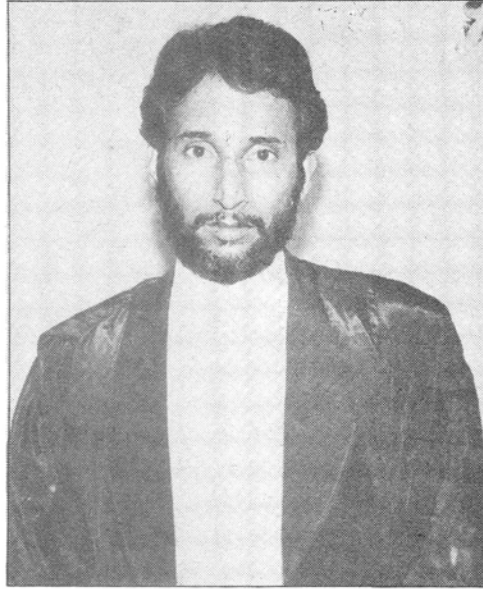
মেয়ের কান্নামাখা আর্তস্বরে সমীরবাবু রীতি-

আইনজীবী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী

মত বিচলিত বোধ করলেন। তারপর রিসিভার আঁকড়ে বলে উঠলেন, 'কেন, কি হয়েছে ?'

লিলি কান্নামাখা গলাতে বলে, 'শ্যামল আমাকে শেষ করে দিল ! আর কত দিন এসব সহ্য করব বলো তো।' সমীরবাবু ভারি গলাতে বলেন, 'আবারও কি মারধোর করেছে ?'

ও প্রান্ত কোন সাড়া দেয় না। কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। সমীরবাবু ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকেন। তারপর সশব্দে টেলিফোন রেখে জামাপ্যান্ট বদলে নিচে নেমে এলেন। মোড়ের মাথাতে একটা ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে। বাড়তি পয়সা দিলে নিশ্চয়ই ড্রাইভার যাদবপুর যেতে রাজি হবে।

বেশ রাত। ট্যাক্সি নিউ আলিপুরের রাস্তা ধরে দ্রুতগতিতে এগোতে লাগল। রাস্তাঘাটের দোকান-পাটের দরজা বন্ধ হতে শুরু করেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সীটে হেলান দিয়ে রইলেন। তখনও লিলির ফোঁপানো কান্নার শব্দ কানে আসছে।

লিলি ডেকার্স লেনের মেট্রোপল বারে ক্যাবারে ড্যান্স করে। বিয়ে হয়েছে শ্যামল দাসের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকে দুজনের মধ্যে অশান্তির শেষ নেই। বাবা হয়ে এসব আর সহ্য করতে পারছেন না।

যাদবপুরে লিলিদের ফ্ল্যাটে তখনও আলো জ্বলছিল। ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে তিনি দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। বেল টিপতেই লিলি এসে দরজা খুলে দিল। বাবাকে দেখেই কান্নাতে ভেঙে পড়ল সে। সমীরবাবুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে লাগল, 'বাবা, আমি আর পারছি না। প্লীজ রেসকিউ মী !'

মেয়ে—বাবার এই কথাবার্তার ফাঁকে ওপাশের ঘর থেকে উঠে এল শ্যামল। দু—পা টলছে। দু-চোখ লাল। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট।

'শ্যামল, আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই !'

সমীরবাবু লিলিকে ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। শ্যামল তখনও টলছে। টলতে টলতেই বলল, 'বলুন।' —'তুমি যদি লিলির সঙ্গে থাকতে চাও, তাহলে আমার কথা শোনো।' সমীরবাবুর গলা ভারি হয়ে এল। শ্যামল তারদিকে তাকিয়ে আছে। সিগারেটটা এককোণে ফেলে সে এগিয়ে এল।

—'আমার মেয়ের গায়ে তুমি আর হাত দিও না। এভাবে চললে আমি অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব। তোমার লজ্জা করে না, তুমি এক পয়সা রোজগার করো না, বৌয়ের পয়সা ওড়াচ্ছ, তার ওপর তুমি ওর ওপর অত্যাচার করো। তোমার লজ্জা করে না ?'

সেদিন আর বেশি কিছু হল না। বাইরে ট্যাক্সি ওয়েটিংএ দাঁড়িয়ে আছে। তাই সমীরবাবু নিচে নেমে এলেন।

এই কাহিনীকে পুরোপুরি জানতে হলে আমাদের একটু পেছনে ফিরতে হবে। নিউ আলিপুরে 'জি' ব্লকের বাসিন্দা সমীর চক্রবর্তীর মেয়ে লিলি ছেলেবেলা থেকেই নাচত। তখন থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাচ করত সে। তারপর বড় হতে বড় বড় অনুষ্ঠানেও যেতে লাগল।

সেই থেকে শুরু। ক্রমে ক্যাবারে নাচ শিখে বিভিন্ন জায়গাতে ক্যাবারে নাচ দেখাতে শুরু করল সে। এইরকমভাবেই একদিন 'মেট্রোপল' বারে ক্যাবারে নাচের সুযোগ পায়। লিলির স্বল্প-বাসের নাচ দেখতে মেট্রোপলে আসত নানা শ্রেণীর লোকজন। এদিকে বিভিন্ন লাস্যময়ী নাচ দেখিয়ে লিলি প্রচুর টাকা রোজগার করতে থাকে। ফ্ল্যাট ভরে যায় আসবাবে, ভি সি পি, ভি সি আরে।

ঠিক এই সময়ই শ্যামলের সঙ্গে লিলির পরিচয় ঘটে। তারপর তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়। দুজনে বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে বেড়ায়। হোটেল রেস্তোরাঁতে বসে চলতে থাকে প্রেমালাপ।

একদিন শ্যামল বলে, 'লিলি, একটা কথা তোমাকে বলতে চাই।'

দুজনের সামনে ধূমায়িত কফির কাপ। কেবি-নের পর্দা ফেলা। লিলি বলে, 'বলো !'

—'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

একজন ক্যাবারে ড্যান্সারের জীবনে এর থেকে আর কি সুখকর খবর হতে পারে ? লিলিও তো স্বামী—পুত্রের স্বপ্ন দেখে !

—'লিলি আমি বিজনেস করি। তুমিও রোজগার করো। দুজনের সংসার সুখেরই হবে, কি বলো ?' লিলি আর কথা বলতে পারে না। কেবল ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে। শ্যামল তার একটি হাত ধরে বলে ওঠে, 'তুমি চোখ মুছে ফেল। এখুনি বয় এসে পড়বে।' তারপর ওরা বিল মিটিয়ে বাইরে আসে।

শ্যামলের সঙ্গে লিলির বিয়ে হয় উনিশশো বিরাশি সালের বারই ডিসেম্বর। বেশ কিছুদিন

সুখেই কেটেছিল। সন্ধ্যের পর লিলির ক্যাবারে নাচ থাকে, বেশ রাত করে সে ফিরে আসে। আর শ্যামলও সারাদিন থাকে না। সে–ও ফেরে রাত করে। দুজনে খাওয়ার টেবিলে বসে নানা কথাবার্তা চলে। একদিন হঠাৎ শ্যামল বলে, 'তুমি আমাকে হাজার খানেক টাকা দেবে? আমার খুব দরকার?'

লিলি কিছু না বলেই তাকে এক হাজার টাকা দিয়ে দেয়।

মাস খানেক যেতেই লিলির কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল। শ্যামল নাকি বড়সড় ব্যবসা করে। কিন্তু প্রায়ই সে টাকার জন্য হাত পাতে কেন! লিলি অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন কিছুর কুল পায় না। তারপর একদিন সে শ্যামলের এই মিথ্যে ব্যাপারটা ধরে ফেলল। শ্যামল প্রথমে কিছুতেই তা স্বীকার করে না। তারপর চাপের মুখে স্বীকার করল যে সে আসলে কিছুই করে না। লিলি তার সঙ্গে অনেক গরম গরম কথা চালাচালি করল। কিন্তু শ্যামলকে সে বিয়ে করেছে, তাই নিজের স্বার্থে সে ব্যাপারটা সহ্য করে গেল।

একদিন শ্যামল তাকে বলল 'লিলি, আমি একটা ব্যবসা শুরু করব ভাবছি। আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে।' শ্যামল তার বিবাহিত স্বামী, তাই যোগাড় করে সে ৫০ হাজার টাকা তাকে দেয়।

কিন্তু তারপরই অঘটন। শ্যামল লিলিকে জানাল যে তার দেওয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা হারিয়ে ফেলেছে। শ্যামলের এই কথায় লিলির কেমন সন্দেহ হল। এক নয়, দুই নয়, একেবারে পঞ্চাশ হাজার টাকা শ্যামল হারিয়ে ফেলল! এবার সে গোপনে গোপনে খোঁজ খবর শুরু করল। লিলি জানতে পারল, শ্যামল আসলে রোজই প্রচুর টাকার মদ খায়, এবং পয়সাওয়ালা অন্ধকার জগতের কিছু লোকের সঙ্গে জুয়া খেলে। ব্যাপারটা জানতে পেরে লিলি তো কপাল চাপড়ায়, ভেতরে ভেতরে রাগে ঘৃণায় জ্বলতে থাকে, ছিঃ, ছিঃ, এই লোকটাকে সে বিয়ে করেছে! এরজন্যে তার এত আত্মত্যাগ স্বার্থ-ত্যাগ? সে শ্যামলকে সব কথা জিজ্ঞাসা করলে একটি কথাও স্বীকার করে না, শুধু বলে, 'লিলি যা তুমি জান না, তা নিয়ে তুমি কখনও কথা বলো না।' শ্যামল এইসব কথা বললেও লিলি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানতে পেরেছে যে তার বিয়ে করা স্বামী মদ এবং জুয়ার পেছনে এন্তার টাকা ওড়ায়। একে-বারে পেশাদার মাতাল আর জুয়াড়ি।

লিলি তার বাবা সমীরবাবুকে সব জানাল। লিলিও কিছুতেই তার বেকার স্বামীকে টাকা দিতে রাজি ছিল না। সমীরবাবু শ্যামলকে বোঝালেন যে, সে যদি টাকা রোজগার না করে, তাহলে সংসার চালানো মুশকিল হবে, কেননা শ্যামলের বিশাল চাহিদা মেটানো লিলির পক্ষে অসম্ভব।

এরপর ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠল। নিরুপায় শ্যামলের টাকা যে করেই হোক চাই। টাকা রোজগারের জন্য যে কোন পথ নিতে রাজি ছিল। লিলি সুন্দরী মেয়ে, চেহারায় চটক আছে। সেকথা মাথায় রেখেই শ্যামল নতুন একটা পথ বেছে নিল।

লিলি যখন রাত করে মেট্রোপল বার থেকে ফিরত তখন সে দেখত শ্যামল তার অনেক বন্ধু বান্ধব নিয়ে জুয়া খেলছে। সঙ্গে মদের ফোয়ারা। এ চলত রাত অব্দি। শ্যামল প্রায়ই জোর করত তাদের সঙ্গে মদ ও জুয়া খেলতে। কিন্তু লিলি কিছু-তেই রাজি হত না। কিন্তু শ্যামলের জোর জবরদস্তির কাছে হার মেনে তাকে মদ খেতে ও জুয়া খেলতে হত। সেইসঙ্গে সে বাধ্য হত অনেকের বেড পার্টনার হতে। কারণ শ্যামল তাদের কাছ থেকে আগে ভাগেই টাকা নিয়ে নিত।

১৯৮৮ সালের শেষাশেষি। লিলি একদিন শ্যামলকে বলে যে এইভাবে তারসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। কারণ শ্যামল স্বামী হয়ে লিলির কাছ থেকে সব রকমের সুযোগ–সুবিধা আদায় করছে। এরপরই লিলি যায় একজন আইনজীবীর কাছে। এবং তার কাছে পরামর্শ চায় মিউচ্যুয়াল ডিভোর্সের এবং সেইসঙ্গে শ্যামল যাতে ওই ফ্ল্যাটটি ছেড়ে দেয় তার বন্দোবস্ত করতে।

১৯৮৮ সালের ১লা অক্টোবর আলিপুর জেলা জজের আদালতে লিলি মিউচুয়াল ডিভোর্সের আবেদন পেশ করে। কিন্তু শ্যামলের বিরুদ্ধে মামলা করা সত্ত্বেও সে নির্বিবাদে দখলদারি চালিয়ে যায়। লিলি তার বাবা সমীরবাবুকে সব জানানোর পর তিনি শ্যামলকে জানান যে কোন অবস্থাতেই তার মেয়ের ফ্ল্যাটে শ্যামল যেন না যায়।

> শ্যামল প্রায়ই জোর করত তাদের সঙ্গে মদ ও জুয়া খেলতে। কিন্তু লিলি কিছুতেই রাজি হত না। কিন্তু শ্যামলের জোর জবরদস্তির কাছে হার মেনে তাকে মদ খেতে ও জুয়া খেলতে হত। সেইসঙ্গে সে বাধ্য হত অনেকের বেড পার্টনার হতে। কারণ শ্যামল তাদের কাছ থেকে আগে ভাগেই টাকা নিয়ে নিত।

মামলায় ফাইনাল হিয়ারিং এর তারিখ ছিল, এ বছর ৪ মার্চ।

এরই মাঝে শ্যামল লিলিকে নানাভাবে ভয় দেখাতে থাকে। এবং লিলি যদি মামলা তুলে না নেয় তাহলে শ্যামল তার প্রাণহানি ঘটাতে পারে, এরকম ধমকিও দেয়।

ফেব্রুয়ারি মাসের দু–তারিখে শ্যামল যাদবপুর থানাতে গিয়ে জানায় যে, তার স্ত্রী লিলি আত্মহত্যা করেছে! লিলির বাবা সমীরবাবু যখন লিলির ফ্ল্যাটে যান, তখন তিনি জানতে পারেন যে, লিলির মৃতদেহ সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তারপর তিনি ছুটে যান যাদবপুর থানাতে। সেখানকার এক অফিসার জানালেন তাঁরা লিলির একটি ডায়েরি বাজেয়াপ্ত করেছেন. সেই ডায়েরিতে লিলি স্পষ্টভাবে লিখেছে যে স্বামীর অত্যাচারে সে বাধ্য হয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সমীর-বাবু ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত পুলিশের সুবিচারের অপেক্ষা করেন। কিন্তু যাদবপুর থানা শ্যামলকে গ্রেপ্তার করে না। এরপর তিনি যাদবপুর থানাতে একটি লিখিত অভিযোগপত্র দায়ের করেন। তিনি ভেবেছিলেন যে হয়তো পুলিশ গোটা ঘটনাটি অনুসন্ধান করে শ্যামলকে গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু, তা ঘটল না।

অসহায় সমীরবাবু ছুটে এসেছিলেন, মহিলা সংক্রান্ত মামলার আইনজীবী শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে। যিনি মহিলাদের সমস্ত রকমেরই আইন-ঘটিত সমস্যার মোকাবিলা করে থাকেন।

সমীরবাবুর অভিযোগ মোতাবেক শিবশঙ্কর-বাবু আলিপুর সাবডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজি-স্ট্রেটের কাছে ১৫৬/৩ ক্রিমিন্যাল পেনাল কোড অনুসারে একটি আবেদন পেশ করেছেন। আদা-লতকে সব কথা জানিয়ে তিনি এই রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত দাবি করেছেন। সমীরবাবুর আরও অভিযোগ, শ্যামল শুধু লিলির ফ্ল্যাট অধিকার করে আছে তাই নয়, সে লিলির সোনার গয়না সহ প্রায় ৬ লাখ টাকার সম্পত্তি নিজের কব্জায় রেখেছে।

ক্যাবারে ড্যান্সার লিলি স্বামী সংসার পুত্র নিয়ে আর পাঁচজন মেয়ের মতনই সুখে বাঁচবার স্বপ্ন দেখেছিল। হয়তো বা লিলির কপালে সংসার করার সৌভাগ্য ছিল না। শুধু তার হতভাগ্য পিতা ও তার বাড়ির লোকজনেরা লিলির এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে পারেননি।

রাজীব কুমার রশ্মি

ব্যান ?
কেন না এতে রয়েছে ৫৩ সেঃ মিঃ এফ্ এস্ টি ?
কেন না এটি সময়ের অনেক আগেই এসে হাজির ?
কেন না এতে রয়েছে একাধিক সম্মোহনী বৈশিষ্ট্য ?
অথবা শুধু এইজন্যে যে এটি আবার আনবে
প্রবল ঈর্ষার বন্যা ?
ওনিডা ২১
পড়শীর ঈর্ষা, আপনার গর্ব্ব।
নতুন ওনিডা কি 'ব্যান' করে দেওয়া হবে ?
Avenues.0.275.89
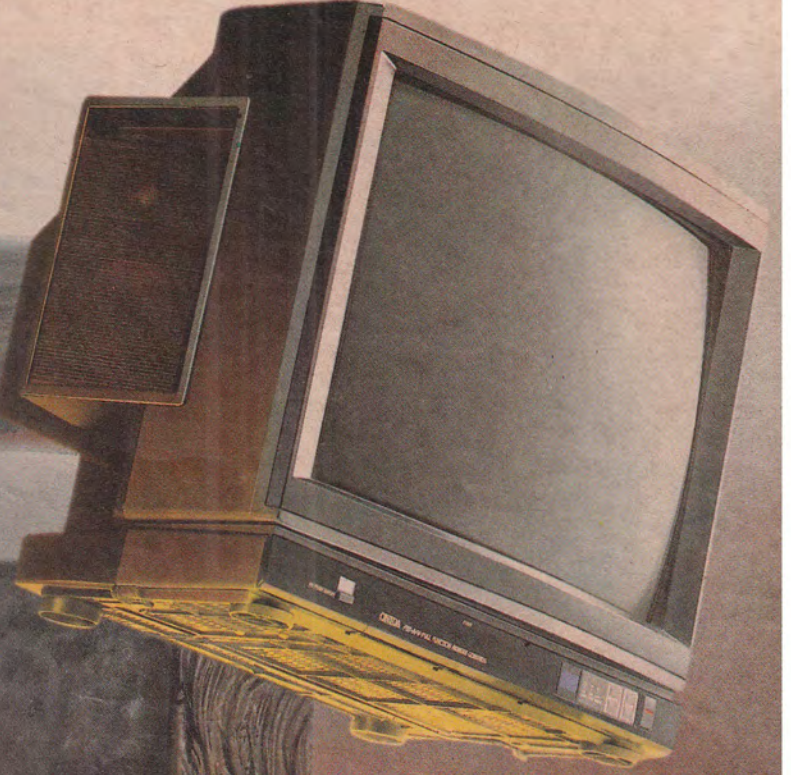
তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের রক্তের দাগ ও অতঃপর!

প্রধানমন্ত্রী লি পেং

অপসৃত ঝাও ঝি

রক্তাক্ত তারুণ্য, তিয়ান আন মেন স্কোয়ারের সেই রাতে

চীনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ছাত্র বিক্ষোভের আভ্যন্তরীণ কারণ কি ছিল? চীনা নেতৃত্বের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিরোধেরই বলি হতে হল কি ছাত্রসমাজকে? চীনের বর্তমান অবস্থা কি? একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন।

জুন মাসের ৪ তারিখের পর অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে। তিয়ান আন মেন স্কোয়ারে মুছে ফেলা হয়েছে রক্তের দাগ। পিকিং শহরের মিউনিসিপাল কর্মচারীরা জলের হোস দিয়ে সেসব ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে সেখানে লাগিয়ে দিয়েছেন নতুন পেইন্ট। দেশজুড়ে এখন ব্যাপক ধরপাকড়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলোর মতই সুনসান, কিছুদিন আগেও সংগ্রামী ছাত্র ছাত্রীদের উজ্জীবিত ব্যস্ততায় ক্যাম্পাসগুলো ছিল সরগরম। ক্যাম্পাসের কোণে কোণে লাগানো পোস্টার আর লাউডস্পীকার-গুলোর অনর্গল অনুরণনও আজ রহস্যময় নিস্তব্ধতায় পর্যবসিত। লোকজন আবার ফিরে গেছে রুটিনবদ্ধ জীবনযাত্রার প্রাত্যহিকতায়—দু সপ্তাহের প্রতিবাদী—সাগ্নিক আর ব্যতিক্রমী দিনগুলো ক্রমশঃ স্মৃতির ফ্রেমে বন্দী হয়ে আসছে। লোকজনের মুখে কুলুপ আঁটা। চীনা টেলিভিশনে বিদেশি অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ, হোটেলের টিভিতেও

একঘেয়ে চীনা অপেরা আর সরকারী ঘোষণা, ট্র্যানজিসটারের নবগুলোও আর ভয়েস অফ আমেরিকা আর বি বি সি–র দিকে ঘোরেনা। লোকজন পারতপক্ষে একে অন্যের ব্যাপারে নাক গলায়না–জনশ্রুতি চীনা পুলিশ সন্দেহগ্রস্ত লোকজনের এক লম্বা লিস্ট তৈরি করে সর্বত্র অপারেশনে নেমে পড়েছে। সন্ধ্যের টেলিভিশনে বিচারদৃশ্য, সন্ধান চাই, আর নেতাদের ক্লান্তিকর ভাষণ··· ।

৩৭ লক্ষ স্কোয়ার মাইলের পুরো দেশটাই যেন কাফ্‌কার 'দের প্রৎসেস' (ট্রায়াল) উপন্যাসের জগতে ফিরে গেছে অতঃপর!

চীনা কর্তৃপক্ষের ঘোষণায়–ছাত্রদের এই বিক্ষোভ ছিল 'প্রতিবিপ্লব। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বানচাল করার এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।' কিন্তু রাতদুপুরে ট্যাংক আর আর্মারড ভেহিকেলস নিয়ে (রাত এতটা ঘন ছিল যে ট্রেসার শেল ছুড়তে হয়েছিল–এবং পিকিংয়ের অধিবাসীরা কোনও আগাম সতর্কবাণীও শোনেন নি) নিরস্ত্র একদল তরুণের ওপরে প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর দীর্ঘায়ত আক্রমণ 'প্রতিবিপ্লব'কে প্রতিহত করার কোন তাত্বিক মহনীয়তার দ্বারা সমর্থিত, তার জবাব প্রবীণ, বহুদর্শী (প্রায়ই অশীতিপর) চীনা নেতৃত্ব দিতে পারেননি। পরে শোনা গেল সরকারী প্রবক্তার ঘোষণামত–আসলে সেনাবাহিনীর কাছে ওয়াটার ক্যানন আর রবার বুলেট ছিলনা তাই বাধ্য হয়ে গুলি ছুড়তে হয়েছে। এই কৈফিয়ৎ কি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়? যেখানে চীন বিদেশের বাজারে দূর পাল্লার মিসাইল অব্দি বিক্রি করতে চলেছে–সেখানে সামান্য কিছু হোস আর রবার বুলেট যোগাড় করাটা কি এতই অসম্ভব ছিল!

আলোচনার দরজাটাও বা হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে নির্বিকল্প মেশিনগানের পর্যায়ে কেন নেমে আসা হল–তার উত্তরটাও এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। 'পিপলস লিবারেশন আর্মি'কে কি রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দাবার চালের নিছক ঘুঁটি হিসেবেই ব্যবহার করা হল–এ প্রশ্ন ওঠা অতঃপর অস্বাভাবিক নয়।

তিয়েন আন মেন স্কোয়ার

তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের অর্থ দাঁড়ায় স্বর্গীয় শান্তির প্রাঙ্গন। ১৯৬৬র বসন্তে এই প্রাঙ্গণে থেকেই মাও সে তুং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূত্রপাত করেন ধনতন্ত্রপ্রেমী প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের পতাকা উড়িয়ে। সেই বিপ্লবের পুরোধা ছিল এই তরুণ আর ছাত্ররাই। এই ছাত্ররাই তখন গঠন করেছিল 'হং ওয়েই পিং'–লালফৌজ–'ধনতন্ত্রের অনুগামী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃত্বকে পদচ্যুত' করতে। বলাবাহুল্য সেটা আসলে ছিল মাওয়ের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামই। গণফৌজের ক্ষমতা খর্বেরও। আজ এই দুই দশকের ব্যবধানে সেই ছাত্র আর তরুণ সমাজের চরিত্রটাই গেল কি পাল্টে! দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-তরুণ-বুদ্ধিজীবি–শ্রমিকবর্গ সরকারি ঘোষণামত 'ধনতন্ত্র অনুপ্রাণিত প্রতিবিপ্লবের' আখড়া করে তুলল ঝাং নান হাই–এর চীনা নেতৃত্বের তখৎ-তাউসের প্রতিবেশি এই প্রাঙ্গনটিকে! চিয়েন মেন–এর কাছে সমাহিত মাও কি কবরের মধ্যে নড়েচড়ে বসেননি–এই আমূল পরিবর্তনে! গণফৌজের চরিত্রও কি আমূলভাবে পাল্টে গেল গণহত্যায়! পাঁচশ বছরের ইতিহাসে এই স্কোয়ার এমন আর কোনও নৃশংসতার নজির দেখেনি।

চীনা সেনা অফিসারদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন ইয়াং শাংকুন

১৯৭৬ সালের ঘটনাও অবশ্য ঘটেছিল তিয়েন আন মেন স্কোয়ারকে কেন্দ্র করেই। চৌ এন লাইয়ের মৃত্যুর পর ঘনিয়ে ওঠা বিক্ষোভকে চীনা নেতৃত্ব এমনি ভাবেই সেদিন আখ্যা দিয়েছিল প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টা। অবস্থার বলি হতে হয়েছিল পিকিং–এর মেয়র উ দে–কে। সিচুয়ানের সেই লোকটি, বর্তমানের লৌহপুরুষ দেং শিয়াও পিং, মাওয়ের বিরাগভাজন ভাইস–প্রিমিয়ার দেং তখন ছিলেন নিতান্তই অসহায়-নিরুচ্চার। নাকি তিনি

চীনের চেয়ারম্যান, দেং শিয়াও পিং

ছিলেন গ্যাং অফ ফোরের তথা ছাত্র মুখ্যতের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শিকার! লিন পিয়াওয়ের অপসারণ পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে এই ঘটনার পর চীনের রাজনীতিতে গণমুক্তিফৌজের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে এসেছিল অনেকটাই। ৪ জুনের ঘটনা কি আবার সামরিক বাহিনীকে রাজনীতির পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এল?

পিপলস লিবারেশন আর্মি: গণমুক্তি ফৌজ

চীনা সেনাবাহিনী তথা পিপলস লিবারেশন আর্মি (এতে আধা সামরিক বাহিনীও অন্তর্ভুক্ত)–র সঙ্গে অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনীর বেশ কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঐতিহাসিক কাল থেকেই চীনা সৈনিকেরা যুদ্ধের সময় যুদ্ধ, অন্যান্য সময়ে চাষবাসের কাজ করে এসেছে। ১৯২০তে স্থাপিত 'রেড আর্মি'ও মূলতঃ তৈরি হয়েছিল কৃষকদের সাহায্যেই। প্রথানুগত র‍্যাঙ্কিং বা রেজিমেন্টেশন এখন চীনা সেনাবাহিনীতে নেই। গতবছর অক্টোবরে এ ধরণের একটা চেষ্টা অবশ্য হয়েছে। সেনাবাহিনীর লোকজনেরা কৃষিখামারের কাজ করা থেকে শুরু করে শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা পর্যন্ত সব কাজকর্মই করে থাকে। তবে রাজনীতির সঙ্গে সেনাবাহিনী ঘনিষ্ঠতা বেশ অন্তরঙ্গ ধরণেরই। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যানই হন সামরিক

বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয় চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির যে গুরুত্বপূর্ণ অংশটির দ্বারা তা হ'ল পার্টির সামরিক বিষয়ক কমিটি। এছাড়া রয়েছে বাহিনীর নিজস্ব রাজনৈতিক উইং। সামরিক বাহিনীর প্রতিটি কম্যান্ডিং অফিসারের পাশাপাশি থাকেন একজন কমিসার। পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির দ্বারা নির্বাচিত এই কমিসারের দায়িত্ব থাকে বাহিনীর রাজনৈতিক শিক্ষা ও তার অনুসরণের দিকটি দেখাশোনা করা।

পি এল এর প্রাথমিক পর্বে সামরিক ও অসামরিক অংশগ্রহণের সীমারেখাটা ছিল প্রায় অস্পষ্ট। মাও থেকে শুরু করে চৌ এন লাই, চেন ই, লিন পিয়াও, বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইয়াং শাংকুন, এমন কি দেং শিয়াও পিং–সকলেই তাঁদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সঙ্গেও জড়িত থেকেছেন। মাও এরপর 'বুর্জোয়া সামরিক চিন্তাভাবনা' ঝেড়ে ফেলে চীনা বাহিনীকে অসামরিক স্তরের সঙ্গে আনতে চাইলেন। সামরিক বিভাগের প্রভাবশালী মন্ত্রী পেং তে হুই হলেন অপসৃত–এলেন লিন পিয়াও। ৬০ এর দশকের শুরুতে লিন পিয়াও পার্টি কেন্দ্রিয় কমিটির–সামরিক কমিশনের দায়িত্ব নেবার পর

গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের বিরুদ্ধে নেমে এসেছে স্বৈরাচারপ্রতীম দমনযন্ত্র

থেকে চীনা রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর আধিপত্য শুরু হয় যায়। 'গণমুক্তি ফৌজের কাছে থেকে শিক্ষা নাও' এই শ্লোগানও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সেসময়। কমিউনগুলি থেকে শুরু করে স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পোস্ট অফিস সর্বত্রই পি এল এ প্রতিনিধিদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এমন কি লিন পিয়াও চীনা সাহিত্য পরিষদ থেকে শুরু করে বিদেশি ভাষা প্রকাশনালয় পর্যন্ত পি এল এ–র অনুপ্রবেশ ঘটান।

চীনের সাম্প্রতিক ছাত্রবিক্ষোভের পর চীনের প্রভাবশালী পত্রিকা 'রেন মিন রি বাও' (পিপলস ডেইলি)–র ডিরেক্টর ও প্রধান সম্পাদক কুয়ান লি রেন কে সরে যেতে হল–'প্রতিবিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি' প্রদর্শনের অপরাধে! তাঁর পরিবর্তে যিনি ঐ পদে এলেন, বাষট্টি বছরের সেই গাও দির সাংবাদিকতার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। ভদ্রলোক ছিলেন পি এল এ–র প্রোপাগান্ডা চীফ। ঘটনাটা কি চীনা রাজনীতিতে আবার সামরিক বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দেয়?

সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পার্টি চেয়ারম্যান দেং শিয়াও পিং–এর যোগাযোগ প্রায় ৬০ বছরের। ১৯৩০–এ লং মার্চে তিনি লাল ফৌজের একটা অংশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে পার্টির সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যান এবং রাজনৈতিকভাবে চীনা রাজনৈতিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। দেং এর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, ৮২ বছরের ইয়াং শাংকুন দেশের প্রেসিডেন্টই শুধু নন সামরিক বাহিনীতে তাঁর গভীর প্রভাব রয়েছে। তিয়ান আন মেন স্কোয়ারে আক্রমণের আদেশ ইনিই দেন বলে মনে কর হচ্ছে। শাংকুনের ভাই ইয়াং বেই বিং পি এল এ–র রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান, তাঁর জামাই চি হাও তি আন চীনা সামরিক বাহিনী প্রধান, আর তাঁর ভাগ্নে (মতান্তরে তাঁর ছেলে) ইয়াং জিয়ান হুয়া তিয়ান আন মেনে আক্রমণকারী সামরিক ব্রিগেড ২৭ তম বাহিনীর কমাণ্ডার।

গত দশ বছরে চীনের সামরিক বাহিনী অবশ্য রাজনৈতিকভাবে ততটা প্রাগ্রসর ছিলনা, কিন্তু দেং শিয়াও পিং–এর আধুনিকীকরণ ও উন্মুক্ততার নীতি তাদের অন্যান্য সামরিক ক্ষমতাপ্রধান দেশের বাহিনীর মতই সুযোগসন্ধানী ও দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলেছে নিঃসন্দেহেই। ইদানীংকালে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সূত্রে চীনা সামরিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ক প্রযুক্তি বেশ কিছুটা উন্নত। আন্তর্জাতিক অস্ত্র বাজারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের দরুণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে স্বার্থগত সহযোগিতাও বেড়েছে। মাওয়ের প্রবর্তিত 'হিউম্যান ফ্যাক্টর ফার্স্ট' নীতিটিও আর তেমন করে সামরিক বাহিনীতে ইদানীং অনুসৃত হয়না। মাও বা লিন যেভাবে ভাবতেন, রাজনৈতিক গতিশীলতার তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল গণযুদ্ধের উপযোগী গণফৌজ, সেই ভাবনাও অবসৃত। বাহিনীর আধুনিকীকরণের স্বার্থে চীনা নেতৃত্ব দূরপাল্লার প্রক্ষেপাস্ত্র বা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রেই গুরুত্ব দিচ্ছেন ইদানীং।

রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

১৯৮৬ সালে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি প্রধান হু ইয়াও ব্যাং–এর অপসারণের পর থেকে স্পষ্ট হয় দলীয় রাজনীতি তথা ক্ষমতার কেন্দ্রে একটা ক্ষমতাদখলের লড়াই চলেছে। ১৯৮৭র অকটোবরে অনুষ্ঠিত চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস এই লড়াইটাকে আরও স্পষ্ট করে দেয়। দেং শিয়াও পিং–এর নীতির বিরোধিরা একে একে পার্টি পদ থেকে সরে যান। চীনা রাজনীতিতে মাওয়ের প্রভাব মোছার পালা যা তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয়েছিল তা আরও জোরদার হয়। কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির ১৭৫ জন সদস্যদের মধ্যে অনেকেই মাওয়ের আমলের রাজনৈতিক নির্বাসন থেকে পুনর্বাসিত হন। পলিটব্যুরোর স্থায়ী কমিটিতে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন ঝাও ঝিয়াং, ইয়াও ই লিন, হু চি লি, লি পেং। দেং শিয়াও পিং ছিলেনই। ঝাও ঝিয়াং পার্টির দায়িত্বে এসে দেং–এর অনসৃত নীতিটিকে আরও গতিশীল করায় জোর দেন। রাশিয়ার গ্লাসনস্ত–এর আদলে চীনা উন্মুক্ততার নীতিটিরও একটি চৈনিক নামকরণ করেন তিনি 'তোও মিন দু'। সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে তিনি ক্রমে পার্টি প্রধানের পদে উন্নীত হন। এছাড়া তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ পদটি পান তা হল পার্টি সেন্ট্রাল কমিটির সামরিক কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ। এই দুটি পদ তাঁকে দেং–এর পরবর্তী ক্ষমতার অধিকারী বলে চিহ্নিত করে দেয়। কিন্তু ঝাও কি সামরিক বাহিনীর ততটা আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারেননি? প্রেসিডেন্ট ইয়াং শাংকুন সম্ভবতঃ সেই সুযোগটা নিয়ে দেং–এর পরবর্তী পদের দাবিদার হয়ে গেলেন। দেং ক্যান্সারে ভুগছেন এরকম একটা কথা পিকিংয়ের কূটনৈতিক মহলে ইদানীং শোনা যাচ্ছিল। ছাত্রবিক্ষোভের দিনগুলোতে প্রায় এক মাস তাঁকে কোনও অনুষ্ঠানেও দেখা যায়নি। ৪ জুনের ঘটনার পর টেলিভিশনের পর্দায় তাঁকে আবার দেখা গেল প্রেসিডেন্ট ইয়াং শাংকুনের সঙ্গে, নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর আক্রমণের নায়ক সেনা

অফিসারদের সঙ্গে সহাস্য করমর্দন করতে। ব্যাপারটা অভিনব, অমানবিকও। কারণ ছাত্রদের যতই 'ফ্যাং জেমিং বাও লুয়ান' (প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহীর দল) বলে চিহ্নিত করা হোক না কেন—স্বদেশীয় ছাত্রদের ওপর গুলিচালনার হিংস্রতা কোনও দেশের প্রধান কর্তৃক অভিনন্দিত হওয়াটা যেন কিছুটা নাৎসী আদলকেই মনে করিয়ে দেয়। বোধহয় কিছুটা একাধিপত্যপ্রবণতাকেও।

আর দেং যতই চীনা রাজনীতির প্রচলিত ঢংয়ে 'কাল্ট ফিগার' হয়ে উঠতে চাইছেন—ততই একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে—মাওয়ের শেষ দিনগুলোর মতই ৮৪ বছরের এই বৃদ্ধকে শিখণ্ডি দাঁড় করিয়ে পরস্পরের দিকে বন্দুক তাক করে আখের গোছাতে চাইছেননা তো উঁচু মহলের চীনা নেতৃত্ব? হু—এর পর, ঝাও—এর পতন যেমন আকস্মিকতা তেমনি কোনও আকস্মিক ঘটনাই কি আবার চীনের রাজনৈতিক ঘটতে চলেছে প্রেক্ষাপটে? দেং—এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কিন জি উই, দলের প্রচার সচিব হু কিলি, কেন্দ্রিয় সামরিক কমিশনের উপ মহাসচিব হোনো শুয়ে জি সকলেই এখন অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়ে। পরিবর্তনকামী ছাত্রদের রক্ত কি শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক দাবার চালে ক্ষমতা পরিবর্তনের সম্ভাবনাকেই উপ্ত করে দিয়ে গেল?

দেং এর উদারনীতি ও উত্তরাধিকার

চীনা কম্যুনিস্ট পাটি দ্বাদশ কংগ্রেসে দেং—এর অর্থনৈতিক সংস্কারপন্থা অনুমোদন পায়। বলা যায় রুশ পেরেস্ত্রৈকা—র আগেই চীনা সমাজের অর্থনৈতিক পূনর্মূল্যায়ণ ও পরিবর্তনে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি উদ্যোগী হয়। পেরেস্ত্রৈকার অনুগামী গ্লাসনস্ত—এর মত, চীনের সামাজিক ও সংস্কৃতিক জগতেও এর ফলে আসে পরিবর্তন। পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসে দেং—এর রাজনৈতিক অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়, চীনের প্রতীচ্যকরণের ধারা আরও দ্রুতগামী হয়। ১৯৫৭ সালে মাওয়ের তোলা সেই শ্লোগান, 'তুং ফেং ইয়া তাও সি ফেং' (পশ্চিমের হাওয়াকে উড়িয়ে দিচ্ছে পূবের হাওয়া) যেন বিপরীতমুখী হয়ে ফিরে আসে চীনা সমাজে! সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় দেওয়া শ্লোগান 'মিং ফ্যাং' (শতপুষ্প বিকশিত হোক) ও নতুন তাৎপর্য পায় পরিবর্তিত চৈনিক আবহে!

চীনা সমাজ মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। এই কৃষিও যথেষ্ট প্রাথমিক পর্যায়ের। সংগঠিত সামন্তবাদও রাশিয়ার মত চীনে কোনওদিন প্রাধান্য পায়নি। ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া বা প্রতিবেশি জাপানের মত চীনা শ্রমিকশ্রেণীতে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণীভেদও তেমন স্পষ্ট নয়। অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশ রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপের পূর্ব জার্মানী বা পোল্যাণ্ডের মত বিপ্লবপূর্ব চীনে শিল্পস্থাপনাও ঘটেনি তেমনভাবে। বিপ্লবোত্তর বছরগুলিতে চীনকে মূলতঃ নির্ভর করতে হয়েছে রুশ সহায়তার ওপর। রুশ—চীন বিরোধের প্রেক্ষাপটে এই অর্থনৈতিক সহায়তার স্রোতটি ক্রমে শুকিয়ে যায়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে চীনের অন্ধ পাশ্চাত্যবিরোধীতা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও দুর্বল করে দেয়।

দেং ক্ষমতায় এসে বুঝতে পারেন দেশীয় অর্থকাঠামোকে মজবুত করার মত সামর্থ দেশীয় অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ উৎসে নেই, বাধ্য হয়ে তাঁকে বিদেশি পুঁজির সন্ধানে মুক্তদ্বার পরিকল্পনা নিতেই হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে তাইওয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক হালকা করে দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল, নিক্সনের দৌত্য তাকে আরও নিকটতর করে দেয়। দেং মাও—য়ের 'ই চুং এর পাই' শ্লোগানটিকেই অন্য অভিজ্ঞানে পরিচিত করে তোলেন। শ্লোগানটির অর্থ ছিল—চীনের অর্থনীতি অনুন্নত, কিন্তু সাদা কাগজের মতই দাগহীন—যাতে যে কোন অধ্যায়ই নতুন করে লেখা যায়।

এই দশকে মার্কিন কোম্পানীগুলো কি পরিমান বিনিয়োগ করেছে তার একটা হিসেব নিলে দেখা যায়—কয়লা শিল্পের সঙ্গে জড়িত 'অকসিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম' একাই বিনিয়োগ করেছে ১৮·৭৫ কোটি ডলার। বিমান প্রস্তুতকারী সংস্থা ম্যাকডোনেল ডগলাসের বিনিয়োগ প্রায় ১৬ কোটি ডলার। বহুজাতিক কোম্পানী জেরক্সের বিনিয়োগ দেড় কোটি ডলার, এমন কি বেবি ফুড প্রস্তুতকারক কোম্পানী হেইনজের চীনের বাজারে বিনিয়োগ ৬ মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। এছাড়াও বাজারে রয়েছে বেল টেলিফোন, জেনারেল বিয়ারিং, জিলেট, হিউলেট প্যাকার্ড। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এছাড়াও প্রায় ৬০০ জাপানি কোম্পানী চীনে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। ৪ জুনের পর ৬০০ টিই পিকিং—এ তাদের অফিস বন্ধ করে দিলেও—সম্প্রতি আবার সেগুলো খুলতে শুরু করেছে। এছাড়া রয়েছে ফরাসী, জার্মান, ইতালিয় ও দক্ষিণ কোরিয় কোম্পানীগুলোর বিনিয়োগ। প্রবাসী চীনাদের বিনিয়োগ অবশ্য ছাড়িয়ে গেছে এইসব বিনিয়োগের সব অঙ্ককেই। সব মিলিয়ে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যের ৭০ শতাংশই এখন ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে।

এই বিনিয়োগের ফলে প্রাথমিক স্তরে চীনে যে শিল্পায়ন ঘটছে তার তুলনায় বেশি ঘটছে বিদেশি মানসিকতার অনুপ্রবেশ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ফলে নবলব্ধ সমৃদ্ধির প্রকাশ ঘটছে সমাজের একটি অংশে। এছাড়া চীনের বাজারে যুগ্ম উদ্যোগের শর্তস্বরূপ আসছে অনেক বিলাসসামগ্রী বা নাতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

চীনের ওয়েন জাউ প্রদেশ—এ এখন বেসরকারি বিনিয়োগ মোট মূলধনের ৫০ শতাংশ। হংকংয়ের সমীপবর্তী গুয়াংদং প্রদেশেও ক্রমে বাইরের অর্থবিনিয়োগে শিল্পায়িত হয়ে চলেছে, এইসব শিল্প উদ্যোগগুলিতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিকের। হুনান ও সেচুয়ান প্রদেশেও দ্রুত শিল্পায়নের চেষ্টা চলেছে। এ সবই শুভলক্ষণ, কিন্তু একদম হঠাৎ করে এই পরিবর্তন চীনের ৪০ বছরের সামাজিক চালচিত্রটিকে বেশ কিছুটা বিপন্ন করে দিয়েছে। সরকারি মতে চীনে এখন মুদ্রাস্ফীতির হার ২৭ শতাংশ, দুর্নীতিও ক্রমবর্ধমান। এবছর মার্চ মাসে, 'চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সোসাল সাইন্সেজের' তরফ থেকে পরিচালিত এক ওপিনিয়ন পোলে জানা গেছে—সমীক্ষিত লোকজনের ৮৩ শতাংশই বিশ্বাস করেন যে আমলারা কমবেশি দুর্নীতিপরায়ণ। ৪৬ শতাংশের মত, দেশের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ হল ঘুষ আর জুয়াচুরি। ৬৩ শতাংশ বিশ্বাস করেন যে দলীয় নেতা ও সদস্যরা এর সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে জড়িত। গত ১০ বছরে পিকিং পুরসভার যে ৭,০০০ কর্মচারীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই পুরোনো পার্টি সদস্য।

জনৈক চীন বিশেষজ্ঞের মতে, দেং আর যাই করুন মানুষের মন থেকে ভয় দূর করতে পেরেছিলেন। তারই একটা বহিঃপ্রকাশ অন্য পথে এগিয়েছে, এই যা আর এই ভয়মুক্তি লোকের যে একটা প্রধান মানসিক জটিলতাকেও দূর করে দিয়েছে—তা হল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত লাভালাভের দ্বন্দ্ব। অবশ্য এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে দশ বছর আগেই চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের চেয়ারম্যান পেং জেন। সে সময় তাঁর কথাকে কেউ আমলই দেননি।

আজ চীনে সেই একঘেয়ে নীল রংয়ের মাও স্যুট লোকে আর পরেনা। পার্টির নেতারা থেকে শুরু করে আমলারা পর্যন্ত থ্রি পিস্ স্যুটে অভ্যস্ত। ব্যবহারের জন্য বিদেশি গাড়ি ও মদও অপর্যাপ্ত। শুধু তাঁরাই নন, তাদের আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েরা অনেকেই সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীটা আর এখন অত অপরিচিত, অতটা বিশাল নয় তাঁদের কাছে। চীনা নেতৃত্ব কি আদৌ বোঝেননি. পুরোপুরি সাম্যবাদী অর্থব্যবস্থার মধ্যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে বিকশিত করা যায়না?

চীনা তারুণ্যের এই পর্যায় জাপানী আক্রমণ দেখেনি, লংমার্চের অভিজ্ঞতা এদের নেই—এরা মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে, পেয়েছে গতিশীলতাও। আজ দেশের বিপুলসংখ্যক ছাত্র ছাড়াও বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে রয়েছে ৫০,০০০ চীনা ছাত্র। এঁদের মধ্যে থেকেই উঠে আসবে ভবিষ্যতের চীনা নেতৃত্ব, প্রযুক্তিবিদ, অর্থনীতিক, চিকিৎসক আর বিজ্ঞানীরা। এদের অনেকেই যে বিদেশে চলে যেতে চায়, প্রবাসীরাও আর দেশে ফিরতে রাজি নয় সে কথা ভেবেই হয়তো চীনা নেতৃত্ব ইদানীং কিছুটা নরম মনোভাব দেখাচ্ছেন। তারুণ্যের কাছে বার্ধক্যের পরাজয় সম্ভাবনার অবশ্যম্ভাবীতার কথা ভেবেই কি?

–দীপ বসু

রামকৃষ্ণ মিশনের মহাজীবন

ভরত মহারাজ : ত্যাগ ব্রতের ৮০ বছর

প্রায় ১০০ বছর ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বজনশ্রদ্ধেয় যে প্রবীণতম সন্ন্যাসীটি বেলুড়মঠের নিভৃত বসে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকপালদের থেকে শুরু করে সাধারণতম মানুষটির কাছে আধ্যাত্মিক আশ্রয় হয়ে রয়েছেন, সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনচারণায় এমন কি আছে যার জন্য কোটি জনতা সদাই উদ্বেল ? ইন্দিরা, জ্যোতি বসুর মত শীর্ষনেতারা কিসের আশায় বারংবার ছুটে যান তার কাছে ? প্রশ্নের মহা-জীবনের অজানা অধ্যায়ের দিকে তথ্যনির্ভর আলোকপাত করেছেন প্রণবেশ চক্রবর্তী।

ভরত মহারাজ
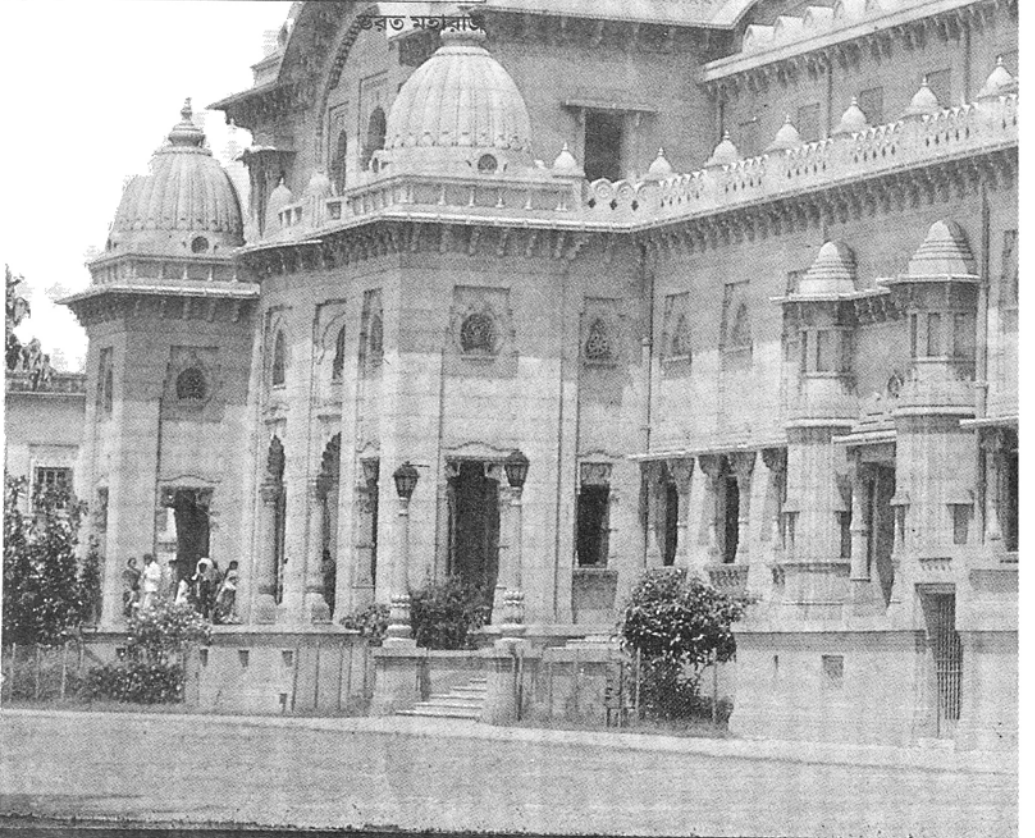
বাংলার দুর্জয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যে নামটি ওতঃপ্রোত ভাবে যুক্ত, সেই নামটি হচ্ছে চার্লস অগস্টান টেগার্টের। বাংলার জীবন সমর্পিত বিপ্লবীদের দমন করার ব্যাপারে টেগার্ট ছিলেন অগ্রণী। ১৯১৪ সালে তিনি তৎকালীন বাংলা সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। সেই সময় তিনি 'দি রামকৃষ্ণ মিশন' নামে ফুলস্কেপ কাগজের ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ছাপান রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন। এই রিপোর্টটিতে মূলত বাংলা-দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দের প্রভাব এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা আলোচিত হয়েছিল ।

ভরত মহারাজের রোগশয্যাপার্শ্বে জ্যোতি বসু
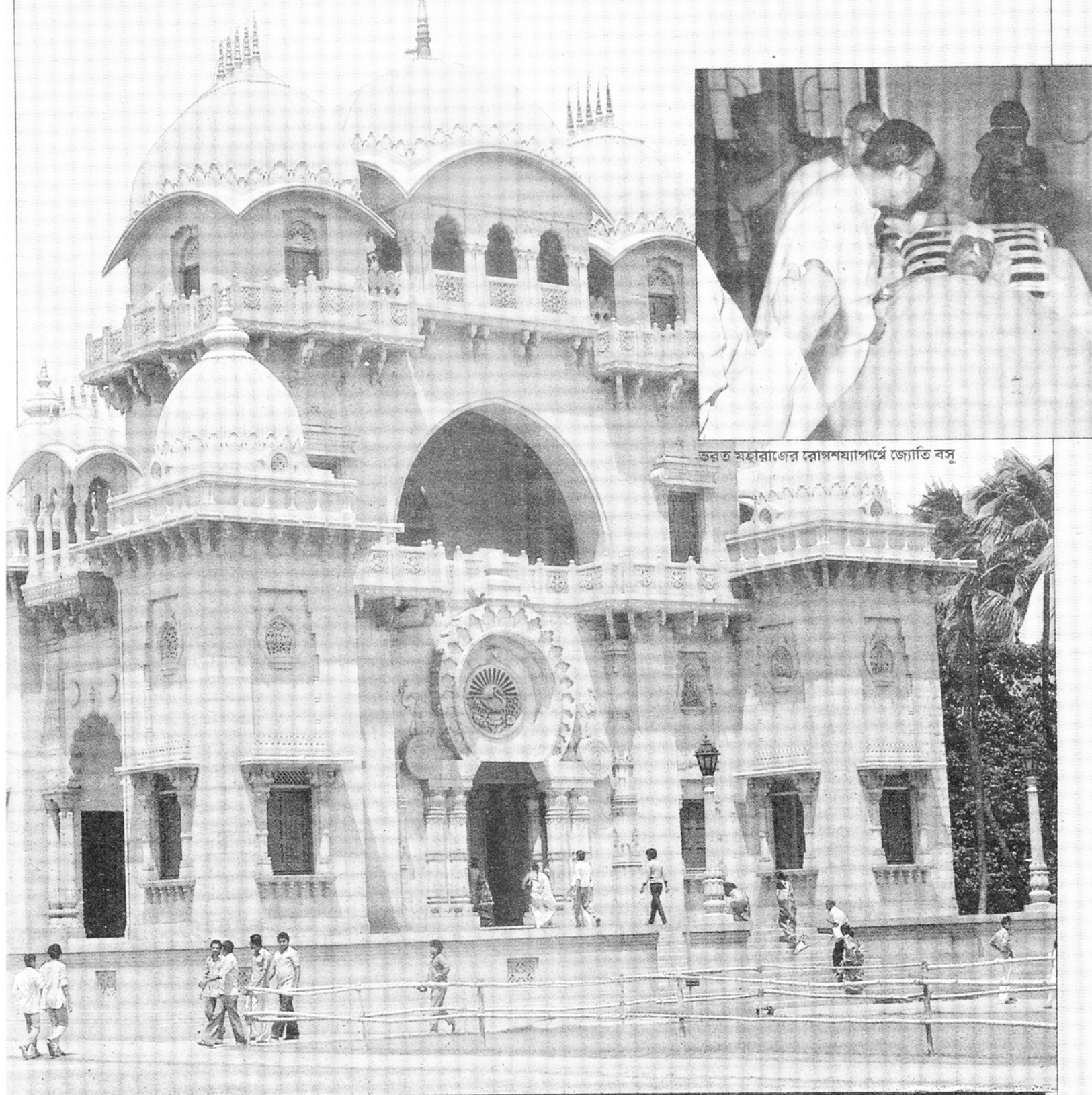
জননী সারদামণি শেষদিনে ভরত মহারাজকে দর্শন দিয়েছিলেন

বেলুড়মঠে যেমন আকস্মিক ভাবেই এসেছিলেন, তেমনি বিনা প্রস্তুতিতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দের (রাজা মহারাজ) সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিনের অতুলচন্দ্র গুহ। ২০ বছরের তাজা যুবক। গুপ্ত সমিতির সদস্য। আর স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশেই তিনি গিয়ে আলাপ করেছিলেন স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের দুই সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে এক অদৃশ্য যোগসূত্রে তিনি একাত্ম হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ঠিক একইভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকজন ত্যাগী সন্তান স্বামী শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজ) সঙ্গে।

স্নেহময় স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) খুবই স্নেহ করতেন ভরত মহারাজকে। প্রকৃতপক্ষে সর্বজনকে ভালোবাসার যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা ভরত মহারাজের ছিল, তার উৎস যেন স্বয়ং স্বামী প্রেমানন্দ। ভরত মহারাজের জীবন জুড়ে স্বামী প্রেমানন্দের উজ্জ্বল ছায়া প্রলম্বিত।

ভরত মহারাজ যেমন হঠাৎই বেলুড়মঠে এসে পড়েছিলেন, তেমনি হঠাৎই তাঁর দীক্ষা হয়েছিল জননী সারদামণির কাছে। এর নেপথ্যেও ছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ।

সেটা ১৯১২ সালের ঘটনা।

স্বামী প্রেমানন্দ একদিন তাঁকে বললেন, 'তুমি কলকাতায় যাও। সেখানে গিয়ে বলরাম বসুর বাড়িতে থাকবে।' কেন কলকাতায় যেতে বলছেন- সে প্রশ্ন করার সাহস ভরত মহারাজের ছিল না। তিনি নির্দেশ মত কলকাতায় গিয়ে বলরাম বসুর বাড়িতে উঠলেন।

স্বামী প্রেমানন্দ পূর্বাশ্রমের পরিচয়ে বলরাম বসুর নিকট আত্মীয়। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে বিয়ে হয় পরম বৈষ্ণব বলরামের। এটা যেন ছিল মণিকাঞ্চন যোগ। তাঁরা উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। বাগবাজারের বলরাম ভবন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের 'দ্বিতীয় কেল্লা'। প্রথম কেল্লা ছিল দক্ষিণেশ্বর মন্দির। এই বাড়িতে শ্রী শ্রী জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বছর মহাসমারোহে রথযাত্রা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এই রথযাত্রায় সপার্ষদ যোগ দিয়েছেন কয়েকবার। এই বাড়িতে তিনি অন্তত শতবার এসেছেন। এখানে বহুবার এসেছেন এবং থেকেছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং জননী সারাদামণি।

এই বাড়িতেই ১৮৯৭ সালের ১ মে স্বামী বিবেকানন্দ আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে ৫৭ নম্বর রামকান্ত বসু স্ট্রিটের এই বাড়িটি 'বলরাম মন্দির' নামেই পরিচিত। এটা এখন রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শাখাকেন্দ্র। এখানে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানরা বরাবরই থাকতেন।

সেই হিসেবে সেদিন স্বামী প্রেমানন্দের নির্দেশে ভরত মহারাজও এসে এই বাড়িতে উঠেছিলেন। ভরত মহারাজের কথায়, 'বলরামবাবুর পরিবারের সকলেই সাধুদের খুব আদর যত্ন করতেন।'

বলরাম মন্দিরে এসেছিলেন তখন বাবুরাম মহারাজও। সেদিন রাত্রে বাবুরাম মহারাজ একটি ছেলেকে দেখিয়ে ভরত মহারাজকে বললেন, 'দেখ, কাল সকালে মায়ের কাছে এর দীক্ষা হবে। এই ছেলেটি কলকাতার কিছুই চেনে না। তুই একে সঙ্গে নিয়ে মায়ের বাড়িতে যাবি। যাওয়ার আগে গঙ্গাস্নান সেরে নিবি। তারপর স্বামী সারদানন্দের কাছে গেলে তিনিই সব ঠিক করে দেবেন।'

ভরত মহারাজ নীরবে দাঁড়িয়ে সেই নির্দেশ শুনছিলেন। হঠাৎ বাবুরাম মহারাজ তাঁকে প্রশ্ন করলেন: 'হ্যাঁরে, তোর দীক্ষা হয়েছে।'

এমন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কিছু বলার আগেই বাবুরাম মহারাজ বললেন: 'মায়ের বাড়িতে যাচ্ছিসই যখন, তখন তুইও মায়ের কাছে দীক্ষা নে।'

কি বলবেন ভরত মহারাজ, কিছুতেই তা বুঝতে পারছিলেন না। শেষটায় খুব সংকোচের সঙ্গে বললেন: 'কিন্তু মায়ের কাছে দীক্ষা নেব কেমন করে? তিনি তো ভালো করে আমাকে চেনেনই না। আমি যাই প্রণাম করে চলে আসি।'

বাবুরাম মহারাজ একটু হেসে বললেন, 'না, তিনি তোকে চেনেন। তুই শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দ) কাছে যাবি, তাঁকে গিয়ে বলবি। সারদানন্দস্বামী তোকে চেনেন।'

বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়ি থেকে মায়ের বাড়ি–সামানাই পথ। এখন যেটা উদ্বোধন লেন এবং উদ্বোধন কার্যালয়–সেটাই মায়ের বাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী–সন্তান এবং শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গের সাধক–লেখক স্বামী সারদানন্দের বিশেষ প্রয়াসেই মায়ের জন্য এই বাড়িটি কেনা হয়। মা গঙ্গাস্নান করতে ভালোবাসেন। এখান থেকেও গঙ্গাও খুব কাছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৯ থেকে ১৯২০ সাল–জননী সরদামণির পার্থিব লীলার এই শেষ এগারো বছর তিনি এানেই অতিবাহিত করেছেন। আর স্বামী স্বারদানন্দ (শরৎ মহারাজ) মাতৃসেবায় সমর্পন করেছেন নিজের জীবন। তাই তাঁকে বলা হয় মায়ের 'দ্বারী' বা 'ভারী'।

সেদিনের যুবক ভরত মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দের নির্দেশে গিয়ে হাজির হলেন স্বামী সারদানন্দের কাছে। সারদানন্দজি সব কিছু শুনে বললেন: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমার দীক্ষা হবে।'

তারপর তিনিই মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন তাঁদের। পরিচয় করিয়ে দিলেন মায়ের সঙ্গে। তাঁরা প্রণাম করে ধন্য হলেন। কথায় কথায় সারদানন্দজি ভরত মহারাজ সম্পর্কে বললেন, 'এই ছেলেটি শশী মহারাজের সেবা করেছে।' মা শুনে খুব খুশি হলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) জীবনপাত পরিশ্রমে শেষপর্যন্ত যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে যুগে রাজরোগ যক্ষায় কেউ আক্রান্ত হলে ভয়ে সবাই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতেন। তাঁকে সেবা করারও লোক পাওয়া যেত না। অথচ ভরত মহারাজ স্বেচ্ছায় সেই সেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন।

জননী সারদামণি সেদিন সব কথা শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা, তোমার দীক্ষা হবে।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'বাবা, তুমি নিচে গিয়ে বোস। আমি ঠিক সময়ে ডেকে নেব।'

নিজের দীক্ষার কথা বলতে গিয়ে সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'শ্রী শ্রী মা সব সময়ে ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতেন। কিন্তু সেদিন সে সময়ে ঘোমটা ছিল না। তাঁর সামনে একটা আসন পাতা ছিল। আমি সেই আসনেই বসলাম। কিছু কথাবার্তা হল। তারপর তিনি কিছুক্ষণ ধ্যান করলেন। আমি চুপ করে বসে রইলাম। এরপর তিনি আমাকে মন্ত্র দিলেন।'

ভরত মহারাজ বলতে থাকেন, 'আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি তো তাঁকে কিছুই জানাই নি। তবু দেখলাম, আমি এতদিন যে ভাবটি নিয়ে আছি, তিনি ঠিক সেই ভাব অনুযায়ী মন্ত্র দিলেন। মা তাঁর দিব্যনয়নে আমার মনকে ঠিক দেখতে পেয়েছেন। এর ফলে আমার খুব তৃপ্তি হল। খুব আনন্দ হল।'

বিপ্লবের দীক্ষা নিয়ে ঘর ছাড়া যে ছেলেটি সেদিন ঢাকা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন, আশ্রয় নিয়েছিলেন বেলুড়মঠে, ১৯১২ সালে তিনি পেলেন নতুন পথের দীক্ষা। হল তাঁর নবজন্ম।

আনন্দময় হৃদয় নিয়ে সেদিন তিনি বেলুড়মঠে ফিরে এসেছিলেন। মন টানত বাগবাজারে যাওয়ার জন্য। মা–কে একবার দর্শন ও প্রণাম করার জন্য মাঝে মাঝে উতলা হতেন তিনি। কিন্তু বেলুড় থেকে বাগবাজার–গঙ্গা পথে সেদিন দূরত্ব বেশি ছিল না। কিন্তু যাওয়ার অনুমতি মিলত না সহজে। তাছাড়া বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে গেলেই যে মাকে দর্শন করা যাবে–তারও কোন স্থিরতা ছিল না। সেখানেও ছিল অনেক বিধিনিষেধ।

তবুও এরই মধ্যে মাঝে মাঝে তিনি মা–কে

দর্শন ও প্রণাম করার সুযোগ পেয়ে যেতেন। মঠের নানা কাজে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁকে কলকাতায় পাঠাতেন। আর কলকাতায় এলেই একবার বাগবাজার ঘুরে যেতেন তিনি।

মায়ের বাড়িতে এসে নিজের মনের কথা বলতেন স্বামী সারদানন্দকে। তিনি একটু হেসে অনুমতি দিতেন। তারপর তিনি বলে দিতেন স্বামী অরূপানন্দকে (রাসবিহারী মহারাজ) ব্যবস্থা করতে। স্বামী অরূপানন্দই মায়ের কাছে নিয়ে যেতেন।

সে সময় মায়ের কাছে সদাই স্ত্রীভক্তদের ভিড় লেগে থাকত। এরই মধ্যে ভরত মহারাজ গিয়ে প্রণাম করতেন মা-কে। মা কিন্তু মঠের সব খবরাখবর নিতে ভুলতেন না। প্রশ্ন করে করে সব কিছু জেনে নিতেন।

আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অকাল দেহত্যাগের পর এই সন্ন্যাসীসংঘ এবং বিশাল ভক্তমণ্ডলীর কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জননী সারদামণি। তিনিই দিনের পর দিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন : ঠাকুর আমার সন্তানদের জন্য একটা আশ্রয় তৈরি করে দাও। সেই আশ্রয়ই হল বেলুড়মঠ। নবযুগের নতুন তীর্থ। তাই সংঘ জননী শ্রী শ্রী মা ভরত মহারাজের কাছ থেকে মঠের সব খবর জেনে নিতেন পরম আগ্রহে। কারণ, তিনিই তো ছিলেন মূল চালিকাশক্তি।

১৯২৬ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে। ভরত মহারাজ এই দুটি মহা সম্মেলনই দেখেছেন।

প্রথম মহা সম্মেলনের কয়েকদিন আগে ভরত মহারাজ বেলুড়মঠে এসেছিলেন মায়াবতী থেকে। তার আগে গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে বন্যাত্রাণের কাজে। সেই প্রসঙ্গে সেদিন ভরত মহারাজ বললেন : 'এই প্রথম মহা সম্মেলনের বেশ কিছুদিন আগে মায়াবতী থেকে কয়েকদিনের জন্য বেলুড়মঠে এসেছিলাম। সেবার বাবুরাম মহারাজ আমাকে বললেন, 'হ্যাঁরে, এখানে এলি, মায়ের দর্শন হয়েছে? কখনও মায়ের বাড়ি জয়রামবাটি গেছিস?' আমি বললাম, 'না, এবার তো মা-কে দর্শন হয় নি। তাছাড়া আমি কখনও জয়রামবাটি যাই নি।'

সেবার শ্রীরামপুরের এক ভদ্রলোক মায়ের কাছে দীক্ষা নিতে জয়রামবাটি যাচ্ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁদের সঙ্গে ভরত মহারাজকেও জয়রামবাটি পাঠিয়ে ছিলেন।

ভরত মহারাজ সেই ঘটনার উল্লেখ করে বললেন : 'জয়রামবাটিতে শ্রী শ্রী মায়ের বাড়িতে সেবার তিন চারদিন ছিলাম। জয়রামবাটিতে শ্রী শ্রী মা-কে দেখলাম ভিন্ন রূপে। কলকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে যেভাবে দেখেছিলাম, ঠিক সেভাবে নয়। মা সেখানে যেন পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। তিনি থাকতেন ঘরোয়া সাজে। মাথায় ঘোমটা থাকত না। সব সময় ঘর সংসারের কাজ করতেন। সকলের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখতেন। হাসিমুখে নিজেই করতেন সব কাজ।'

সে সময় ভরত মহারাজ জননী সারদামণিকে দেখেছেন ভিন্ন রূপে। কলকাতার ভক্তরা রুটি খেতে অভ্যস্ত। তাই তাঁদের জন্য তিনি নিজের হাতে রুটি তৈরি করছেন। আবার ভোর না হতেই দুধের জন্য যাচ্ছেন গোয়ালার বাড়িতে। কারণ, কলকাতার ভক্তরা সকলেই চা খাবে। সকলের দিকে এবং সব ব্যাপারে তাঁর নজর।

এরপর বেশ কিছুদিন ভরত মহারাজ ছিলেন মায়াবতীতে। তারপর যখন আবার বেলুড়মঠে ফিরে এলেন, তখন জননী সারদামণি খুবই অসুস্থ। আছেন বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে। ভরত মহারাজের মুখে সেদিনের কথা শুনেছি; 'শ্রী শ্রী মায়ের শরীর ত্যাগের আগে আমি তাঁকে শেষ দর্শন করি উদ্বোধনে। বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে। তিনি তখন খুবই অসুস্থ। অথচ কি অপূর্ব শান্ত মূর্তিতে সব যন্ত্রণা সহ্য করছেন। কাশীর স্বামী সত্যানন্দ (সতীশ মহারাজ) আর আমি তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম।

আসলে তখন বেলুড়মঠ থেকে আমার আবার মায়াবতীতে ফিরে যাওয়ার কথা। সেখান থেকে যাব মানস সরোবর। তাই মা-কে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইতে গিয়েছিলাম। মা আমার মুখে সব কিছু শুনলেন তারপর বলনে, 'মানস বড় দুর্গম। খুব সাবধানে থাকবে। যা কিছুই কর না কেন, সব সময় ঠাকুরকে ধরে থাকবে।'

তারপর বেলুড়মঠে চলে এসেছি। মায়াবতী হয়ে যাত্রা করেছি মানস তীর্থের পথে। সে সময় আমার এক আশ্চর্য দর্শন হয়ে যায়।

আলমোড়া জেলার ভিতর এক জায়গায় কয়েকদিন আমরা বিশ্রাম করেছিলাম। সেখানে একটা ছোট বাড়িতে থাকতাম। সেখানে এক রাত্রে স্বপ্ন দেখি। পরে ঘড়িতে দেখেছিলাম, তখন রাত দুটো। স্বপ্নে দেখলাম, শ্রী শ্রী মা-কে অপূর্ব সাজে সাজানো হয়েছে। তাঁর পা দু-খানি আলতা মাখানো লাল।

তাঁকে এনে রাখা হয়েছে গঙ্গার ধারে। ঠিক এখন যেখানে মায়ের মন্দির-সেখানেই।

দ্বিতীয়বার এমন কোন দর্শন আমার হয় নি।

তারপর মানস তীর্থ থেকে ফেরার পথে তাকলাকোট নামে একটা জায়গায় আমরা বিশ্রাম করছিলাম। জায়গাটা একটা বড় ব্যবসা কেন্দ্র। সেখানেই পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রে দেখলাম শ্রী শ্রী মা দেহত্যাগ করেছেন। পরে মিলিয়ে দেখলাম যে রাত্রে আমি শ্রী শ্রী মা-কে দর্শন করেছিলাম-সেইদিনই তিনি দেহত্যাগ করেন।'

আর কখনও মা-কে দর্শন করেন নি?-জানতে চেয়েছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে আত্মগত স্বরে তিনি বললেন, 'না-আর কখনও শ্রী শ্রী মা আমাকে স্বপ্নে দর্শন দেন নি।'

এই রিপোর্টে একটি চিঠির উল্লেখ দেখতে পাই। চিঠিটির লেখক 'অতুল (ব্রহ্মচারী ভরত)'। বিখ্যাত রাজাবাজার বোমা মামলার অনুসন্ধান চলাকালে 'যে কয়টি চিঠি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে মায়াবতী থেকে প্রেরিত 'অতুল' এই স্বাক্ষরযুক্ত একটি সন্দেহজনক পোস্টকার্ড পুনরায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।' এই ছিল টেগার্টের মন্তব্য। চিঠিটি ছিল এরকম

প্রবুদ্ধভারত কার্যালয়
মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ অঃ
জিলা-আলমোড়া, য়ু.প্র.
তাং ৩রা মার্চ, ১৯১৪

ভাই বিনোদ,

অনেকদিন যাবৎ তোমার কোন খবর পাই নি আশা করি এই চিঠির উত্তরে সকল সংবাদ জানিয়ে আমাকে সুখী করতে ভুল হবে না।

মেদিনীপুরের বন্যাত্রাণ কাজ ফেলে আমি হঠাৎ হিমালয়ে এসে পৌঁছেছি। মেদিনীপুরে বন্যাত্রাণের কাজ ভালই চলছে। তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে? শরীরের দিকে নজর রাখবে। দৈনিক কিছুটা ব্যায়াম করলে ভাল হয়। এ জায়গার বর্ণনা কি দেব? জায়গাটি ভারি মনোরম এবং সাধুদের পক্ষে উপযুক্ত। জায়গাটি বাস্তবিক পূজার্চনার পক্ষেই উপযুক্ত, যেন সমস্ত মন গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতে চায়। জায়গাটার দূরত্ব এখান থেকে হাঁটা পথে প্রায় ১৫/২০ দিনের মত।

আমি ভাল আছি। তোমার কুশল সংবাদ জানিয়ে সুখী করো। এই চিঠির বিষয়ে আমার গ্রামের কাউকে কিছু জানিও না।

ইতি
তোমার
অতুল (ব্রহ্মচারী ভরত)।

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী
আশা কুটির, রাজশাহী, সমীপেষু

এই চিঠিটি হুবহু রিপোর্টে তুলে দিয়ে চার্লস টেগার্ট মন্তব্য করেছেন : 'উপরোক্ত চিঠির লেখক 'অতুল' হলেন ঢাকা নিবাসী অতুলচন্দ্র গুহ, যিনি ১৯১০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে বর্তমানে মায়াবতী আশ্রমে রয়েছেন এবং এখানে ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষানবিশী গ্রহণ করছেন।'

চার্লস টেগার্ট রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধু ও ব্রহ্মচারীদের একটা নামের তালিকাও তাঁর রিপোর্টের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিলেন। সেই তালিকায় 'ব্রহ্মচারীগণের' যে নাম আছে, তারই ২২ নম্বরে আছে ঢাকার অতুলচন্দ্র গুহের নাম। সেইসঙ্গে টেগার্ট মন্তব্য করেছেন, '১৯১০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন মায়াবতী আশ্রমে রয়েছেন।'

সেদিনের দুরন্ত বিপ্লবী এবং অনুশীলন সমিতির ডানপিটে কর্মী অতুলচন্দ্র গুহই পরবর্তীকালে রাম-

কৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বজনশ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী স্বামী অভয়ানন্দ–যিনি ভারত জুড়ে 'ভরত মহারাজ' নামেই আজ প্রণম্য। দেশমাতৃকাই ছিল যাঁদের একমাত্র আরাধ্য দেবী, স্বামী বিবেকানন্দের অভী-মন্ত্র ছিল যাঁদের জীবন সম্পদ, মায়ের জন্যই ছিলেন যাঁরা বলিপ্রদত্ত, সেই বাংলার দুর্জয় যৌবনের প্রতীক ও অতুলচন্দ্র কিভাবে সন্ন্যাসী জীবনে এসে প্রবেশ করলেন, তাই জানতে হলে আমাদের একটু পিছন ফিরে তাকাতে হবে।

(দুই)

সেটা ১৯০৯ সাল।

ঢাকা শহরের আর্মানিটোলার গুহ পরিবারের সন্তান অতুলচন্দ্র কলকাতায় এসেছেন শ্রী অরবিন্দকে দর্শন করতে। তখন স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবকদের মধ্যে শ্রী অরবিন্দ একজন আদর্শপুরুষ। অতুলের সঙ্গে এসেছেন তাঁর বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ বসু।

এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা ভালো যে, ভারতীয় জাতীয়তাবোধের জনক স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে এবং তাঁরই কালজয়ী প্রেরণায় গঠিত হয়েছে অনুশীলন সমিতি। পরাধীন ভারতের মুক্তিই যাঁদের একমাত্র কাম্য। সশস্ত্র গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে অনুশীলন সমিতির কাজকর্ম তখন যুবকদের উদ্দীপ্ত করে তুলেছে।

ঢাকা শহরে সেই সময় অনুশীলন সমিতির কাজকর্ম রীতিমত প্রসারিত। পুলিন দাস অনুশীলন সমিতির নেতা। অতুল সেই সমিতিরই সক্রিয় সদস্য।

দুই বন্ধু ঢাকা থেকে কলকাতায় এলেন। কিন্তু আশ্রয় নেবেন কোথায়? বীরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিই বললেন, 'চল বেলুড়মঠে যাই। সেখানেই দু'দিন থাকব।'

তখনকার বেলুড় তো এখনকার মত ছিল না। নিছকই পাড়া গাঁ। গাড়ি ঘোড়াও নেই। হাঁটা পথ। আর গঙ্গা দিয়ে নৌকায় যাতায়াত। হাওড়ার সালকিয়া পর্যন্ত স্টিমারে এলেন। সেখান থেকে দুই বন্ধু হাঁটতে শুরু করলেন।

সময় শরৎকাল। দুর্গাপূজার ঠিক পরেই। বেলুড়মঠে যাওয়ার আনন্দে অতুলও জোরদকমে হাঁটতে থাকেন।

দুই বন্ধু যখন বেলুড়মঠে এসে পৌঁছলেন, তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সভাপতি এবং রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দের সার্থক উত্তরসাধক স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাজা মহারাজা) একটা আরাম কেদারায় বসে বিশ্রাম করছিলেন। তিনি বীরেন্দ্রনাথকে আগে থেকেই জানতেন।

তাঁরা দু'জনে প্রণাম করলেন রাজা মহারাজকে। তারপর বীরেন্দ্রনাথ অতুলকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর ঋষি দৃষ্টি প্রসারিত করে লক্ষ্য করলেন ২০ বছরের উজ্জ্বল যুবক অতুলকে। অতুলও মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন রাজা মহারাজের দিকে। সম্ভবত, সেদিন দু'জনেই দু'জনকে চিনেছিলেন, দু'জনেই বুঝেছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণের অমোঘ ইচ্ছার কথা।
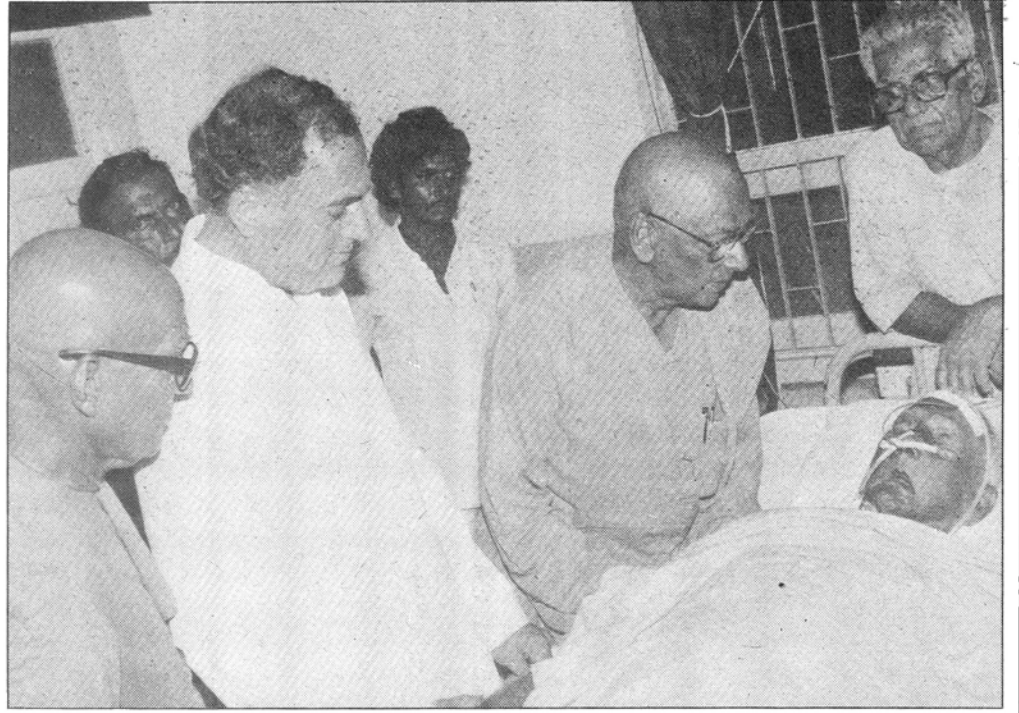
ভরত মহারাজকে দেখতে এসেছেন রাজীব গান্ধী
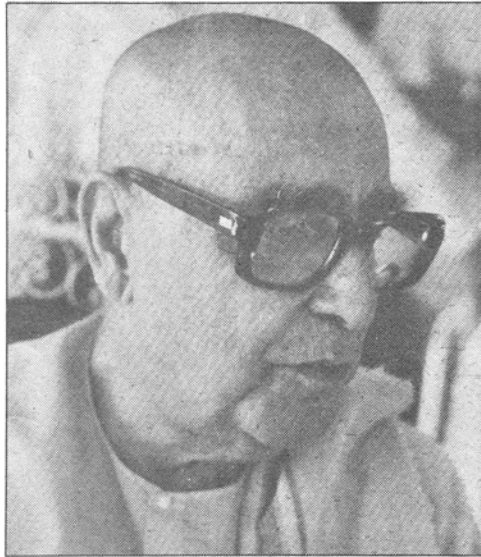
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

এই প্রথম পরিচয়। এই ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ।

বীরেন্দ্রনাথ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বললেন : আচ্ছা, অতুল কি কয়েকদিনের জন্য বেলুড়মঠে থাকতে পারে?

মহারাজ এক কথায় রাজি হলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে বললেন আশ্রমে থাকতে হলে সবাইকেই কিছু না কিছু কাজ করতে হয়। তোমাকেও করতে হবে।

অতুল রাজি হয়ে গেলেন। তিনি যেন এতদিনে ঠিক তাঁর মনের মানুষকে পেয়েছেন। এতদিনে খুঁজে পেয়েছেন সঠিক আশ্রয়।

কারণ, বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েও তিনি যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না এতদিন। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ছিল অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় শহর। শিক্ষা দীক্ষায় সব থেকে অগ্রণী জেলা। আবার স্বাধীনতা সংগ্রামেও এই জেলাই ছিল পুরোধা। ১৮৮৯ সালে অতুলের জন্ম। তারপর মাত্র পনের ষোল বয়স থেকেই দেশ মাতৃকার টানে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রই তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। শিখেছেন পিস্তল চালাতে। লড়তে জানেন কুস্তি। নিয়মিত ব্যায়াম করেন।

এখানে আরেকটি ঘটনাও স্মরণীয়। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ সালে ঢাকা গিয়েছিলেন। সে সময় দলে দলে যুবকরা এসেছিলেন স্বামীজিকে দর্শন করতে। সেদিন স্বামীজি একদল যুবককে অগ্নিগর্ভ ভাষায় বলেছিলেন পরাধীন জাতির কোন ধর্ম থাকতে পারে না। আগে দেশ থেকে বিদেশি লুঠেরাদের দূর করে দাও, তারপর শুনবে ধর্মের কথা। ভুলে যেও না, জন্ম থেকেই তোমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।

বিবেকানন্দের এই অগ্নিবর্ষী বাণী সেদিন ঢাকা শহরের যুব জীবনে এক নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল, যাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাই বিপ্লবী মহানায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের জীবনীতে।

দেশের স্বাধীনতা যজ্ঞে আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য সেদিন অতুলও অনিশ্চিতের পথে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে অনুশীলন সমিতির কিছু কিছু কাজ ও কিছু কিছু নীতি তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। মনের গভীরে প্রতিনিয়তই চলছিল সংশয়ের সংঘাত।

সেই সময়েই তিনি এলেন বেলুড়মঠে। অনেকটা আকস্মিকভাবেই। পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই। কিন্তু কেমন যেন ভালো লেগে গেল এই নতুন পরিবেশ, এই নতুন সম্পর্ককে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং প্রাণস্পর্শী ব্যক্তিত্ব অতুলকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করল। সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকজন সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) নিকট সম্পর্কে এসেছিলেন তিনি। বাবুরাম মহারাজের কথামত হাতে হাতে নানারকম কাজ করেন। কাজ করে আনন্দ পান।

এদিকে তাঁর বন্ধু বীরেনবাবু হঠাৎই একটা জরুরি কাজে ঢাকা ফিরে গেলেন। অতুল রায় থেকে গেলেন মঠে।

শেষ পর্যন্ত একদিন গঙ্গার ধারে হাঁটতে হাঁটতে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বললেন এবার ঢাকা ফিরে যাব।

উত্তরে তিনি বললেন : বেশ তো, সামনে স্বামীজির জন্মতিথি। মঠে এসেছ, সেই উৎসব দেখে যাও।

স্বামীজির জন্মতিথি উৎসব হয়ে যাওয়ার পর আবার একদিন তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বললেন : এবার তাহলে ফিরে যাই ?

ব্রহ্মানন্দজি সেই একই স্নেহের স্পর্শে বললেন : এত তাড়াতাড়ি কেন ? আর ক'দিন পরেই শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মতিথি। সেই উৎসব দেখে ফিরে যেও।

এভাবেই দিনের পর দিন গড়িয়ে গেল, মাসের পর মাস পার হয়ে গেল। অতুলের আর ঘরে ফেরা হল না। মঠেই রয়ে গেলেন তিনি। সন্ন্যাস–জীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি শুরু হল মনে মনে।

সে সময় মাখন সেন প্রমুখ বিপ্লবী মঠে আসতেন। অতুলের সঙ্গে যোগাযোগও হত তাঁদের। মুখে মুখে কথাটা গিয়ে পৌঁছল স্বামী শিবানন্দের কানে। তিনিই একদিন গঙ্গার ধারে নির্জনে ডেকে নিয়ে গেলেন অতুলকে। সরাসরি প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা, তুমি কি স্বদেশী ডাকাতি টাকাতি করেছ কোনদিন ?

জবাবে অতুল বললেন, না, অন্য অনেক কাজ করেছি। তবে ডাকাতি করিনি। শিবানন্দজি অতুলের কথায় আশ্বস্ত হলেন।

পরবর্তী কালে এই অতুলই একদিন ভরত হয়ে গেলেন। তিনি যখন মায়াবতী আশ্রমে ব্রহ্মচারী, সে সময় সেখানে আরেকজন অতুল ছিলেন। তাই স্বামী শিবানন্দজি অতুল গুহকে 'ভরত' নামে ডাকতে থাকেন। সেই নামই তাঁর জীবন জুড়ে প্রদীপ্ত। অপরজনকে শিবানন্দজি ডাকতেন শত্রুঘ্ন নামে।

অতুল বেলুড়মঠে এসে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে পান নি। কারণ, তিনি বেলুড়মঠে এসেছিলেন ১৯০৯ সালে। আর স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেছিলেন ১৯০২ সালে। স্বামীজিকে তিনি দর্শন

ভরত মহারাজ সারদা দেবীর সাক্ষাৎ শিষ্য

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতী সন্ন্যাসীরা

করতে না পারলেও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্তানদের মধ্যে স্বামী যোগানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং স্বামী অদ্বৈতানন্দ বাদে আর সকলেরই নিকট সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য উত্তরসাধিকা ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গেও পরিচিত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তখন বাগবাজারে থাকতেন। সেখানেই তাঁর আশ্রম জীবন। জননী সারদামণি এসেও থাকতেন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে। পরবর্তী সময়ে উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতেই মা থাকতেন। অতুল মাঝে মাঝে বাগবাজারে গিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতেন। ভগিনীর মুখ থেকে স্বামীজির কথা শুনতেন। তাঁর সামনে খুলে যেত এক অনাস্বাদিত জগতের পরম ইপ্সিত দুয়ার।

(তিন)

সেদিন জননী সারদামণির আরেকজন সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজি (চিন্তাহরণ মহারাজ) বলছিলেন–ভরত মহারাজ প্রথম থেকেই খুব সাহসী এবং শক্তিমান। সে সময় মঠে সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মাখন সেন প্রমুখ অনেকের যাতায়াত ছিল। ভরত মহারাজ এক দমে সাঁতরে গঙ্গায় এপার ওপার করতে পারতেন। আবার তিনি ছিলেন খুবই সেবাপরায়ণ। সকলকে ভালোবাসতে পারতেন প্রাণ খুলে। সেই সঙ্গে সেবা করতেন অক্লান্তভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) যক্ষ্মা হল। তখনকার দিনে সবাই যক্ষ্মারোগীকে এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু ভরত মহারাজ নিলেন সেবার ভার। সেদিন তাঁর সেই সেবা দেখে মঠের সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজি ভরত মহারাজের প্রায় সমসাময়িক। তিনি গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার প্রতিষ্ঠা করেন।

ভরত মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকজন সন্ন্যাসী–সন্তান স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন–সে কথা আমরা আগেই জেনেছি। প্রেমানন্দজি তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁরই নির্দেশে ভরত মহারাজ কলকাতায় গেলেন। গিয়ে উঠলেন বলরাম বসুর বাড়িতে। এখন সেটাই বাগবাজারে বলরাম মন্দির। তারপর ব্রহ্মচারী বীরেনের সঙ্গে গেলেন বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে। সেটাও বাবুরাম মহারাজের নির্দেশে। তিনিই প্রশ্ন করে জেনেছিলেন, 'হ্যাঁরে, তোর দীক্ষা হয়েছে ? তুইও দীক্ষা নে। জননী সারদামণির কাছে দীক্ষা নে।' আচমকা একথা শুনে বিস্ময়া-

বিপষ্ট হয়ে পড়েন তিনি ।

ভরত মহারাজ প্রশ্ন করলেন কিন্তু মায়ের কাছে দীক্ষা নেব কেমন করে ? তিনি তো আমাকে ভাল করে চেনেনেই না । উত্তরে বাবুরাম মহারাজ বললেন 'না তিনি তোকে চেনেন । তুই স্বামী সারদানন্দের (লীলা প্রসঙ্গকার শরৎ মহারাজ) কাছে যাবি, তাঁকে গিয়ে বলবি । স্বামী সারদানন্দ তোকে চেনেন ।'

তারপর তিনি বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে গিয়ে সারদানন্দের সঙ্গে দেখা করলেন । তিনিই ভরত মহারাজকে জননী সারদামণির কাছে নিয়ে গেলেন। শ্রী শ্রী মা সব কথা শুনে বললেন : 'হ্যাঁ বাবা, তোমার দীক্ষা হবে ।' সেটা ১৯১২ সাল ।

জননী সারদামণির কাছেই তাঁর মন্ত্রদীক্ষা । আর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম সংঘগুরু লোকান্তরিত শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজির সঙ্গে একই দিনে স্বামী ব্রহ্মানন্দের পদপ্রান্তে বসে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । নতুন জীবনে নতুন নাম হল স্বামী অভয়ানন্দ । কিন্তু ভরত মহারাজ নামেই তিনি হলেন সর্বজনের কাছে পরিচিত । একই দিনে সন্ন্যাস হলেও ভরত মহারাজ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজির চাইতে বয়সে একটু বড় ছিলেন ।

অনেক সময় ভরত মহারাজের পদপ্রান্তে বসে তাঁর মহাজীবনের অনেক কথা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে এই কৃতার্থ প্রতিবেদকের । তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলনের কথা ।

ভরত মহারাজ বলেছিলেন সে সময় আমি হিমালয়ের মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রমে ছিলাম । মহাসম্মেলনের কিছুদিন আগে বেলুড় মঠে এসেছিলাম । কিন্তু তখনকার মঠ ও মিশনের সম্পাদক সারাদানন্দজী আমাকে বললেন, 'মায়াবতী থেকে সবাই সম্মেলনে যোগ দিতে চলে এসেছেন । সেখানে কেউ নেই । তুমি সেখানে গিয়ে থাক ।' তাই আমি চলে গেলাম । আমার আর সম্মেলনে থাকা হল না । মিসেস সেভিয়ারের সহায়তায় স্বামী বিবেকানন্দ এই মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলন যখন ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত হয় তখন তিনি এর পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন ।

মায়াবতীর কথা বলতে শুরু করলে তিনি বলতেন, 'আমি অবশ্য শীতের জায়গায় থাকতেই বরাবর ভালোবাসি । মায়াবতীতে শীতকালে দারুণ শীত । আমি গরম কালে যদি বা সেখানে না থাকতাম শীতে কিন্তু থাকতামই । এই আশ্রমটি হিমালয়ের পাদদেশে । কুমায়ূন পর্বতমালায় । আলমোড়ার কাছেই ।

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দের মুখে শুনেছি মায়াবতীতে ম্যানেজার থাকাকালে ভরত মহারাজ অসাধ্য সাধন করেছেন । সে সময় সারা বছরের বাজারএকদিনে করে আনতে হত সমতলে নেমে
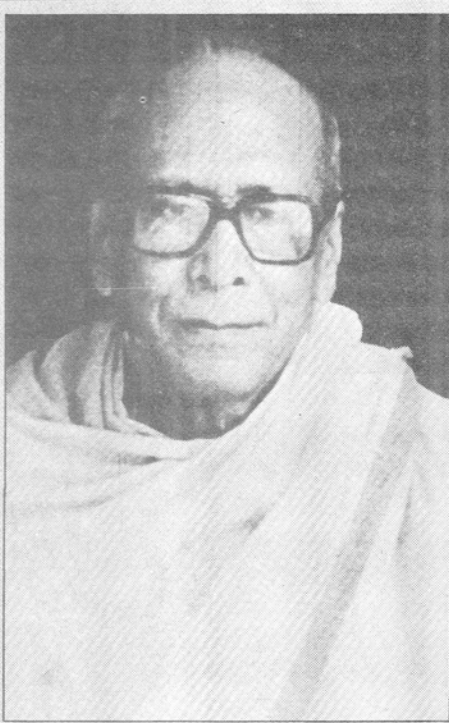
স্বামী গম্ভীরানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সহচরদের নিকট সান্নিধ্যে আসার দুর্লভ সুযোগ যেমন তাঁর হয়েছে, তেমনি জননী সারদামণির কৃপা অঝোর ধারায় বর্ষিত হয়েছে তাঁর মস্তকে।

টনকপুর থেকে । যাঁরা যেতেন তাঁরা যাতায়াতে তিনদিন সময় নিতেন । জায়গায় জায়গায় বিশ্রাম করতেন। ভরত মহারাজ কিন্তু কোন বিশ্রাম না করে একটানা চলে আসতেন । ভাল শিকারী ছিলেন তিনি । অব্যর্থ ছিল তাঁর লক্ষ্য । অতিথি পরায়ণতায়ও তাঁর কোন তুলনা ছিল না ।

ভরত মহারাজের একশ বছরের জীবনে শেষ ষাট বছর কেটেছে বেলুড়মঠে । তার আগে প্রায় সবটাই মায়াবতীতে ।

মায়াবতী থেকেই চলে আসেন বেলুড়মঠে । হলেন ঠাকুর সেবার ভাঁড়ারী। পরে হলেন ম্যানেজার । স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ-শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সহচরদের নিকট সান্নিধ্যে আসার দুর্লভ সুযোগ যেমন তাঁর হয়েছে, তেমনি জননী সারদামণির কৃপা অঝোর ধারায় বর্ষিত হয়েছে তাঁর মস্তকে ।

স্বামী ভূতেশানন্দকে নিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বারজন সভাপতিকেই তিনি দেখেছেন এবং সকলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন । কিন্তু নিজে কোন পদের অধিকারী হন নি । মঠ ও মিশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন । কিন্তু সহস্র অনুরোধেও কোনও পদ গ্রহণ করেন নি । অজস্র ভক্তের প্রণামে তাঁর জীবন প্রবাহ কখনও বিচলিত হয় নি । শান্ত, সমাহিত এবং পবিত্র জীবনের অধিকারী তিনি । তবে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ বা স্বামী গম্ভীরানন্দজির মহাপ্রয়াণের পর সাময়িকভাবে অস্থায়ী সভাপতির পদ গ্রহণ করেছেন । সেটা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ।

সভা সমিতিতে বক্তৃতা করেন নি, তেমন কোন প্রবন্ধ বা পুস্তকও লেখেন নি, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব সমকালীন মানুষকে করেছে প্রভাবিত । শুধু ইন্দিরা গান্ধী, জ্যোতি বসু বা রাজীব গান্ধীই নয়, তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, তাঁরাই হয়েছেন মুগ্ধ এবং শ্রদ্ধানত । এই দীন প্রতিবেদকও তাঁদেরই একজন ।

মঠ অফিসের প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য স্মৃতিপূতঃ আম গাছটার নিচে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি বসতেন । সঙ্গে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী মন্টুবাবু । কত দূর-দূরান্তের ভক্ত আসতেন তাঁকে প্রণাম জানাতে । কত বিত্তবান, কত নিঃস্ব—সবাই এক সারিতে । সকলকেই বলতেন প্রসাদ নিয়ে যেও । ধ্যানমগ্ন ঋষির মত মৃদুকণ্ঠে সকলের কুশল জানতেন । বলতেন মায়ের কথা ।

শতবর্ষের মহাজীবনে তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের যোগসূত্রটিকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন ঐতিহ্যের পবিত্র বন্ধনে । আবার তিন পুরুষের ভক্তজীবনে তিনি একই প্রভায় হয়েছেন বিকশিত । তাঁর অপার স্নেহ এবং আশীর্বাদ পেয়েছেন যাঁরা, তাঁরা পেয়েছেন পুণ্যজীবনের স্পর্শ । জননী সারদামণির সন্তান যেন জননীর মতই সকল বিপন্ন মানুষকে দিয়েছেন নির্ভয় আশ্রয় । বিপদে দিয়েছেন অভয় ।

ইন্দিরা, রাজীব, জ্যোতি বসু যেখানে নতমস্তক

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হল। জনতা দল এল দিল্লির ক্ষমতায়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হলেন ক্ষমতাচ্যুত।

তারপরই জরুরী অবস্থাকালীন নানা অভিযোগে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে একটার পর একটা তদন্ত কমিশন তৈরি হতে শুরু হল। গঠিত হল শাহ কমিশন।

সেদিন ইন্দিরার একান্ত ঘনিষ্ঠজনেরাও একে একে দূরে সরে যেতে লাগলেন। অবশ্য সামান্য কয়েকজন রইলেন তাঁর অনুগত। প্রকৃতপক্ষে সেদিন তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ। ক্ষমতালোভাতুররা আর সেদিন ক্ষমতাচ্যুত ইন্দিরার পাশে নেই।

সেই সময় একদিন আসামে যাওয়ার পথে হঠাৎই তিনি কলকাতায় এলেন। দমদম বিমান বন্দরে তাঁকে ঘিরে নেই কোন কড়াকড়ি। নেই কোন ভিড়। নেই রাশি রাশি ফুলের মালা। দু-একজন কংগ্রেস নেতা ছাড়া আর কেউ সেখানে উপস্থিতও ছিলেন না।

দমদম থেকেই তিনি চলে এলেন বেলুড়মঠে। খবরটা আমি আগেই পেয়েছিলাম। তাই খুব তাড়াতাড়ি ছুটলাম বেলুড়মঠে।

অন্য সময় ইন্দিরা এলে সিকিউরিটির কত তোড়জোড় দেখেছি। সেদিন কিছু নেই, কেউ নেই। ইন্দিরা গান্ধী অন্য পাঁচজন দর্শনার্থীর মতই গাড়ি থেকে নেমে সঙ্গে একজন সঙ্গীকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছেন। পূজনীয় সন্ন্যাসীরা এই খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁকে স্বাগত জানাতে বেরিয়ে এলেন। কারণ, ইন্দিরা তো রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে নন, রামকৃষ্ণ মিশনের একান্ত আপনজন হিসেবেই এখানে এসেছেন। তাই, প্রধানমন্ত্রীরূপে এলে তাঁকে যেভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়, একজন সাধারণ দর্শনার্থী হিসেবে এলেও তাঁকে ঠিক সেভাবেই স্বাগত জানানো হল। তিনি করজোড়ে সন্ন্যাসীদের প্রণাম জানিয়ে সোজা চলে গেলেন মন্দিরে।

কি প্রশান্ত তাঁর চেহারা। ভারত জুড়ে তাঁকে নিয়ে এত যে হৈ চৈ হচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে এত যে প্রচার হচ্ছে, তার কোন ছায়া নেই ইন্দিরার চোখে-মুখে। শ্রীরামকৃষ্ণর সামনে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে তারপর তিনি সোজা চলে গেলেন মঠ অফিসে। সেখানেই আছেন তাঁর অভয় আশ্রয় এবং সব থেকে বড় অবলম্বন ভরত মহারাজ। স্বামী অভয়ানন্দজি।

স্বামী বিবেকানন্দ যে বাড়িতে থাকতেন, সেই বাড়িরই দোতলায় যে ঘরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ থাকতেন, সেই ঘরেই থাকেন ভরত মহারাজ। আর সেই বাড়ির একতলায় তাঁর অফিস ঘর।

ইন্দিরাজি আসতেই ভরত মহারাজের সর্বক্ষণের সঙ্গী মন্টুবাবু তাঁকে নিয়ে গেলেন দোতলায়। গঙ্গার ধারের সেই বারান্দায়। সেখানে আর কেউ নেই। কেউ ছিলেন না। শুধু ভরত মহারাজ এবং তাঁর ইন্দু। সেই ছোট্ট মেয়ে ইন্দু। এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জের আশ্রমে যে ছোট্ট মেয়েটিকে সামলাতে গিয়ে তিনি হিমশিম খেতেন।

প্রায় ৪০ মিনিট পরে ইন্দিরাজি বেরিয়ে এলেন সেই বাড়ি থেকে। চোখে মুখে তাঁর তৃপ্তির ছোঁয়া। আত্মবিশ্বাসের স্ফুরণ। দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন তিনি গাড়ির দিকে।

ইন্দিরাজি চলে যাওয়ার ঠিক পরেই হাজির হলাম গিয়ে ভরত মহারাজের পদপ্রান্তে। স্বল্পবাক এবং গম্ভীর এই সাধক সন্ন্যাসী তখনও যেন তন্ময় হয়ে কি ভাবছেন।

আমার কথায় তিনি যেন সজাগ হলেন। বললাম, ইন্দিরাজি কি বললেন?

—সে অনেক কথা। জানো ইন্দিরার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। আছে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। অথচ এত যে কাণ্ড হচ্ছে, কারোর বিরুদ্ধে ওর কোন অভিযোগ নেই। দেখবে, ও আবার জয়ী হবে; দেখবে, মানুষ নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন।

ইন্দিরাজির কাছে ভরত মহারাজ যেমন ছিলেন ঠিক পিতার মতই, তেমনি ভরত মহারাজের কাছেও ইন্দিরা ছিলেন ঠিক মেয়ের মতই। স্নেহের ইন্দু। এই সম্পর্ক দীর্ঘদিনের।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এলাহাবাদের আনন্দভবন থেকে নেহরু পরিবারের প্রায় সকলকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেত ইংরেজের পুলিশ। সে সময় ইন্দিরাজির মা কমলা নেহরু প্রায়ই যেতেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাস স্বামী শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজ) কাছে। তাঁর কাছে গেলেই শান্তি পেতেন, ভরসা পেতেন। মায়ের সঙ্গে যেত ছোট্ট ইন্দুও। এই ইন্দুকে জমা দেওয়া হত স্বামী শিবানন্দের সেবক ভরত মহারাজের কাছে। আবার কখনও কখনও নেহরু পরিবারের উগ্র আধুনিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারতেন না কমলা নেহরু। তিনি ছিলেন ভারতীয় সনাতন ভাবধারার সার্থক প্রতিনিধি। মায়ের এই মানসিক যন্ত্রণার ছবিটা ইন্দিরার কাছেও গোপন থাকত না। মা যে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ছুটে যেতেন স্বামী শিবানন্দের কাছে। সঙ্গে যেতেন ইন্দিরা।

সেই যে যাওয়া আসা তার আর বিরাম ঘটে নি। দুঃখ-যন্ত্রণা মর্মবেদনা যখনই এসে ইন্দিরার জীবনে হাজির হয়েছে, তখন তিনিও ছুটে এসেছেন ভরত মহারাজের কাছে।

১৯৮০ সালের ২৩ জুন সঞ্জয় গান্ধী দুর্ঘটনায় নিহত হলেন।

সঞ্জয় গান্ধীর আকস্মিক মৃত্যুতে পুত্রহারা মা ইন্দিরা চোখের জল ফেলতে পারেন নি। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। কালো চশমার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর জলভরা দুটি চোখ। কিন্তু সঞ্জয়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই ভরত মহারাজের কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। কেঁদেছেন অঝোরে। সেদিন দেখলাম, ভরত মহারাজের হাঁটুর উপর মাথা রেখে ইন্দিরা কেঁদেছেন বলে সে জায়গাটা অশ্রু সিক্ত হয়ে গেছে। একান্ত আপনজনের কাছে কাঁদতে পেরে বুকের জমাট বাঁধা পাথরটা যেন নেমে গেল তাঁর। জওহরলালের মৃত্যুর পর তিনি ভরত মহারাজকে আরও বেশি করে আশ্রয় হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর আগেও কি করেন নি?

(দুই)

১৯৬০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ফিরোজ গান্ধীর মৃত্যু হল। ইন্দিরা মাতৃহারা হয়েছেন আগেই। এবার হলেন স্বামীহারা।

পরদিন ভোরে বেলুড়মঠে ফোন এল নয়াদিল্লি থেকে। অসহায় কণ্ঠে টেলিফোন করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। টেলিফোন করছেন স্বামী অভয়ানন্দজীকে। যিনি ভরত মহারাজ নামেই সর্বজনের মনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। স্বামীর মৃত্যুতে ইন্দিরা ভীষণরকম ভেঙে পড়েছেন। একা একা বন্ধ ঘরে বসে আছেন। কিছু খাচ্ছেনও না। তাই ভরত মহারাজকে দিল্লিতে আসার সাধনায় অনুরোধ জানালেন বিচলিত পিতা। জওহরলালের বিশ্বাস আর কারও কথা না শুনলেও ভরত মহারাজের কথা শুনবেন ইন্দিরা।

সেদিন বেলুড় মঠে বিশেষ কিছু কাজ ছিল। তাই সেদিনই তিনি দিল্লি যেতে পারেন নি। গিয়েছিলেন পরদিন সকালে।

নয়াদিল্লির তিনমূর্তি ভবনে তিনি গিয়ে পৌঁছতেই এগিয়ে এলেন বিমর্ষ প্রধানমন্ত্রী নেহরু। তিনিও তখন অসুস্থ। ভরত মহারাজকে দেখে যেন অকূলে কূল পেলেন। বললেন, আপনি একটু ইন্দিরাকে দেখুন। শেষপর্যন্ত পিতৃপ্রতিম ভরত মহারাজের কাছে এসে কন্যাসমা ইন্দিরা পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়ালেন। ভরত মহারাজ এগিয়ে দিলেন এক গ্লাস ফলের রস। এবার আর ইন্দিরা অস্বীকার করতে পারলেন না। হাতে তুলে নিলেন সেই ফলের রস।

পরবর্তীকালে সারা দেশের কাছে যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তখনও ভরত মহারাজের কাছে তিনি সেই ছোট্ট মেয়ে ইন্দু।

বেলুড়মঠে তাঁর অফিসের সামনে উঠোনে একটা চেয়ারে বসেছিলেন সেদিন সন্ধ্যায় ভরত মহারাজ। পাশে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী মন্টুবাবু।

আমি বসে আছি তাঁর পদপ্রান্তে। ধীর শান্ত কণ্ঠে কথা বলছিলেন তিনি। বলছিলেন, একদিন যেমন মা কমলার সঙ্গে ছোট্ট ইন্দু আসত আমার কাছে, পরে আবার মা ইন্দুর সঙ্গেই আমার কাছে আসত তাঁর দুই ছেলে রাজীব এবং সঞ্জয়। রাজীব শান্ত, ধীর, সঞ্জয় চঞ্চল। দিল্লিতে যখন যেতেন ভরত মহারাজ, তখনও আসতেন ইন্দিরা। কলকাতায় ইন্দিরা এলে ভরত মহারাজের সঙ্গে একবার দেখা করবেনই।

ইন্দিরা গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঠিক কয়েকদিন আগের ঘটনা। বিহারের জামশেদপুরে একটা টি ভি রিলে সেন্টার উদ্বোধন করতে এসে সেখান থেকে সোজা চলে এলেন বেলুড়মঠে। কলকাতায় অন্য কোন কর্মসূচী ছিল না। সেদিন ইন্দিরাজী এসেই বলেছিলেন: জামশেদপুরে অনুষ্ঠানে আসাটা তেমন কোন জরুরী ছিল না, কিন্তু এলাম কেন জানেন? সেখান থেকে একবার বেলুড় মঠে আসা যাবে, সেই জন্য। এখানে এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে যেমন তিনি শক্তি পান, তেমনি ভরত মহারাজের সঙ্গে কথা বলে ভরসা পান।

ভরত মহারাজের সঙ্গে একান্তে কথা বলার সময় তিনি সেদিন বলেছিলেন: দেশ এক ভয়ংকর সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সামনে রয়েছে বিপদ —তাই আশীর্বাদ চাইতে এসেছি।

সেই তাঁর শেষ আসা। তবে কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিপদের সম্ভাবনা? তাই শিশুর মতই তিনি এসেছিলেন ভরত মহারাজের কাছে আশীর্বাদ চাইতে। মেয়ে যেমন পিতৃগৃহে এসে আশ্বস্ত হয় ইন্দিরাও তাই হতেন। সেদিন ভরত মহারাজ কাছে বসিয়ে তাঁকে প্রসাদ দিয়েছিলেন। সঙ্গে দিয়েছিলেন একটি প্রসাদী শাড়ি। রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গলের ব্যাপক ও সর্বাত্মক পল্লী উন্নয়নের কথা তিনি সাগ্রহে শুনেছিলেন স্বামী আত্মস্থানন্দজীর কাছে। সেখানে তখন উপস্থিত স্বামী গহনানন্দজীও। তারপর এক সময় ভরত মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে প্রসন্ন হৃদয়ে বিদায় নিয়েছিলেন ইন্দিরাজী। কিন্তু সেদিন তিনি কি জানতেন এই তাঁর শেষ দর্শন? তাই কি বারবার ফিরে দেখছিলেন দুয়ারবন্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের দিকে? ভরা গঙ্গার পুণ্য স্রোতের দিকেও একবার পূর্ণায়ত নয়নে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। আমি তাঁকে সেদিন ছায়ার মত অনুসরণ করেছিলাম।

রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ ভাবধারার সঙ্গে যেমন ইন্দিরার আত্মিক যোগ ছিল, তেমনি অবিচ্ছেদ্য যোগ ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও। ভরত মহারাজ ছিলেন তারই যোগসূত্র। নেহরু পরিবারের পাঁচ পুরুষের (রাহুল ও প্রিয়াংকাকে ধরে) সঙ্গেই গ্রথিত এই যোগসূত্রটি। মতিলাল নেহরুর স্ত্রী ইন্দিরার ঠাকুমা স্বরূপরানী থেকেই এই সূত্রটির সূচনা। স্বরূপরানী মিশনে আসতেন নিয়মিত। ইন্দিরার মা কমলা নেহরু ছিলেন স্বামী শিবানন্দজীর অন্যতম সেবক। এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জ মঠ থেকে বেলুড় মঠ, সেই যাওয়া আসার বিরাম নেই। মায়ের সঙ্গেই আসতেন ইন্দিরা। তিনি নিজেও শ্রীরামকৃষ্ণের দুই সন্তান স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দের আশীর্বাদ ধন্য। রাজীব গান্ধীও বজায় রেখেছেন সেই ধারা। রাজীবের পুত্র কন্যারাও অনেকবার এসেছে তাঁর কাছে।

১৯৫৫ সালে রাশিয়ার দুই নায়ক ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন এলেন ভারত দর্শনে। প্রথমে এলেন নয়া দিল্লিতে। রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী ধরলেন ভরত মহারাজকে। বললেন: চলুন দিল্লিতে গিয়ে ক্রুশ্চেভ বুলগানিনকে দেখে আসি। দিল্লিতে গেলেন তাঁরা। দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ইন্দিরাকে ফোন করলেন ভরত মহারাজ। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা এসে হাজির মিশনে। তখন ভরত মহারাজ ইন্দিরাকে বললেন আসার কারণ। ইন্দিরাজী সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা করলেন। যথাসময়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। মোগল গার্ডেনসে রাশিয়ার দুই নায়ককে যে রাষ্ট্রিয় সম্বর্ধনা জানানো হয়, সেখানেই গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীরা গেলেন পরম সম্মানিত অতিথি হিসেবে। জওহরলাল নেহরু একে একে সকল সম্মানিত অতিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এলেন ভরত মহারাজের কাছে। তারপর ক্রুশ্চেভ বুলগানিনকে তিনি শ্রদ্ধানম্র চিত্তে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের কথা বললেন। বললেন, রামকৃষ্ণ মিশনের কথা। তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে।

এরকম কত মধুর স্মৃতি, কত অশ্রুভারাক্রান্ত কাহিনী শুনেছি ভরত মহারাজের কাছে। কথা বলতে চান না, তবু যখন বলেন, তখন অবাক হয়ে শুনতে হয়। কথায় কথায় অনেকবার বলেছেন: দেখ, ইন্দু সাধারণ মেয়ে নয়। ওর একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। তাই ইন্দু এত বড় হয়েছে।

একদিকে যেমন নেহরু পরিবার, অন্যদিকে তেমনি ঢাকা জেলার বারোদি গ্রামের বসু পরিবার। পশ্চিমবঙ্গের মার্ক্সবাদী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পিতা নিশিকান্ত বসুর সঙ্গেও ছিল ভরত মহারাজের নিকট সম্পর্ক। জ্যোতি বসু যখন ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে যান, তখনও তিনি বেলুড় মঠে গিয়ে ভরত মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। বিয়ের পর নববধূকে নিয়ে মঠে গেছেন ভরত মহারাজের কাছে।

আবার যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তখনও কয়েকবার বেলুড়মঠে ছুটে গেছেন ভরত মহারাজের আকর্ষণে।

সেবার জ্যোতি বসু তাঁর স্ত্রী, শ্যালিকা এবং নাতনিকে নিয়ে গেছেন বেলুড়মঠে। মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে সপরিবারে তিনি গেলেন ভরত মহারাজের কাছে। দোতলার সেই ঘর—যেখানে অনেক নামকরা মানুষই এসেছেন। সেখানেই গিয়ে বসলেন তাঁরা। তখন জ্যোতি বসুও ভিন্ন মানুষ। সেই গাম্ভীর্য নেই। কত খোলামেলা, কত আনন্দময়। প্রসাদ খেলেন তৃপ্তির সঙ্গে। পরিবারের কত কথা শোনালেন ভারত মহারাজকে। প্রবাদ অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণ ননী খেতেন যে পাতায়, ঠিক বাটির মত সেই পাতা একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী দেখালেন জ্যোতি বসুকে। মঠেই গাছ আছে। সেই একটি পাতা সাদরে নিজের পকেটে রেখে দিলেন জ্যোতিবাবু। তিনি তখন অন্য মানুষ। ভরত মহারাজের সান্নিধ্য ছিল এমনই মোহময়।

রাজীব গান্ধী এবং জ্যোতি বসু—দুজনেই ভরত মহারাজের কাছে এসে একাসনে বসেছেন। একসঙ্গে আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছেন।

তাই ভরত মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন তাঁর শতবর্ষ পূর্তিতে—এই খবরে যেমন রাজীব গান্ধী হয়েছেন উদ্বিগ্ন, ছুটে এসেছেন দিল্লি থেকে, মধ্যরাত্রে চলে গেছেন ভরত মহারাজকে দেখতে, তেমনি জ্যোতি বসু হয়েছেন বিচলিত। তিনিও সব কাজ ফেলে রেখে ভরত মহারাজকে দেখতে চলে গেছেন। রাজনীতির মানুষ যেমন তেমনি সঙ্গীত জগৎ এবং অভিনয় জগতের মানুষেরাও ভরত মহারাজের সান্নিধ্যে এসে রূপান্তরিত হয়েছেন ভিন্ন মানুষে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সরোদিয়া আমজাদ আলি বা প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন—সকলেই কি এক অদম্য আকর্ষণে ভরত মহারাজের কাছে এসে হাজির হন না? তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে পাঞ্জাব থেকে কি সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ও সেদিন ছুটে আসেন নি?

আমার মনে আছে, সঞ্জীব রেড্ডি তখন ভারতের রাষ্ট্রপতি। তিনি এসেছেন বেলুড়মঠ দর্শন করতে। এসেই খবর নিলেন: ভরত মহারাজ কোথায় থাকেন? সস্ত্রীক তিনি গিয়ে হাজির হলেন ভরত মহারাজের কাছে। প্রণাম জানিয়ে ধন্য হলেন।

এরকম কত মানুষ। কত দেশের মানুষ। কত রাজনীতিবিদ। কত পণ্ডিত। কত লেখক। কত শিল্পী। কত সাধারণ মানুষ। সকলের কাছে তিনি হচ্ছেন প্রাণের মানুষ। জীবন্ত প্রেমের উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি।

প্রণবেশ চক্রবর্তী

হতাশায় দিয়েছেন আনন্দ। তাঁর অভয়ানন্দ নাম যেন তাঁর জীবন সম্পদেই সার্থক।

তিনি ভক্তদের কিরকম ভালোবাসতেন, তাঁর একটা দৃষ্টান্ত শুনেছি একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর মুখে। তখন বেলা একটার মধ্যে মঠে অতিথিদের অন্নপ্রসাদ দেওয়া শেষ হয়ে যেত। একটার পর সন্ন্যাসীরা সবাই বিশ্রাম করতে চলে যেতেন। একদিন একজন ভক্ত বহুদূর থেকে এসেছেন। মঠে এসে পৌঁছেছেন বেলা একটার কিছু পরে। ফলে তিনি আর প্রসাদ পান নি। অথচ ভরত মহারাজের সঙ্গে দেখা না করেও ফিরতে পারছেন না। তিনি অপেক্ষা করে রইলেন।

বেলা তিনটার পর ভরত মহারাজ নিচে নেমে এলেন। সেই ভক্তকে দেখে অবাক। জানতে চাইলেন, 'কখন এসেছ ?'

ভক্তটি উত্তর দিলেন, 'বেলা একটায়।'

আবার তিনি জানতে চাইলেন : প্রসাদ পেয়েছে ? ভক্তটি কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন। তাতেই ভরত মহারাজ যা বোঝার বুঝে নিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারপ্রাপ্ত সাধুকে ডেকে প্রশ্ন করলেন : কিছু খাবার আছে ? সাধুটি জানালেন : না, সব শেষ হয়ে গেছে। এতে ভরত মহারাজ খুব দুঃখিত ও বিরক্ত হলেন। এরপর থেকে তিনি অপেক্ষা করতেন, যতক্ষণ না সকলের প্রসাদ পাওয়া হয়।

আরেকদিনের ঘটনা। সেটা প্রথম যুগের। সেদিন বিকেলে ঠাকুরকে নিবেদন করার মত কিছুই ছিল না মঠের ভাঁড়ারে। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, ঠাকুরকে কি দিয়ে পূজা দেওয়া হবে ?

হঠাৎ ঠিক সেই সময় এক ভদ্রলোক এসে হাজির। তিনি অনেক ফল ও মিষ্টি নিয়ে এসেছেন ঠাকুর সেবার জন্য। এই ঘটনায় ভরত মহারাজ সেদিন ঠাকুরের মহিমায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

(চার)

দিনের পর দিন মঠ অফিসে সেই আম গাছটার নিচে বসে, অথবা এক তলায় তাঁর অফিস ঘরে বসে ভরত মহারাজের মুখ থেকে কত কাহিনী শুনেছি। শুনেছি, স্বামী প্রেমানন্দজির সঙ্গে যখন তিনি নবদ্বীপে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে দেখেছিলেন, বৈষ্ণব–পুরুষেরা নারীবেশ ধারণ করে মধুর ভাবের সাধনা করছেন। এরা যে পুরুষ–সেটা চালচলন, কথাবার্তা বা পোশাকে আশাকে একেবারেই বোঝার উপায় ছিল না। আবার সেই সময়েই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণে ধন্য ও পবিত্র কলাইঘাটায়ও গিয়েছেন। এই কলাইঘাটা রানাঘাট সন্নিহিত চূর্ণী নদীর তীরেই। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ শিবজ্ঞানে জীবসেবায় বাস্তবরূপ দেখিয়েছিলেন।

তিনি কথা খুব কম বলতেন। কোন প্রসঙ্গ তুললে প্রথমে কিছুই বলতে চান না। তারপর ধীরে ধীরে সেই প্রসঙ্গটি আলোচনা করেন। তার সর্বক্ষণের সঙ্গী মন্টুবাবু (ইঁটাচুনা জমিদার বংশের এই মানুষটি ভরত মহারাজের সঙ্গে ছায়ার মত মিশে আছেন) মাঝে মাঝে খেই ধরিয়ে দেন। তারপর তিনি বলতে থাকেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিয়ম অনুসারে একমাত্র প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টরাই দীক্ষা দিতে পারেন। ভরত মহারাজ কাউকে কখনও দীক্ষা দেন নি। তবু সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মত অনেকেই তাঁকে গুরু বলে মনে করেন। ইন্দিরা গান্ধীর জীবনে তিনি ছিলেন পিতৃপ্রতিম।

তাঁকে কেউ কি কোনদিন পূজা করতে দেখেছেন ? আমি তো শুনিনি। স্বামীজির 'ওয়ার্ক ইজ ওয়রশিপ' মন্ত্রেই তিনি বিশ্বাস করতেন। মেদিনীপুরের বন্যায় কতবার তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সেবা করেছেন, তা লেখাজোখা নেই। এই অটুট শৃংখলাবদ্ধ এবং আত্মসমাহিত জীবনের অধিকারী তিনি।

স্বামীজির বাড়ির দোতলায় যে ঘরটিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ থাকতেন, গঙ্গার সামনে সেই ঘরেই তাঁর অধিষ্ঠান। প্রতিদিন সকাল থেকেই অসংখ্য মানুষ আসতেন তাঁকে দর্শন করতে, তাঁকে প্রণাম জানাতে। অনেকেই বেলুড়মঠে এসে খোঁজ করতেন, ভরত মহারাজ কোথায় থাকেন ? সকাল ৯টা থেকেই তিনি ব্যস্ত। বেলা দু'টো পর্যন্ত নিচের অফিসে অপেক্ষা করতেন। যদি কেউ আসে। যাতে কেউ এসে ফিরে না যায়। সবদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। বিকেল পাঁচটায় আবার নেমে আসতেন। রাত দশটায় উঠতেন নিজের ঘরে।

অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত এই নিয়মেই চলেছেন তিনি। ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতই। এরই মধ্যে সংসার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত কত মানুষের কথা শুনেছেন তিনি অধীর আগ্রহে। কতজনের ক্ষতে বুলিয়ে দিয়েছেন আশ্বাসের প্রলেপ।

একবার তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, এবার বেলুড়মঠে স্বামীজির জন্মতিথিতে তোমাকে বক্তৃতা করতে হবে। শুনে তো আমি ভয় পেয়ে গেলাম। প্রথমত, বেলুড়মঠে বক্তৃতা, দ্বিতীয়ত, সন্ন্যাসীদের সামনে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলা। তিনি বুঝতে পারলেন আমার দুর্বলতা। মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ভয় কি ? যার কথা বলবে, দেখবে তিনিই তোমাকে সাহস দেবেন, শক্তি দেবেন। কোন চিন্তা করো না।

তারপর সেই বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর সমবেত সকলেই যখন আমাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন, তখন ভরত মহারাজ আমাকে ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে বললেন : কি বলি নি। স্বামীজির উপর ভরসা রাখো। স্বামীজিই দেখবেন।

আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। মনে মনে ভাবলাম, ঢাকার অতুলচন্দ্র গুহ সেই ভরসা রেখেই তো আজ গোটা দেশের প্রণম্য ভরত মহারাজ। মন্দিরে তখন আরতি শুরু হয়ে গেছে।

স্বামীজির বাড়ির দোতলায় যে ঘরটিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ থাকতেন, গঙ্গার সামনে সেই ঘরেই তাঁর অধিষ্ঠান। প্রতিদিন সকাল থেকেই অসংখ্য মানুষ আসতেন তাঁকে দর্শন করতে, তাঁকে প্রণাম জানাতে। অনেকেই বেলুড়-মঠে এসে খোঁজ করতেন, ভরত মহারাজ কোথায় থাকেন ?

ভরতমহারাজ : জীবনপঞ্জী

জন্ম : ১৮৮৯ সাল। ঢাকা জেলার মাঝখারা গ্রামে জন্ম।
বেলুড়মঠে আগমণ : ১৯০৯ সাল
সারদা মায়ের কাছে দীক্ষা : ১৯১২ সাল
সন্ন্যাস গ্রহণ : ১৯২০ সাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে)
কর্মস্থান : প্রথম পাঁচ বছর বেলুড় মঠ।
পরবর্তী ১৬ বছর হিমালয়ের মায়াবতীতে তারপর ১৯৩০ সাল থেকে বেলুড়মঠে ম্যানেজার পদে।
বেলুড়মঠে কর্মসমিতির সদস্য : ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪০ সাল এবং ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল।
মঠ ও মিশনের ট্রাস্টি ও পরিচালন পর্ষদের সদস্য : ১৯৪৭ সাল থেকে।
শতবর্ষের জীবনে প্রথম হাসপাতালে এলেন : ২ জুন, ১৯৮৯।

বক্ষবন্ধনী রিয়া'র নেপথ্য কথা

ত্রিপুরার রাজা ত্রিলোচন দু'শ চল্লিশ জন রিয়াশিল্পী ত্রিপুরী-সুন্দরীকে বিবাহ করেছিলেন যে শিল্পের উৎকর্ষকল্পে তার আধুনিক প্রয়োজন এবং ধর্মীয় বিধান থাকা সত্ত্বেও তা কেন আজ বিলুপ্তির পথে?

বক্ষবন্ধনী রিয়া

বল্কল থেকে ব্রেসিয়ার—মাঝে রিয়া নামক বক্ষবন্ধনী। বল্কল থেকে ব্রেসিয়ার পর্যন্ত পৌঁছতে মানুষকে কয়েক সহস্র বছর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রাকৃতিক পীড়ন ও সহজাত লজ্জায় মানুষ একদিন নিরাবরণ দেহে আভরণ তুলেছিল। বল্কল থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল—বয়নের মধ্যে তা আরও এগিয়ে গেল।

এই নিবন্ধে পোশাকের বিবর্তনের ইতিহাস লেখার কোন প্রয়াস নেই। যুগে যুগে নারী তাদের উদ্গত ও উদ্ধত স্তনকে আবৃত করে তাদের বক্ষ সৌন্দর্য পুরুষের কাছে রহস্যময় করে রেখেছে। বিলুপ্ত প্রায় এমন একটি ত্রিপুরা উপজাতিদের বক্ষ আবরণীর কথা এই নিবন্ধে থাকছে।

আজকের দিনে মানুষের কল্পনায় তপোবনের ধারণা আছে কিন্তু বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই। আশ্রম—দুহিতা শকুন্তলার বক্ষবন্ধনী বল্কল নির্মিত অথবা সুতো দিয়ে বুনানো তা নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকতে পারে—কিন্তু কালিদাসের কাব্যের নায়িকার বক্ষাবরণের ধারা অনেক আদি ও উপজাতি-দের মধ্যে আজও প্রচলিত। যদিও নগর সভ্যতার অনুপ্রবেশ শকুন্তলার ধারাকে প্রায় বিলুপ্তির মুখোমুখি করেছে, তবুও ত্রিপুরার আরণ্যক পরিবেশে এখনও কিছু কিছু জীবন্ত শকুন্তলাকে দেখা যায়।

তপোবন নেই—কিন্তু গভীর বনে বাসিন্দা আছে। নগর সভ্যতা সেখানে পৌঁছলেও প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি। কন্ব মুনির আশ্রম হয়তো আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না—কিন্তু 'টং ঘর' আছে। সেই 'টং ঘর' দুহিতারা শকুন্তলার ধারা অনুসরণ করে আজও রিয়া বা বক্ষ বন্ধনীর ঘেরাটোপে তাদের অনুপম স্তন সৌন্দর্য আবৃত রাখে।

পরনে আজানুলম্বিত 'পাছড়া' (কোমর তাঁতে বুনানো এক ধরনের লুঙ্গি) আর হাতে নক্শা তোলা স্তন—বন্ধনী। ত্রিপুরার 'টং ঘর'—এর জীবন শুরু হয়েছে নব্য প্রস্তর যুগ থেকে। ঝুম চাষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে টং ঘরের কাব্য। বন পুড়িয়ে চাষ করে অনেক উপজাতি। শুধু ত্রিপুরায় নয়, এই ঝুম চাষ উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে এখনও ব্যাপক হারে চলছে।

টং ঘরে বসে ঝুম পাহারা দেয় উপজাতি নারী ও পুরুষ। তপোবনের মত হরিণের ছোটাছুটি না থাকলেও—মাঝে মাঝে দলছুট দু'একটা হরিণ টং ঘর দুহিতাদের পাশে ঘুরে বেড়ায়।

রিয়ার কথায় ফিরে আসা যাক। কোন কোন উপজাতি উচ্চারণ করে রিয়া, আবার কেউ কেউ বলে রিসা। পাছড়াকে কেউ কেউ বলে রেগনাই। যে নামেই হোক, রিয়া বা রিসা, পাছড়া অথবা রেগনাই ত্রিপুরার উপজাতিদের একটি অনবদ্য বয়ন শিল্প।

ত্রিপুরার এই রিয়া সংস্কৃতি আজ এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। ব্লাউজ আর ব্রেসিয়ার রিয়ার স্থান ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে। নগর সভ্যতার এই দুটি অবদান, কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন রিয়া আর পাছড়া সংস্কৃতিকে মৃতবৎ করে তুলেছে। শহর বা শহরের উপকণ্ঠে যেসব উপজাতি বসবাস করে, রিয়া আর পাছড়া তাদের কাছে প্রায় অপরিচিত হয়ে উঠেছে। আধুনিক কাঁচুলি, এমন কি সালোয়ার—কামিজেরও প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য কোন কোন রক্ষণশীল পরিবার উপজাতি বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে, ব্লাউজের উপর নকশা তোলা রিয়া বা বক্ষ বন্ধনীর চলন বজায় রেখেছে।

উপজাতিদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী প্রতিটি নারীকে রিয়া ও পাছড়া বুননের কাজ জানতেই হবে। উপজাতি সমাজে এখনো অনেকে মনে করে, যে রমণী রিয়া বা পাছড়া বুনতে না জানে—সংসারে সেই নারী অচল।

শুধু সাধারণ উপজাতিদের মধ্যেই স্ব—হস্তে রিয়া ও পাছড়া তৈরির রীতি সীমাবদ্ধ ছিল না—রাজপরিবারেও এই রীতি সমান ভাবে প্রচলিত ছিল। রাজপরিবারের প্রত্যেক ঈশ্বরী বা রানী, উপরানী ও রাজকুমারীদের রিয়া তৈরি আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক ছিল।

রিয়া শুধু দীর্ঘদিনের প্রচলিত বক্ষাবরণী নয়, রাজানুকুল্যে তাকে শিল্প সুষমায় অনুপম করে তোলার এক তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল। যে রিয়ার উপর যত বেশি দৃষ্টি মধুর নতুন রকমের নকশা তৈরি করতে পারতো তাকে শুধু রাজানুগ্রহই প্রদর্শন করা হতো না—সমাজ থেকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হত।

এই পুরস্কার ও সম্মানের ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল ত্রিপুরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ত্রিলোচনের আমল থেকে। চন্দ্রবংশীয় ত্রিলোচন প্রায় তিন হাজার বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিন তারিখ সঠিক ভাবে জানা না গেলেও—এ কথা অনস্বীকার্য যে ভারতের তদানীন্তন রাজন্যবর্গের মধ্যে ত্রিপুরা অবশ্যই প্রাচীনত্বের দাবি রাখে।

রাজা ত্রিলোচন রিয়াকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে শিল্পী সত্তা ও সৃজনী শক্তিকে উৎসাহিত করেছিলেন। তিন হাজার বছর পূর্বে এই শিল্পকে উন্নত করার জন্য তিনি এক অকল্পনীয় পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। আজকের দিনে শিল্প ও শিল্পীকে পুরস্কৃত করার আধুনিক ব্যবস্থা আছে। মানপত্র ও টাকার অংকে পুরস্কারের মাপকাঠি নির্ণীত হয়। কিন্তু রাজা ত্রিলোচন এক অভিনব পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। যে রমণী রিয়ার সৌন্দর্য সৃষ্টিতে অভিনবত্ব দেখাতে পারবে, তিনি তাকে বিবাহ করে রানীর মর্যাদা দেবেন। এই অভাবনীয় পুরস্কার ঘোষণার ফলে, ত্রিপুরার সুন্দরীদের মধ্যে নক্শার নতুনত্ব আনার

নৃত্যরতা আদিবাসী তরুণীদের পরনে রিয়া

প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। উৎকৃষ্ট নমুনার জন্য তিনি দু'শ চল্লিশটি ত্রিপুরা সুন্দরীকে বিবাহ করে দু'শ চল্লিশ রকমের রিয়ার নক্শার প্রচলন করেছিলেন। এই কিংবদন্তী আজও ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে জীবন্ত। ত্রিপুরার কোন রমণী রিয়ার গায়ে এমন একটি রমণীয় নক্শা তৈরি করেছিল—যা মানুষের দৃষ্টিভ্রমের সৃষ্টি করেছিল। সূর্য রশ্মিতে মাছির পাখনার যে রঙ প্রতিফলিত হয়, রিয়ার গায়ে সেইরকম মাছির পাখনার নক্শা উঠিয়েছিল সে। তার দুর্ভাগ্য তবুও সে রাজা ত্রিলোচনের সহধর্মিনী হতে পারে নি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ত্রিপুরার রানীরা নিজেদের বক্ষ বেষ্টনী নিজেরাই বুনতেন। রাজমালায় রিয়ার উন্নতির জন্য রানীদের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ আছে।

'আচোঙ্গ নৃপতি স্বর্গী হইল যখন,/তার পুত্র খিচোঙ্গ রাজা হইল আপন।/ খিচোঙ্গমা নামে ছিল তাহার রমণী,/বিচিত্র বসন শিক্ষা নির্মায়ে আপনি। রাজ পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী রানীকে নিজের রিয়া স্বহস্তে বুনতে হত। রাজ পরিবার থেকে উঠে গেলেও ত্রিপুরার উপজাতিদের একাংশ এখনও এই নিয়ম মেনে চলে।

ত্রিপুরার রাজবংশে ধর্মীয় আচারের সঙ্গে রিয়ার ব্যবহার যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। রাজ পরিবারে যে ধর্মীয় আচরণের শুরু হয়, তা স্বাভাবিক কারণেই সর্বজনীন হয়ে ওঠে। রিয়ার ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি।

নববর্ষে ত্রিপুরায় গড়াই বা গৌরীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আগের মত জাঁকজমক না থাকলেও ত্রিপুরার উপজাতিরা এই পূজা অত্যন্ত মর্যাদা ও সমারোহের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করে। রাজত্ব শেষ হলেও, ত্রিপুরার ঐতিহাসিক সিংহাসনের সামনে এই গড়াই পূজা হয়। পূজার অন্যান্য উপকরণের মধ্যে রানীর রিয়া আর রাজার দর্পণ থাকবেই। উপজাতি রমণীরাও তাদের নিজের তৈরি রিয়া গড়াই পূজার প্রধান উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে। রানীর বক্ষবন্ধনী দেবোপচারে ব্যবহারের এই রীতি অন্য কোথাও আছে কিনা জানা নেই।

শুধু গড়াই পূজা নয়, রাজ পরিবারে 'লাম প্রা' পূজার প্রচলন আছে। বিবাহ ও মহারাজার অন্যত্র যাবার সময় এই লাম–প্রা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরী ভাষায় এই পূজাকে 'বিনাইগর' বলা হয়। বিনাইগর মানে বিনায়ক গণেশ। এই পূজায় প্রধানা ঈশ্বরীর (রানীর) ব্যবহৃত রিয়া উপাচার হিসাবে দেওয়ার প্রথাও বর্তমান আছে। পুংখানুপুংখ ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, রিয়া বা বক্ষবন্ধনীর সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতিদের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উপজাতিদের মধ্যে নববধূকে স্বামী রিয়া দিয়েই বরণ করে। উপজাতিদের বিবাহে রিয়া একটি আবশ্যিক দ্রব্য।

উপজাতিরা প্রেমেও রিয়াকে স্থান দিয়েছে। রিয়ার উল্লেখ না করে কোন কিংবদন্তী ও কাব্যগাথা নেই বললেই চলে। টং ঘরে উপজাতি যুবক যুবতীদের মধ্যে যে প্রেমের জন্ম হয়, তার মধ্যে রিয়ার বিশেষ স্থান আছে। যে গানে

উপজাতিরা প্রেমেও রিয়াকে স্থান দিয়েছে। রিয়ার উল্লেখ না করে কোন কিংবদন্তী ও কাব্যগাথা নেই বললেই চলে।

রিয়া : ত্রিপুরার এই ঐতিহ্য ক্রমে শহরে প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে।

গানে ওরা ঝুম চাষ করে, সেই গানেও রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

রিয়া নিয়ে অনেক রসিকতার কথাও শোনা যায়। বয়নরতা কোন উপজাতি যুবতীকে তার নির্বাচিত মনের মানুষ রসিকতা করে বলে, 'হে প্রাণ তোমার রিয়ার ফুলের বাহার আমার মাথার চিরাই মধ্যে বুনিয়া দাও না।'

রিয়ার সৌন্দর্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশ ও বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। বড় মাপের রিয়া পুরুষেরা পাগড়ি হিসাবে ব্যবহার করে। ত্রিপুরার কোন এক মন্ত্রীর মাথায় রিয়ার পাগড়ি দেখে লেডি ডাফরিন মুগ্ধ হয়েছিলেন। নক্শার নতুনত্বে ও বুনানির সৌকর্যে বিমুগ্ধ লেডি ডাফরিন ত্রিপুরার 'বড়-ঠাকুর' সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মনের কাছ থেকে একটি রিয়া সংগ্রহ করেছিলেন।

তদানীন্তন ত্রিপুরায় নিযুক্ত বৃটিশ রেসিডেন্ট রালফ্ লিক—এর রিপোর্টে রিয়ার উল্লেখ রয়েছে। দু'শতাধিক বছর পূর্বে লিখিত এই প্রতিবেদনে লিক তৎকালীন রানী জাহ্নবীদেবীর বিবরণ ছাড়াও তার নিজের বিদায় সম্বর্ধনার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর সত্তর বছর আগে প্রকাশিত 'রিয়া' নামক বই—এ এই রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন। 'মিঃ ম্যাকমিন বিলাত হইতে একখানা অতি পুরাতন ত্রিপুরার বিবরণযুক্ত কাগজ পান। সেই কাগজখানা মিঃ রালফ্ লিক (বৃটিশ রেসিডেন্ট অব ত্রিপুরা) এর রিপোর্ট। সেই সঙ্গে তদানীন্তন মহারানী জাহ্নবীদেবীর বিবরণ এবং তার সঙ্গে সেরিমোনিয়াল বিদায় সম্পর্কে রিপোর্ট ছিল। সেই চিঠিখানায় মহারানীর প্রদত্ত শিরোপা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া রিয়ার নাম করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন এই রিয়া রাজরানীগণ যাহাদিগকে সম্মান করিতে হয় তাহাদিগকে শিরোপা দিয়া থাকেন।' নিজের বক্ষবন্ধনী দিয়ে সম্মানীয়গণকে সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন দুর্লভ। এই দুর্লভ রীতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

লিক সাহেব ত্রিপুরার ঈশ্বরীদের এই মানসিকতার যথার্থ মূল্য দিয়েছিলেন। রিয়ার শিল্পকলা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। বারাণসীর কিংখাবের চেয়ে ত্রিপুরার রিয়ার শিল্প সৌকর্য ও নক্শা তাঁকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করেছিল। জরি দিয়ে তৈরি একটি রাজকীয় রিয়া বৃটিশ মিউজিয়ামে উপহার দিয়েছিলেন। মিউজিয়ামের কলা বিভাগে আজও সেই রিয়াটি সযত্নে

রক্ষিত হচ্ছে।

লর্ড কার্জনও রিয়ার শিল্পকলায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। খোঁজ নিয়েছিলেন কোথাকার রমণীগণ এমন রমণীয় ও নয়নাভিরাম শিল্প সৃষ্টি করেছে। ত্রিপুরার তদানীন্তন রাজা বীরচন্দ্র তাঁকে একটি রিয়া উপহার পাঠিয়েছিলেন।

রিয়া শিল্পকলার অবক্ষয় শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই। ত্রিপুরার জঙ্গল ভেঙে তখন আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটছে। ধীরে ধীরে বহিরাগতদের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হওয়ায় ব্রা–কাঁচুলি এবং সায়া ও সেমিজ ধীরে ধীরে রিয়া ও পাছড়ার স্থান দখল করতে থাকে। একমাত্র পূজা উপাচার ছাড়া রাজপরিবারে রিয়া এখন অচল।

হাতীর দাঁতের রেছাম্বি (মাকু) আর পাওয়া যায় না। হাতীর দাঁতের মাকু দিয়ে নাকি সবচেয়ে ভাল রিয়া প্রস্তুত করা সম্ভব। কারণ মহিম ঠাকুরের ভাষায় 'রেশমের উপর কার্য করিতে হইলে হাতীর দাঁতের রেছাম্বি সহজেই সুতা টানায় সাহায্য করে, যাহা বাঁশ বা কাঠের রেছাম্বিতে হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।'

রাজকীয় রিয়া তৈরির জন্য ত্রিপুরার ঈশ্বরীদের প্রত্যেকেরই হাতীর দাঁতের রেছাম্বি ছিল। এখনও হয়ত রাজ পরিবারের বয়স্ক মহিলাদের কাছে খুঁজলে দু' একটা হাতীর দাঁতের রেছাম্বি পাওয়া যেতে পারে।

সবজনীন রিয়া বাঁশ বা কাঠের রেছাম্বি দিয়েই তৈরি হয়। রিয়ার উপর হাতে বিভিন্ন ধরনের নক্‌শা তোলার প্রাচীন আদর্শ বেশ কিছু উপজাতি পরিবারের মধ্যে প্রচলিত আছে। উপজাতিরা বাঁশের ফ্রেমে একবার রিয়ার যে নকশা তলে রাখে বংশ পরম্পরায় তা হস্তান্তরিত হয়।

উইভার সার্ভিস সেন্টার অরণ্যবাসী উপজাতিদের কাছ থেকে এ রকম কিছু নক্‌শা সংগ্রহ করেছে।

বর্তমানে এক শ্রেণীর উপজাতিদের মধ্যে ধারণা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে যে, ওয়ানছা বা বহিরাগতদের ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশ ও স্থায়ী ভাবে বসবাসের ফলেই তাদের স্বকীয় সংস্কৃতি ও শিল্প বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাচ্ছে এবং একটা সংকর সংস্কৃতির জন্ম হচ্ছে। যদিও অপর একশ্রেণী উপজাতি মনে করে ওয়ানছাদের সংমিশ্রণে একটি মিলনাত্মক সংস্কৃতি ও শিল্প গড়ে উঠছে-কিন্তু কট্টর উপজাতিদের মতে এই অবস্থা উপজাতি সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

শুধু হাতীর দাঁতের রেছাম্বির অভাব ও ওয়ানছাদের অনুপ্রবেশই নয়-কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের অনটন বর্তমানে রিয়া তৈরির অন্যতম অন্তরায়।

প্রাকৃতিক সবজির রং বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও বিশেষ কয়েকটি লতা গুল্ম ও গাছের ছালের সাহায্যে রিয়ার রং তৈরি করা হত। বনজ সম্পদের ওপর মানুষের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের ফলে সেই সব লতা ও গুল্ম বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

'আগু' নামীয় এক রকম গাছের শিকড় দিয়ে একটি স্থায়ী রং উপজাতিরা তৈরি করত। কিন্তু সেই মরিণ্ডা সাইট্রিকোলিয়া বা 'আগু' গাছটি ত্রিপুরার মাটি থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ত্রিপুরার ঝুমিয়ারা হাল্কা একরকম ব্রাউন রংয়ের তুলোর চাষ করতো। সে তুলোও এখন সম্পূর্ণ অমিল। প্রায় সাত দশক আগেই কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, নগর সভ্যতার প্রাধান্যে পাহাড়ের এই রমণীয় শিল্প একদিন হারিয়ে যাবে!

কেন্দ্রিয় সরকারের তন্তবায় সেবাকেন্দ্র হারিয়ে যাওয়া রিয়া ও পাছড়ার শিল্পকলা পুনরুদ্ধারের একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ত্রিপুরার শহর ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে বংশ পরম্পরায় রক্ষিত রিয়া ও পাছড়ার নমুনা সংগ্রহ করছেন। উদ্দেশ্য এই অনুপম শিল্পকলার দৃষ্টি মধুর নক্‌শাকে পাড় হিসাবে ব্যবহার করে শাড়ি ও শালে নতুনত্ব আনার চেষ্টা। সম্প্রতি তারা রাজকীয় একটি রিয়ার নক্‌শা শাল–শাড়ির পাড়ে সাফল্যের সঙ্গে উৎকীর্ণ করতে পেরেছেন। রাজকীয় রিয়ার নকশা–লাঞ্ছিত প্রথম শালটি গত বছর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে উপহার দেওয়া হয়েছে।

গোপাল কৃষ্ণ রায়

আমলা নির্ভর প্রশাসন এবং রাজনৈতিক চাপ

শ্রীমতী গান্ধীর শাসনকালের সময়ের কথা। ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কারেন্ট' তাদের কলমে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করল, অমুক উচ্চপদে অমুক ব্যক্তির নিয়োগের পেছনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর জনৈক নিকট সহকারীর হাত আছে। প্রধানমন্ত্রী নাকি সে খবর পড়ে ক্রুদ্ধ হয়ে জানতে চান, খবরটা প্রচার হল কিভাবে? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক সহকারী সচিবের নাম তাতে উল্লিখিত হয়, তিনি নাকি কথায় কথায় জনৈক সাংবাদিক বন্ধুকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই কর্মচারীকে তার নিজের রাজ্য উত্তরপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। জরুরী অবস্থার সময় ছিল সেটা, সঞ্জয় গান্ধীর উথ্থানের সময়। পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে নেতারা সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সবাইকেই সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন এবং সামান্য ভুলত্রুটি দেখা দিলেই নিয়মকানুনের দোহাই দিয়ে সেইসব সরকারী আমলাদের শাস্তি দেওয়া হত নানাভাবে।

আজো, সরকারী আমলা এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেকার সন্দেহটুকু রয়েই গেছে। আমলাদেরকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করবার সিদ্ধান্ত কাগজে কলমেই থেকে গেছে। আমলারাও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে নিজেদের চেয়ারের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে ভুলে যাচ্ছেন প্রায়ই।

সাম্প্রতিক একটা ঘটনা উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক। অর্থসচিব এস ভেংকটরমন সহসচিব ভুরেলালকে লিখিত নির্দেশ দিলেন, কিছু বিশিষ্ট নেতার বিদেশী সম্পদের তদন্ত সম্পর্কিত খবরাখবর ডঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামীকে

৯৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

গোবিন্দ নারায়ণ

উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের ওপর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চাপ প্রশাসনে শিথিলতার সৃষ্টি করে। সরকারী আমলারা কি নেতাদের সবরকম নির্দেশ পালন করে চলতে বাধ্য থাকবেন? চেয়ারের মর্যাদা তাহলে রইল কতটুকু?

বিলিং–এ
গ্লাইডার চালকেরা

ভারতে হ্যাং-গ্লাইডিং

আকাশে ওড়ার দুঃসাহসিক খেলা হ্যাংগ্লাইডিং। প্রতি মুহূর্তেই জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা। তবুও দিন দিন এই খেলায় উৎসাহিত হচ্ছে মানুষ। পাখির মতো উড়তে চাইছে আকাশে। হ্যাংগ্লাইডিং–এর ইতিহাস আজকের নয়। তবে ভারতে এসেছে এই তো সেদিন। ইতিমধ্যেই চর্চা আর পরিশ্রমের ফসল ফলেছে। সেই সব চর্চা আর পরিশ্রমের অজানা কাহিনী নিয়ে এই প্রতিবেদন।
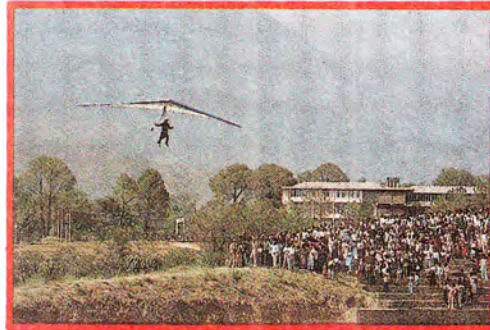
অবতরন

আকাশের উন্মুক্ত
প্রাঙ্গণে হ্যাং–গ্লাইডার

৮০ পৃষ্ঠায় দেখুন

ওড়িয়া ফিল্ম : সংকটের আবর্তে

মৃণাল সেনের মত দেশবন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক একসময় ওড়িয়ায় ছবি করেছেন। কিন্তু আজ ওড়িয়া চলচ্চিত্র জগতের অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয় মোটেই। ওড়িয়া ফিল্মের ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রয়োজনে এবং বর্তমানের বিশ্লেষণে এরই পর্যালোচনা।

রাজু মিশ্র নির্দেশিত 'চকা আঁখি সবু দেখুচিতে উত্তম মহান্তি, গোপা বিশ্বাস এবং সুজাতা আনন্দ

ওড়িয়া ফিল্মের উন্নতিতে সরকারি উদ্যোগ : ভুবনেশ্বরে

রেডি ফর টেক...লাইটস ! কাট... লাইটস অফ !' নির্দেশক রাজু মিশ্রর ব্যস্ত গলা শোনা যাচ্ছিল। এভাবেই চলছিল ওড়িয়া ফিল্ম 'চকা আঁখি সবু দেখুচি'র স্যুটিং এর শেষ দৃশ্য। রাজু মিশ্রের গলা পুনরায় শোনা গেল–'ওকে, লাইটস।' ক্যামেরার সামনে তখন চিত্রাভিনেত্রী সুজাতা আনন্দ। মনে হচ্ছিল--এ যেন ১৯৬৮–র 'মাটি কো মনীষা' ফিল্মের স্যুটিং স্পট থেকে ভেসে আসছে নির্দেশক মৃণাল সেনের গলা–– 'সাইলেন্স...সাউণ্ড... ক্যামেরা...।' 'মাটি কো মনীষা' মৃণাল সেনের প্রথম ওড়িয়া ফিল্ম। এই সুজাতা আনন্দই নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তাতে। নায়কের ভূমিকায় প্রশান্ত নন্দ। ওই প্রশান্ত নন্দ যাকে আজকাল বম্বে মার্কা ওড়িয়া ফিল্মের করিতকর্মা প্রডিউসার এবং নির্দেশক বলা হয়। কারণ তাঁর 'লালপান বিবি', 'জগা বরিয়া' এবং 'স্বপ্ন সাগর' ওড়িয়া ফিল্মের বক্স অফিস কাঁপিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ওড়িয়া ফিল্মে এমন বোম্বাই মার্কা ধুম-ধাম যে অনেকেরই অপছন্দের তা সত্য। এ ব্যাপারে সুজাতা নিজেই প্রশান্ত নন্দকে ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন–– 'ওড়িয়ার জীবন সংস্কৃতি বাদ দিয়ে এমন বোম্বে মার্কা ভায়লেন্স আমাদের ওড়িয়া দর্শকদের কোথায় নিয়ে যাবে? মৃণালদার 'মাটি কো মনীষা'য় তোমার সেই অভাবনীয় অভিনয় আজ কোথায় গেল।' এর জবাব প্রশান্ত হেসে উড়িয়ে দিলেও সুজাতার আজও সেদিনের কথা মনে হয়। সেবার বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'মাটি কো মনীষা' দেখে লোকেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বলেছিলেন–সত্যি এত ভাল ওড়িয়া ফিল্ম হতে পারে? মৃণাল সেনের সেই ছিল প্রথম ও শেষ ওড়িয়া ফিল্ম।

১৯৭০–এর পর ওড়িয়া ফিল্মে বোম্বাই এর জোয়ার উঠলে ওড়িয়ার নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবন বড় পর্দা থেকে দ্রুত মুছে যেতে থাকে। সেই সব ক্ল্যাসিক ঘরানার নির্দেশকরাও পিছিয়ে পড়েন। মৃণাল সেন পরে অবশ্য ওড়িয়া ফিল্ম নিয়ে নতুন কিছু করার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু তখন ওড়িয়া ফিল্মের হাওয়া অন্য দিকে। তাই আর এগোতে চান নি। ফলে কলকাতা ও মাদ্রাজের নির্দেশকদের হাত থেকে ওড়িয়া ফিল্ম ছিটকে পড়ায় ওড়িয়া ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে তাঁর নিজস্ব ভাবধারারও মৃত্যু ঘটে। মাদ্রাজের প্রখ্যাত নির্দেশক সি.এস. রাও এবং এস.ডি. রাও। ক্রান্তিকুমার এক সময় ওড়িয়া ফিল্মের সফল নির্দেশক ছিলেন। এসব সেই ৭০–এর আগের কথা।

সেজন্যই আজ ওড়িয়া ফিল্মের সেই দক্ষ ও প্রতিভাবান নির্দেশক নিতাই পালিতের কথা কে আর মনে করে। বাঙালি হয়েও নিতাই দক্ষতার সঙ্গে ওড়িয়ায় বেশ কয়েকটি ক্ল্যাসিক ফিল্ম উপহার দিয়েছিলেন। এই নিতাই পালিতই ওড়িয়ায় প্রথম নির্দেশক যিনি 'মলাজনহ'–র জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পান। আর বর্তমান বম্বে মার্কা ওড়িয়া ফিল্মের গরম হাওয়ায় সেই নিতাই এখন ইতিহাস মাত্র। তিনি

সরকার এবং এল বি প্রসাদ স্থাপিত কলিঙ্গ স্টুডিও
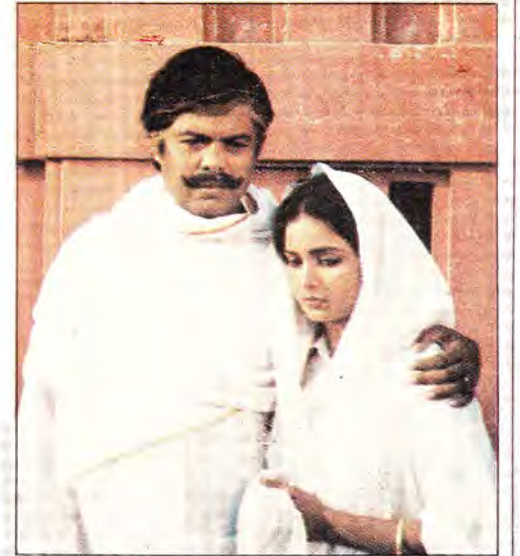
শান্তি ছবিতে বিজয় মহান্তি এবং অপরাজিতা মহান্তি

শুধু একাই নন, তরুণ নির্দেশক প্রণব দাস এবং গোবিন্দ তেজের অবস্থাও একই। এই দৈন্য অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য 'কেয়েজিতে কেয়েহারে' নামে একটি ব্যবসায়িক ফিল্ম তৈরি করেন নিতাই। কিন্তু সুবিধা করতে পারেন নি। আসলে জনসাধারণের কাছে তাঁর ক্ল্যাসিক ঘরানা–র ইমেজটা কাটিয়ে তুলতে তিনি অসফল হন। সম্প্রতি দীর্ঘ নীরবতার পর তিনি 'রঘু অরক্ষিত' নামে একটি ফিল্ম প্রস্তুত করেন। এখনও অবশ্য সেটি রিলিজ হয় নি। ফিল্মটি ওড়িয়ার এক প্রসিদ্ধ লোককথার প্রেক্ষাপটে তৈরি।

সুজাতা আনন্দের কথায়, 'কারিগরি দিক থেকে ওড়িয়া ফিল্মের কিছু বিকাশ ঘটলেও ওড়িয়া ফিল্ম দিন দিন তার স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে। নাচ, গান,

৫৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

লালবাজার

অপারেশন সিদ্ধার্থ

বিহারে ক্রমবর্দ্ধমান নকশাল আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষপর্যন্ত বিহার পুলিশ লালবাজার থেকে নকশাল দমনের একটি ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে গিয়েছেন। এই ব্লুপ্রিন্টকে তাঁরা 'অপারেশন সিদ্ধার্থ' নাম দিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করতে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমানে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল সিদ্ধার্থ শংকর রায় এক সময়ে এ রাজ্যে নকশাল দমনের বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর নামেই এই অপারেশন। অপারেশন সিদ্ধার্থ কর্মসূচীতে একদিকে পুলিশের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র তুলে দিয়ে গেরিলা কায়দায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, অন্যদিকে নকশাল আন্দোলন বিভিন্ন রাজ্যে কেন সফল হচ্ছে না, নকশালীরা কি ভাবে দেশ ও সমাজকে 'বিপথে' চালিত করছে তার পূর্ণাঙ্গ ক্লাস পুলিশদের করানো হবে। বিহারের বিভিন্ন নকশাল চিহ্নিত এলাকায় যে সব পুলিশ দায়িত্ব নেবেন তাঁদের বেতন ও পদোন্নতি হবে। সাহসিকতার জন্য মেডেল, মেরিট সার্টিফিকেট ও পুরস্কার দেওয়া হবে। যে সব পুলিশ অকালে মারা যাবেন, তাঁদের পরিবারের দায়িত্ব নেবেন সরকার। অপারেশন সিদ্ধার্থ নামে এমন সব বিশদ কর্মসূচী নিয়েছেন বিহার সরকার।

চন্দন নিয়োগী।

হাইকোর্ট

মন্ত্রীর মুচলেকা

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ সম্প্রতি তাঁর এক অন্যায় কাজের জন্য মুচলেকা লিখে এক অনন্যসাধারণ নজির সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কোন মন্ত্রী এর আগে কোনদিন মুচলেকা দেন নি। মন্ত্রী অবশ্য মুচলেকাটি এফিডেফিট হিসাবে হাইকোর্টে পাঠিয়েছেন। এই অদ্ভুত কান্ড কেন ঘটল তা জানতে প্রায় বছর আড়াই পেছনে ফিরে যেতে হবে। ১৯৮৬ সালের ১২ ডিসেম্বর কোচবিহারে সীমান্ত শান্তি ও সুরক্ষা সমিতির প্রাদেশিক সংগঠক মনমোহন রায় অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ভাষণ দিচ্ছিলেন। কৃষিমন্ত্রী তখন ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ বক্তৃতা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে মনে করে মাইক বন্ধ করে দেন। প্রতিবাদে শ্রী রায় কলকাতা হাইকোর্টে ২২৬ ধারায় রিট পিটিশন দাখিল করেন। সম্প্রতি বিচারপতি শ্যামল সেনের এজলাসে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়। বিচারপতির নির্দেশে কৃষিমন্ত্রীর মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, বক্তৃতায় উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে মনে করে আমি এস.ডি.ও. কে মাইক বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার আমি বিরোধী। যাইহোক, মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ আমি মাথা পেতে নিয়েছি।

চন্দন নিয়োগী

মহাকরণ

মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম:

MR S K BASU RAY
MINISTER OF AGRICULTURE
GOVT OF WEST BENGAL
WRITERS BLDG
CALCUTTA
700001

বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে, সেটা হল মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। একথাটা কি লণ্ডনের প্রখ্যাত টাইম পত্রিকা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? তা না হলে যে টাইম সাপ্তাহিকের প্রচার সংখ্যা বিশ্বে সর্বাধিক (প্রায় ৫০ লক্ষ), এবং শতকরা ১০০ ভাগ নিশ্চিত না হয়ে যে পত্রিকা গোষ্ঠী একটি শব্দও লেখে না, তারা কেন এমন একটি কাঁচা কাজ করবে? সম্প্রতি টাইম এর পক্ষ থেকে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীর কাছে এক চিঠিতে তাদের গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধ এসেছে। অনুরোধ এসেছে অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছেও। মুস্কিলটা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রীর নাম লেখা হয়েছে এস.কে. বসু রায়। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রীর নাম কমল গুহ। এস.কে. বসু রায় নামে পশ্চিমবঙ্গে কোনদিনই কোন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন না। তাহলে 'টাইম' এই মারাত্মক ভুলটা কি করে করলো? কৃষিমন্ত্রী কমল গুহকে একথা বলা হলে, তিনি হাসলেন। এস.কে. বসু রায় নামে কোন ব্যক্তি হয়তো টাইমের অফিসে গিয়ে বলে এসেছে, তিনিই পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী। আর ওরা তা যাচাই না করে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রীর নাম, এস.কে. বসু রায় লিখে দিয়েছে। মন্ত্রী ব্যাপারটা হালকাভাবে নিলেও তাঁর দপ্তরের অফিসাররা গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন, এমন একটা ভুল টাইম পত্রিকা করলো কি করে!

চন্দন নিয়োগী

প্রেস ক্লাব

শত্রুকে রাজেশের চ্যালেঞ্জ

শত্রুকে রুখতে কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে হুমকি দিলেন পশ্চিমবঙ্গের এম. এল. এ. রাজেশ খৈতান। স্টার ডাস্টের জুন '৮৯ সংখ্যায় শত্রু বিবৃতি দিয়েছিলেন, 'আই অ্যাম নট এ মারওয়াড়ি অর বিজিনেস ম্যান উইথ এ টিপিক্যাল বেনিয়া অ্যাটি-চ্যুড। দে স্যালুট দি পার্টি ইন পাওয়ার। দে আর নট দি সন্স অব ইণ্ডিয়া।' প্রকাশিত বক্তব্যের বিরুদ্ধে খোলা চিঠি গেল শত্রুর নামে। রাজেশ তাঁর সাড়ে তিন পাতার চিঠিতে লিখেছেন—শত্রুর 'মারওয়াড়ি' 'বেনিয়া' এবং 'বিজনেস ম্যান' শব্দগুলি মানহানিকর। তাছাড়া 'মারওয়াড়ি' বললে আলাদা কম্যুনিটি বোঝায় তা ভারতের জাতীয় সংহতির মূলে আঘাত হানে না কি ? রাজেশ শত্রুকে হুমকি দিয়েছেন যদি তিনি সাত-দিনের মধ্যে রাজেশকে এই বক্তব্য প্রমাণ করে না দেন কিংবা স্টার ডাস্টে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে তার বিবৃতিটি তুলে না নেন তাহলে পরিস্থিতি আইনমুখী হবে। শত্রু যাদের সঙ্গে কাজ করছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে শত্রুর বিরুদ্ধে রাজেশ চিঠি লিখবেন, চিঠি পাঠাবেন কেন্দ্রিয় তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরেও—এমন কথাও রাজেশ উল্লেখ করেছেন দীর্ঘ চিঠিতে। শত্রু কি রাজেশের চালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন ?

গুরুপ্রসাদ মহান্তি

রাজভবন

জ্যোতি বসুর ইন্দিরা-তর্পণ

মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নেতা হিসেবে যে জ্যোতি বসু চিরকাল প্রায় প্রতিটি জনসভায় তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী তথা কংগ্রেস সভাপতি ইন্দিরা গান্ধীর সমস্ত কাজকর্মের আদ্যশ্রাদ্ধ করে বেড়াতেন—সেই জ্যোতি বসু জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে ইন্দিরা গান্ধীর তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করে শ্রদ্ধা তর্পণ করলেন। রাজীব গান্ধীর উপস্থিতিতে ওই অনুষ্ঠানে তিনি এই বলে স্মৃতিতর্পণ করলেন যে ইন্দিরা গান্ধী নিজের জোরে একজন ভাল জননেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। জ্যোতিবাবু ওই দিন আরও স্মরণ করলেন প্রয়াতা শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কত মধুর ছিল। হায়রে রাজনীতি, তুমি বোধহয় মানুষকে এভাবেই বদলে দাও! সেদিন জ্যোতি বসুর দলের কাছে যিনি ছিলেন থাবাধারী ডাকিনী—আজ তিনি নমস্যা। লক্ষ্য রাখা যাক, আগামীতে জ্যোতিবাবু আর কত কথা বদল করেন।

রমাপ্রসাদ ঘোষাল

স্কুল

মন্ত্রীর মেয়ের জন্য

আইন সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য এই প্রতিষ্ঠিত সত্যকে কি বেথুন স্কুলের মত প্রাচীন, অভিজাত ও সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অপর্ণা দত্ত অস্বীকার করতে চান ? তাহলে তিনি কেন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ভি. আই.পি. ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি বিভেদের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন ? এ প্রশ্ন ঐ স্কুলের ছাত্রীদের অভিভাবকদের তো বটেই, তার সাথে কিছু শিক্ষিকারও। কোন সরকারি স্কুল কলেজে অ্যাডমিশন টেস্ট ছাড়া ভর্তির উপায় না থাকলেও রাজ্যের ত্রাণ মন্ত্রী ছায়া বেরার মেয়েকে তিনি অ্যাডমিশন টেস্ট ছাড়াই অষ্টম শ্রেণীর 'বি' শাখায় ভর্তি করে নিয়েছেন। শ্রীবেরার মেয়েকে ভর্তির জন্য আনা হলে, বেথুন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্ন না তুলেই তাকে ভর্তি করে নেবার নির্দেশ দেন। অষ্টম শ্রেণীর 'বি' শাখায় সব আসন পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় জনৈক শিক্ষিকা আপত্তি জানালে তাঁকে তিরস্কার পর্যন্ত করা হয়। মন্ত্রীর মেয়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে তাকে অষ্টম শ্রেণীর 'বি' শাখাতেই ভর্তি করে নেওয়া হয়।

চন্দন নিয়োগী

ফিদেল কাস্ত্রোর মেয়ে মডেলিংয়ে!

বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে যেমন মানুষের চিরন্তন কৌতূহল, তেমনি কৌতূহল সেই সব ব্যক্তির পুত্রকন্যা সম্পর্কেও। তাঁরা কি করছেন, কেমন তাঁদের জীবনচর্চা –এইসব অজস্র জিজ্ঞাসার ভিড়। কিউবার বিখ্যাত নেতা তথা কমিউনিস্ট দুনিয়ার সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ফিদেল কাস্ত্রোর মেয়ের জীবনচর্চায় সনিষ্ঠ আলোকপাত।

ছবিটা এই রকম : কিউবার এক অন্ধকার জঙ্গল। তাঁবুর সামনে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে চে গুয়েভারা তাঁর সাম্প্রতিকতম পুস্তিকার জন্যে নোট লিখছেন। মহিলাদের শোবার জায়গা থেকে মধুর অবসাদে অবসন্ন ফিদেল কাস্ত্রোকে এলোমেলো পায়ে হেঁটে আসতে দেখে তিনি তাকালেন। অধিনায়ককে স্যালুট করে কাস্ত্রো জড়ানো গলায় কোনরকমে বললেন, 'কমরেড, রেভ্যুয়েলতা আর আমি শুধু একটু আলোচনা করছিলাম...'!

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই'! হাসলেন গুয়েভারা, তারপর তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন তাঁর ঘরে রেখে আসা মেয়ের কথা। পরক্ষণেই, বিপ্লবের পরে তাঁদের যে সন্তান আসবে তাদের সম্পর্কে আলোচনায় মেতে উঠলেন কাস্ত্রোর সঙ্গে। তাঁরা চেয়েছিলেন ছেলেই, যারা হবে ডাক্তার, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার...!

কিন্তু তাঁদের পরিকল্পিত পথে সবকিছু ঘটেনি। ১৯৫৬ সালে তাঁদের দুজনেই দুটি মেয়ে ছিল। হিল্ডা, গুয়েভারার প্রথমা পেরুভিয়ান স্ত্রীর মেয়ে এবং এলিনা, কাস্ত্রোর প্রাক্তন স্ত্রী এবং কমরেড ইন আর্মস, ন্যাতি রেভ্যুয়েলতার। এখন ইনি কিউবার সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী। মেয়েদুটি কঠিনভাবেই নিজেদের বাবাকে চিনেছে। কেননা ১৯৬৮ সালে গুয়েভারা গেরিলা জীবনেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান এবং ফিদেল কাস্ত্রো রেভ্যুয়েলতার মেয়েকে নিজের বলে অস্বীকার করেছেন। এলিনা, কাস্ত্রোকে শেষ দেখেছিলেন প্রায় দশ মাস আগে একটি অনুষ্ঠানে। এলিনা দর্শক হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নিজের বাবার সঙ্গে একত্রে একটা ছবি পর্যন্ত তাঁর কাছে নেই। তিনি বললেন, একজন মডেলের চেয়ে আমি যদি একজন ডাক্তার, নিদেনপক্ষে যদি একজন বক্সার হতে পারতাম তাহলেও বোধহয় ফিদেল তা বেশি পছন্দ করতেন।'

এলিনা বা হিল্ডা, কেউই কোনও বিশেষ সুযোগ পাননা। দুজনেই হতশ্রী হাভানার এক হাউসিং এস্টেট–এ থাকেন এবং কমিউনিস্ট দেশের প্রচলিত পন্থায় মাখন–দুধ ইত্যাদি কেনার জন্যে লাইনেও দাঁড়াতে হয় তাঁদের। এলিনা একজন মাঝারি গোছের মডেল। কিউবার সরকার পরিচালিত 'লা ম্যাজন' –এ চটকদার ফ্যাশন প্যারেডে সপ্তায় তিনদিন তিনি অংশগ্রহণ করেন। ফরাসি টেকনিক্যাল ম্যানুয়ালের অনুবাদ করেও কিছু আয় করেন। তিনি বৈপ্লবিক কাজকর্মের চেয়ে বেশির ভাগ সময়ই কাটান সস্তা সাজঘরে। বার বার প্রসাধন করেন। এদিকে তাঁর বাবা ফিদেল কিউবার সর্বাধিনায়ক শুধু তাই নয় বিশ্বের কমিউনিস্ট দুনিয়ার এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। চে গুয়েভারার মেয়ে হিল্ডা এখন একজন সরকারী কেরানী।

কিন্তু, এ গল্প প্রকৃতপক্ষে হিল্ডা গুয়েভারার নয়। তিনি বিবাহিতা এবং দুটি শিশুর মা। কাজকর্ম করেন এবং সমস্ত দেশপ্রেমিক কিউবানদের মতই দেশের জন্যে স্বেচ্ছাসেবী কাজকর্মও করেন। এই গল্প হল তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু এলিনা রেভ্যুয়েলতার। তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে এখন আর দেখাসাক্ষাতই হয়না।

এলিনা তাঁর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সংকোচ-বশত কোনও কথা বলতে চান না, কিছু বলতে চান না তাঁর দু'বার ডিভোর্স সম্পর্কেও । হাভানার ক্লান্তিকর একঘেয়েমি ছেড়ে প্রাণোচ্ছল প্যারিসে যাবার বাসনা তিনি লালন করেন । ডিপ্লোম্যাট মায়ের সঙ্গে প্যারিসে থাকার সময়ই তিনি স্বপ্ন দেখতেন, আন্তর্জাতিক মডেলিং জগতের একজন কভার গার্ল হয়ে ফিরে আসবেন প্যারিসে । এলিনা তাঁর বাবার সম্পর্কে বলতে গিয়ে কিন্তু কখনও বাবা বলে সম্বোধন করেননি, সম্বোধন করেছেন 'কমরেড' অথবা ফিদেল বলে ।

একজন কিউবানের কাছে মডেলিং করা কোন খারাপ কাজ নিশ্চয়ই নয় । কিউবানরা কমিউনিস্ট কিন্তু তাঁদের ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের মতই ফ্যাশনপ্রীতি প্রবল । এলিনা বললেন, 'ফ্যাশন একটা বিশেষ শ্রেণীর এক্তিয়ারের বলেই মনে করা হত একসময় । এখন সে ধারণা বদলেছে । বিপ্লবের তিরিশ বছর পরে দেশবাসীকে অনেক নতুন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে ।' এলিনা অবশ্য তেমন কোনও বিশেষ সুযোগ সুবিধাই পাননি বলে মনে হয় এখনও ।

টিম উইলিস

চে গুয়েভারার মেয়ে হিল্ডা

কাস্ত্রোর মেয়ে এলিনা

গার্ডেন হ্যাম্পেল আধুনিক সান্তাক্লজ!
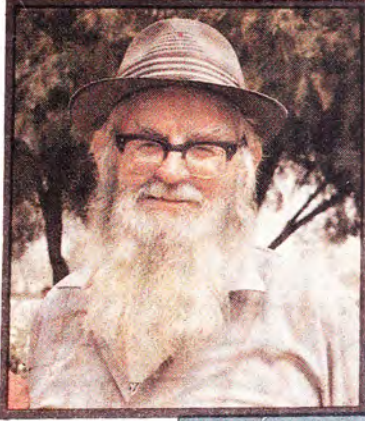
অস্ট্রেলিয়ার ফ্লিন্ডার্স রেঞ্জ–স্থিত বেল্টানার ড্যানেস্ক মিশন চার্চে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে একটি বিবাহ–সভা। পাত্র বব হোয়াইট, আর পাত্রীর নাম টেরি। প্রসিদ্ধ ভায়োলিন বাদক জেন পিটার্স–এর বাবা জেফ্রি পিটার্স বাজাচ্ছেন পাম্প–অর্গান। সমগ্র অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধানে রয়েছেন জেমস হ্যারিস।

যেহেতু ববের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আফগান ব্যবসায়ীদের ছিল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সম্পর্ক, তাই সকলেই ধরে নিয়েছিলেন বর–কনে আসবে উটের পিঠে চড়ে! বব বেচারা কখনো ওঠেনি উটের পিঠে, সে তো নার্ভাস বোধ করছিল খুব। কনে টেরি রসিকতা করে বলল, বব দেখো যেন পড়ে টড়ে যেও না, চারদিকে ক্যামেরা তাক করা কিন্তু। তোমার পড়ে যাওয়ার দৃশ্য ছবিতে দেখতে অবশ্য বেশ মজাই লাগবে।

কুড়িটা উটের সুসজ্জিত মিছিল এসে পৌঁছল ড্যানেস্ক মিশন চার্চে। কনে টেরি যখন তার উটের ওপর থেকে নিচে নামল, হঠাৎই লম্বা গলা নামিয়ে উটটি টেরিকে যেন সস্নেহে চুম্বন করল। এ দৃশ্য
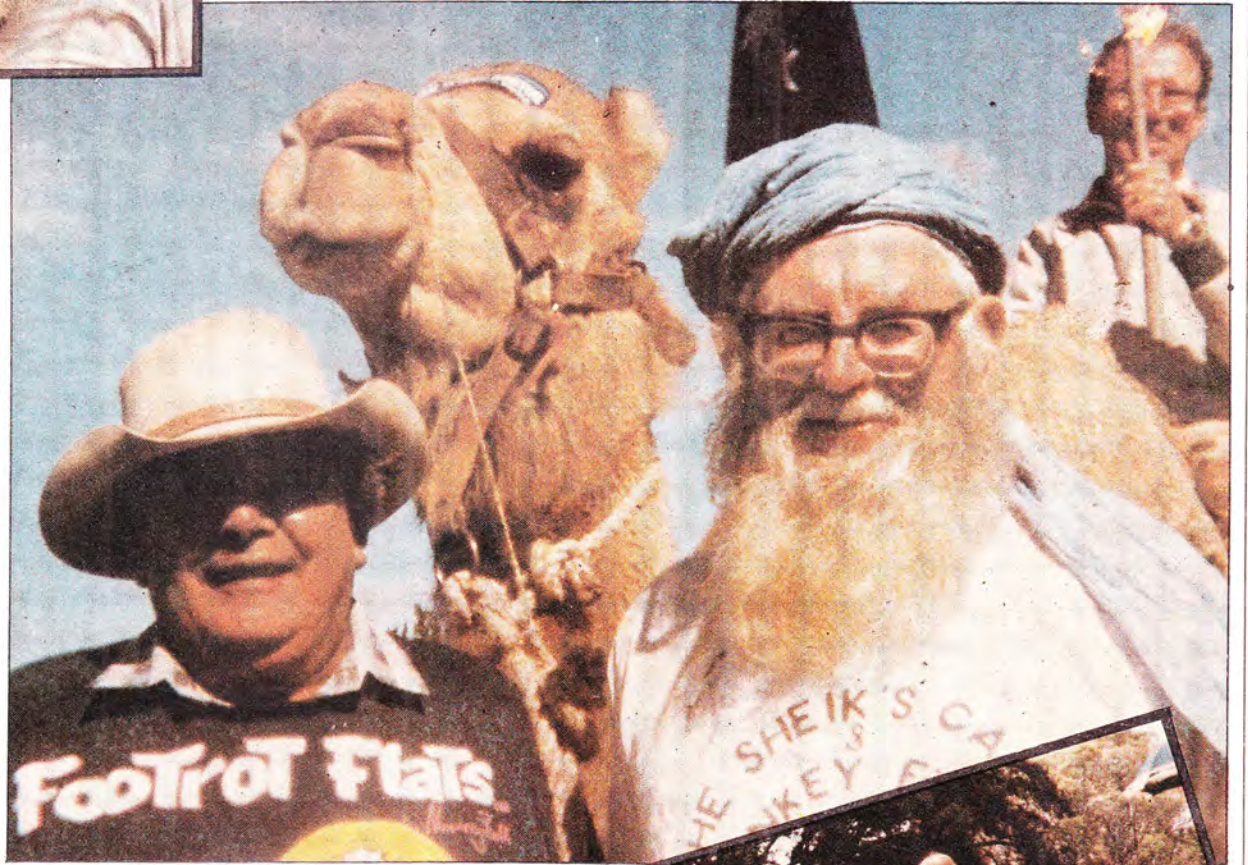
গার্ডেন হ্যাম্পেল : এক কাফেলার প্রস্তুতিতে

দরদী এক ব্যক্তিত্বের পরিচিতি, যিনি নিঃস্বার্থভাবে জীবনকে সমর্পণ করেছেন অনাথ–আতুর শিশুদের সেবায়। এরই সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর এক বিচিত্র অভ্যাস, উটপ্রীতি!

দেখে সকলে অবাক ! উটেরও এত বুদ্ধি !

উট কিন্তু বাস্তবিকই খুব বুদ্ধিমান প্রাণী । রিপ্লে–র 'বিলিভ ইট অর নট' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখও আছে । গার্ডেন হ্যাম্পেল–এর মতে, উট শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, ওরা খুবই বুদ্ধিমান । হ্যাম্পেল সাহেবের ফার্মে তিরিশটি উট আছে । এছাড়া সেখানে ৮০০টি ভেড়া, কুড়িটি গাধা, দুটি ঘোড়া এবং একটি মোষও রয়েছে । হ্যাম্পেল বলেছেন, 'আমার উটগুলো আমাকে খুবই ভালবাসে । ওরা আমার সঙ্গে খেলা করে, আমাকে চুমু খায়, দাড়ি নিয়ে আদরও করে ।'

গার্ডেন হ্যাম্পেল থাকেন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায়, তিনি ঐ তামাম অঞ্চলে 'শেখ ফ্রম অ্যারো ক্রীক' নামে সুপরিচিত । তাঁর পরনে থাকে শেখদের মত পোশাক, সুসজ্জিত উটের কাফেলা নিয়ে তিনি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার এক শহর থেকে অন্য শহর পরিক্রমা করে বেড়ান ।

গার্ডেন হ্যাম্পেলের আসল দেশ জার্মানি । বহুবছর পূর্বে হ্যাম্পেলের ঠাকুরদা হার্মান হ্যাম্পেল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার কাপুন্ডা অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন । পরবর্তীকালে তিনি সেখানে বিশাল জমির ওপর ফার্ম তৈরি করেন । গার্ডেন হ্যাম্পেলের ঠাকুরদা আঙুর চাষে নিযুক্ত থাকলেও তাঁর বাবা রিচার্ড ভেড়াপালনের দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন ।

অঞ্চলটা মরুভূমি অধ্যুষিত । হয় বালির পাহাড় আর নয়তো ঘন বন অথবা আঙুরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত । প্রাণী বলতে উট আর ভেড়া । একটা গ্রাম থেকে আরেকটা গ্রাম বহু দূরে, দুর্গমও । ১৯৮৭ সাল থেকেই এসব অঞ্চলে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে । গার্ডেন হ্যাম্পেলের ছোটবেলায় এসব সুবিধে ছিল না । তখন একজন মাস্টারমশাই একটা ক্লাসের মধ্যেই সব ছাত্রকে লেখাপড়া শেখাতেন ।

হ্যাম্পেল বারোবছর বয়স অবধি লেখাপড়া শিখে বাবাকে ফার্মের কাজকর্মে সাহায্য করতে শুরু করেন । পরবর্তীকালে তাঁর বিয়ে হয় লিণ্ডার সঙ্গে । ওঁদের আটটি ছেলেমেয়ে । গার্ডেন হ্যাম্পেলের যখন ২০ বছর বয়স, তিনি হঠাৎ উটের প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেন । তিনি ফার্মে নিয়ে এলেন বেশ কিছু উট ।

বিয়ের আঠারো বছর পর হ্যাম্পেল সাহেব ভাবলেন, অনাথ শিশুদের জন্য একটা কিছু করা দরকার । বেচারারা স্নেহমমতা তো পায়ই না, পেট ভরে খাবারও জোটে না তাদের । স্ত্রী লিণ্ডাও স্বামীর কাজে সাহায্য করতে রাজী । হ্যাম্পেল প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আটটি অনাথ শিশুকে তুলে আনলেন নিজের ঘরে । তাদেরকে একেবারে নিজেদের বাচ্চার মতই মানুষ করতে শুরু করলেন । তাঁদের তো আটটি ছেলেমেয়ে ছিলই, আরো আট–জন এসে পড়ায় ঘরে যেন মহাধূমধাম পড়ে গেল । এসব দেখে লিণ্ডা খব খুশি ।

এরপর গর্ডেন হ্যাম্পেল ঠিক করলেন, উটগুলির পিঠের ওপর চড়ে তিনি দূর দূরান্তের শহরে যাবেন । অনাথ শিশুদের জন্য অর্থসংগ্রহ করে সেই টাকা বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থা ও চিলড্রেনস হোমে দান করবেন । প্রথমবার ছ'টি উটকে ভাল করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের আর অনাথ সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বের হলেন অর্থসংগ্রহ অভিযানে । বেশ ভালরকম টাকাপয়সা সেবার যোগাড় হয়েছিল । হ্যাম্পেল খুব উৎসাহিত বোধ করলেন । আরো দূর দূরান্তে যাবার জন্য তিনি এবার ১৮টি উটের এক বিরাট কার্নিভাল বানালেন । এবং বিশাল সেই বর্ণাঢ্য কাফেলা, সঙ্গে প্রাণোচ্ছল ছেলেমেয়েগুলি আর বহু স্বেচ্ছাসেবক । অস্ট্রেলিয়ায় এধরণের ব্যাপার দেখে দলে দলে লোকজন গ্রাম-গঞ্জ থেকে ছুটে আসতে লাগল । যে যা পারল, সাহায্য করতে শুরু করল । এভাবে প্রথম বছরেই হ্যাম্পেল ৮,০০০ ডলার সংগ্রহ করলেন । বিভিন্ন সংস্থায় সে টাকা তিনি দানও করলেন ।

এবার বিভিন্ন খবরের কাগজে তাঁকে নিয়ে শুরু হল প্রচার । টি.ভি. তে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হল । এতে তাঁর সুবিধেই হল । সমস্ত লোক তাঁর সম্পর্কে জানতে পারল । আরো বেশি অর্থসাহায্য আসতে লাগল । বিশাল দল নিয়ে হ্যাম্পেল অতঃপর ব্রিসবেন, সিডনি, মেলবোর্ন, অ্যাডিলেড, পার্থ, হবার্ট–এসব দূরবর্তী শহর-গুলিতেও যেতে লাগলেন ।

অস্ট্রেলিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে গার্ডেন হ্যাম্পেল

ওয়াশিংটনের 'চিলড্রেনস রাইটস' সংস্থার ভারতস্থিত কো–অর্ডিনেটর মহেন্দ্রপাল সিংহ রনধাওয়া–র আমন্ত্রণে ১৯৮৪ সালে গার্ডেন হ্যাম্পেল ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ভরতপুর, আজমীর, আগ্রা, পুষ্কর প্রভৃতি স্থানে ঘুরে ঘুরে এখানকার উট সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। উট পালন, তার সমস্যা ও সমাধানের উপায়, উটেদের অসুখ বিসুখ, তাদেরকে কিভাবে ট্রেনিং দেওয়া যায়, এসব বিষয়ে জানবার প্রচন্ড আগ্রহ ছিল তাঁর।

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর হ্যাম্পেল দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন। সেবারও তিনি জয়পুর, আজমীর, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষের উট সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তৃতীয়বার তিনি ভারতবর্ষে এলেন এবছরেই, ১৯৮৯ সালের ৫ মার্চ। এবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী মার্গারেট ও তাঁর কন্যা শ্যারণ মালকান। শ্যারণ চেয়েছিলেন, কোন ভারতীয় যুবককে বিবাহ করতে। হ্যাম্পেল মহেন্দ্রপাল সিংহের মাধ্যমে শ্যারণের জন্য একটি ভারতীয় পাত্র ঠিক করে রেখেছিলেন। বিয়েটা হয়ে যাবার পর ১৪ মার্চ হ্যাম্পেল ফিরে গেলেন অস্ট্রেলিয়ায়।

যাইহোক, অস্ট্রেলিয়া–সরকার শেষপর্যন্ত হ্যাম্পেলকে অনাথ শিশুদের জন্য অর্থসংগ্রহ অভিযানের লাইসেন্স দিলেন। লাইসেন্স পাওয়াতে হ্যাম্পেলের খুব সুবিধা হল। তিনি এবার ব্যাঙ্কে সংগৃহীত টাকা পয়সা রাখবার জন্য অ্যাকাউন্ট খুলে নিলেন। সাহায্য হিসেবে অনেকে চেক পাঠাতেন। সেইসব চেক ভাঙাতে এবার খুব সুবিধা হল। দ্বিতীয় বছরে সংগৃহীত অর্থের পরিমান দাঁড়াল ১৫,০০০ ডলার। সম্পূর্ণ টাকাটা তিনি 'অ্যাডলেড চিলড্রেন্স হসপিটাল' এবং 'সোসাইটি ফর দি ক্রিপল চিলড্রেন্স', এই দুটি সংস্থাকে দান করে দিলেন। দান হিসেবে পাওয়া পয়সা থেকে একটি পয়সাও অবশ্য হ্যাম্পেল নিজের জন্য ব্যয় করতেন না।

উটের প্রতি হ্যাম্পেলের ভীষণ মমতা। তিনি বলেছেন, উট ছাড়া আমি বোধহয় বাঁচব না। উটগুলিই আমার জীবন। দশবছর বয়সেই আমি ঠিক করেছিলাম, উট পুষবো। সুদান থেকে আসা একটি সুন্দর কাফেলা দেখে সেই বয়সে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমিও একদিন এরকম কাফেলা নিয়ে ঘুরে বেড়াব। আমার সে স্বপ্নও আজ সফল হয়েছে।

হ্যাম্পেল বাদে অস্ট্রেলিয়ার আর দুই বিখ্যাত উট–প্রেমিক মানুষের নাম নোয়েল ফুলারটন এবং লফটি কেনার্ড। ফুলারটনের জন্ম পাহাড়ে। বড় হয়ে জীবিকার সন্ধানে তিনি সমতলে আসেন। পরবর্তীকালে এলিস স্প্রিং নামকস্থানে তিনি উটের ফার্ম তৈরি করেন। ফার্মটির দেখাশোনা করেন তাঁর স্ত্রী ইসাবেল। ভার্জিনিয়া ক্যামেল ফার্ম নামক উক্ত ফার্মটি দেখতে দেশ বিদেশের ট্যুরিস্ট ভীড় করেন প্রতিবছরই। সিলভারটনের

ভারতে হ্যাম্পেল, মার্গারেট আর মার্গারেটের মেয়ে শ্যারনের সঙ্গে

বাসিন্দা কেনার্ড তাঁর ডবঘুরে চরিত্রের জন্য পরিচিত। তাঁরও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে বহু উট।

১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ করাচি থেকে প্রথমে ৫০টি উট নিয়ে যান অস্ট্রেলিয়ায়। মরু অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায় যাতায়াতের ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশরা খুব অসুবিধে ভোগ করতেন। তাই তাঁদের উট খুব প্রয়োজন ছিল। প্রথম ৫০টি উট কিন্তু পরিবর্তিত আবহাওয়ায় বাঁচেনি। ব্রিটিশরা কিন্তু হতাশ হননি। ১৮৪৮ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রায় প্রঞ্চাশ হাজার উট তাঁরা অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যান। মারকানা থেকে উট কিনে করাচিতে আনা হত সেগুলোকে। সেখান থেকে মালবাহী জাহাজে পোর্ট আগাস্ট অবধি উটগুলো পৌঁছে যেত। এই উটেদের সাহায্যেই ইংরেজরা অস্ট্রেলিয়ায় রেলপথ ও সড়ক নির্মাণের জন্য ব্যাপক সার্ভে করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে, যখন রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হল, ইংরেজরা অধিকাংশ উট গুলি করে মেরে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সেসময় বহু উট এভাবে মারা যায়। উটের মালিকরা তখন ভয়ে তাঁদের উটগুলিকে দলে দলে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসেন। এজন্য আজো অস্ট্রেলিয়ায় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জংলি উট পাওয়া যায়।

গার্ডেন হ্যাম্পেলের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। সুসজ্জিত বিশাল উটের কাফেলা নিয়ে তিনি একেবারে সাত, আট, নয় সপ্তাহের মত বেরিয়ে পড়েন। এপর্যন্ত তিনি সংগ্রহ করেছেন প্রায় দু'লক্ষ ডলার। সমস্ত অর্থ তিনি বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থাকে দান করে দিয়েছেন। সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে 'অ্যাডিলেড চিলড্রেন্স হসপিটাল', 'সোসাইটি ফর দি ক্রিপল চিলড্রেন্স', 'রয়্যাল সোসাইটি ফর দি ব্লাইণ্ড', 'বুশ ফায়ার ভিকটিম হসপিটাল', 'রিটায়ার্ড রিক্রিয়েশন সেন্টার ফর দি ওল্ড' প্রমুখ। হ্যাম্পেল যে আটটি অনাথ বাচ্চাকে বড় করে তুলেছিলেন, তারা আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত।

হ্যাম্পেলের স্ত্রী লিণ্ডা নিজে একজন শিল্পী ও ডিজাইনার। চ্যারিটি শো'র জন্য স্বামীর পোশাক আশাক তিনি নিজে তৈরি করেন। নিজেদের ফার্মে মাঝে মাঝে হ্যাম্পেল ও লিণ্ডা শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে সেখানে টারিস্টদের আমন্ত্রণ জানান।

বহু হোটেলের মালিক সুসজ্জিত উটের কাফেলা-সহ হ্যাম্পেলকে হোটেলে আমন্ত্রণ জানান, এতে হোটেলের আবাসিকদের মনোরঞ্জনও ঘটে। কোন কোন হোটেলে হ্যাম্পেলকে স্যান্তাক্লজ সাজিয়ে উটের ওপর বসিয়ে এদিক ওদিক ঘোরানো হয়। এসবের মাধ্যমেও দানবাবদ বহু অর্থ তিনি পেয়ে থাকেন।

বাস্তবিকপক্ষে হ্যাম্পেল যেন এক আধুনিক এবং জীবন্ত সান্তাক্লজ তাঁর জীবন যেন অনাথ আতুর শিশুদের প্রতি সমর্পিত। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর নিজের পরিবার এবং সমস্ত অস্ট্রেলিয়াবাসী।

পুষ্কর পুষ্প

কলকাতা দূরদর্শন : দর্শকের ভীতি

রাজনীতি প্লাস গ্ল্যামার : ফল শূন্য !

কলকাতা দূরদর্শনের উপর তিতিবিরক্ত হয়ে পড়ছেন আগ্রহী দর্শকেরা। ধারাবাহিক থেকে শুরু করে ঘোষিকার উপস্থিতি পর্যন্ত তাঁদের পীড়িত করে তুলছে কেন তারই ধারাভাষ্য।

কলকাতা দূরদর্শনের সিরিয়াল : অথৈ জলে !

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত এবং শ্রী জোছন দস্তিদার পরিচালিত কলকাতা দূরদর্শনের মহাভারত 'সেই সময়' অতঃপর শেষ হয়েছে। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল কলকাতা কেন্দ্রের দর্শকদের। সেই কবে শুরু–যেন তার শেষ নেই। অবশ্য 'মহাকাব্য' বলে কথা, তাতে আবার দু দু'টি খণ্ড পর পর। শেষের দিকে অবশ্য 'সেই সময়ে'র পুরো খেল ছিল জোছনবাবুর হাতে। কারণ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেইসময় নিয়ে যা ভাবেন নি বা ভাবতে পারেন নি জোছনবাবু তাই করেছেন 'সেই সময়' নামক না–উপন্যাস, না-ইতিহাস বইটিকে নিয়ে। লেখক কখনও কি ভেবেছিলেন যে দিবাকরের মত গৌণ ভৃত্য চরিত্রকে এভাবে লাইম লাইটে আনা যাবে ? জোছনবাবুও হয়ত শুরুতে তা জানতেন না। কিন্তু নিজেই দিবাকর চরিত্রে অভিনয় করতে করতে ক্রমেই চরিত্রটিকে পর্দায় রেখে দেবার ব্যাপারে জেদি হয়ে পড়েন নিশ্চয়, নাহলে মহাভারতের মহাকালের মত এখানে দিবাকর কেন মাঝে মধ্যে জ্ঞানবাণী বিলোতে যাবে ! শেষ লগ্নে সেই দিবাকরই এক আলো বয়ে নিয়ে যায়–তখন আর কেউ নেই, মহাকালের এই ইতিহাস –খণ্ডের সাক্ষী হয়েই যেন বেঁচে আছে দিবাকর। জোছনবাবু নিশ্চয়ই অনেক কৃৎকৌশল জানেন কি ভাবে দূরদর্শনের কোন বাবু এবং বিবিকে সন্তুষ্ট করে বাড়িয়ে নিতে হয় সিরিয়াল এবং কিভাবে লেখকের লেখা উপন্যাসের ওপর ছুরি কাঁচি চালিয়ে বদলে নিতে হয় কাহিনী। ধন্যবাদ জোছনবাবুকে, তবু তো এত দিনে, প্রায় বছর খানেক বাদে, শেষ করেছেন তিনি–নাও তো করতে পারতেন ! কৌশল প্রয়োগ করে আরও বাড়িয়ে নিতে পারতেন 'সেই সময়'। তা তিনি করেন নি–জোছনবাবুর কাছে কলকাতা কেন্দ্রের দর্শকের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কলকাতা কেন্দ্রের দর্শকরা কৃতজ্ঞ আরও একজনের কাছে– তিনি হলেন অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'চৌধুরী ফার্মাসিউটিক্যালস' শেষ হয়েছে 'সেই সময়ের' ঠিক আগের সপ্তাহেই। সেক্ষেত্রে অবশ্য বাড়ান–কমান কাটা–ছাঁটা সবেরই একচেটিয়া হকদার ছিলেন অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়। কারণ 'কাহিনী টু কণ্ঠসঙ্গীত' সবই তাঁর। অগ্নিদেব ভেবেছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মত রাজনৈতিক নেতা আর মুনমুন সেনের মত সেক্স সিম্বলকে নিয়ে জুটি বানাতে পারলেই জমে যাবে সিরিয়াল। তা হল না। বরং দেখা গেল মাঝ পথে হাঁটু ভেঙে 'দ'। সুব্রত বা মুনমুন কারোর গ্ল্যামারই সিরিয়ালটাকে খাড়া করে রাখতে পারল না। বোঝা গেল পয়সা, স্পনসরশিপ এবং দূরদর্শনের আনুকুল্য এই তিনটি পেলেই সিরিয়াল বানান যায় নিশ্চিন্তে। তার শিল্পকলা, কুশলতার যা কিছু ঘাটতি, তার হ্যাপা বইবে দর্শক। এ ব্যাপারে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের কোন মাথাব্যথা নেই। যদি মাথাব্যথা থাকত তাহলে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়, অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনা 'লিও'-র

'সেই সময়' : জোছন দস্তিদারের পারিবারিক উদ্যোগ ?

ছবি : শীতল দাস

খেলনা বন্দুকের গুলিতে ঘায়েল হওয়ার মত 'সিরিয়াস' দৃশ্য নিয়ে এ সিরিয়ালকে ছোট পর্দায় কিছুতেই দিত না দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ। একটা কথা, 'চৌধুরী ফারমাসিউটিক্যালস' দেখে বোঝা গেল আগুন–খেকো রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব হলেই মারামারি হুড়োহুড়ি করা যায় না, অন্তত সুব্রত মুখোপাধ্যায় পুরোপুরি ব্যর্থ।

'গোরা' চলছে, কিন্তু সে বিষয়ে কোন মন্তব্য না করাই ভাল। আর কিই বা করার আছে, রবীন্দ্রনাথের জন্য কিছুটা শোক জ্ঞাপন ছাড়া? হায় বাংলা সাহিত্য, হায় বাংলা ভাষা, হায় বাংলা অভিনয়, হায় কলকাতা দূরদর্শন! শেষে রবীন্দ্র-নাথের বিশ্বমানবতার প্রতীক, ঋজু, সৌম্য, নবীন যুবক গোরাকে খুঁজতে হচ্ছে জোড়া থুতনির (একটা নিজস্ব অন্যটা চর্বির) মধ্যবয়স্ক জর্জ বেকারের মধ্যে!

এ যাবৎ যা আলোচিত হল সবই বড়দের অনুষ্ঠান। বড়দের অনু-ষ্ঠান নিয়েই দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের এই ছেলে–খেলা, তাহলে ছোটদের অনু-ষ্ঠান নিয়ে তাঁরা কি করেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। 'চিচিং ফাঁক' নামক ছোটদের সপ্তাহের প্রথম অনুষ্ঠানটি যে কোন পাড়ার 'ফাংশান'–এর চেয়েও নিকৃষ্ট মানের। কতকগুলো আনাড়ি, বেসুরো, ডেঁপো বাচ্চাকে ধরে বসিয়ে দেওয়া হয় গান গাওয়াতে। ক্যামেরা পাতা থাকে সরাসরি, নিস্পন্দ। এক-টাই সুবিধে, এ অনুষ্ঠানে কোন সংযোজন থাকে না। কিন্তু 'হরেকর-কম্বা' অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার দায়িত্ব থাকে এক কিশোরীর ওপর। তাঁর এঁচোড়ে পাকা কথাবার্তা শুনলে বড়রা নির্ঘাত চটে যাবেন আর ছোটরা লজ্জা পাবে। মধ্যবিত্ত পরি-বারে কোন কিশোরী এ রকম বেয়াদপি করলে ধমক খেত নিশ্চয়।

দ্বিতীয় চ্যানেলে হল বাচ্চাদের জন্য 'হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা।' অনুষ্ঠানসূচিতে বলা ছিল 'মিউজি-ক্যাল ফিচার' পরে বুঝলাম অকারণ অর্থহীন চড়া আবহ ব্যবহার করে দরকারি ভাষ্য এবং সংলাপকে চাপা দিয়ে দিতে পারলে তাকে 'মিউজি-ক্যাল ফিচার' বলে। গোটা অনুষ্ঠানে নানাভাবে পরিচালক দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত আটবার তাঁর পরিচিতি দিয়েছেন। এত কাণ্ড যিনি নিসঃসঙ্কোচে করতে পারেন তাঁর পরিচিতি তো নিশ্চয়ই জরুরি।

এই প্রথম একটি কমার্শিয়াল চালু হল দ্বিতীয় চ্যানেলে, 'রাশিয়ান সার্কাস'। সবার জন্যই রীতিমত উপভোগ্য হবে এ সিরিয়াল। তবে সার্কাসের জন্য ২৩ মিনিট বড়ই কম সময়।

দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমের ঘোষিকাদের সঙ্গে কোন তুলনা না করেও কলকাতা কেন্দ্রের কাছে সবি-নয় প্রশ্ন: আপনারা দ্বিতীয় চ্যানেলের জন্য নিত্য নূতন ঘোষিকা কোথা থেকে আমদানি করেন? হয় দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ, নয়ত ঘোষিকার জানা নেই যে দূরদর্শনের মত একটা জনপ্রিয় মাধ্যমে ঘোষণার কাজ করতে গেলে উচ্চারণ এবং স্বর প্রক্ষেপণ বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান এবং শিক্ষা থাকা দরকার। প্রথম চ্যানেলের চৈতালী দাশগুপ্তের স্প্রিং–এর পুতুলের মত অকারণে ঘাড়নাড়াটুকু বাদ দিলে চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় চ্যানেলের ঘোষিকারা যে কিভাবে কাজ পায়, কোন যোগ্যতার নিরিখে তা বোঝার সাধ্য কারও নেই।

এসব নিয়ে যে কোন অভিযোগে-রই উত্তর হয়ত পাওয়া যাবে দর্শকের দরবারে ঠিক মত চিঠি লিখতে পারলে, এবং আপনার লাক্ ফেবার করলে। কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে মুস্কিল আসান উত্তরদাতা স্বপনবাবুও কিঞ্চিৎ কাব্যানুশীলন করেন, কাব্য–পত্রের উত্তর তিনি কাব্য–ভাষাতেই দিতে ভালবাসেন। সবিনয়ে একটা নিবেদন আছে স্বপনবাবু, দয়া করে জিভের স্থূলতা এবং কণ্ঠের শ্লেষ্মাজনিত অবরোধ দূর করার চেষ্টা করুন, তাহলেই স্পষ্ট হবে উচ্চারণ। দর্শকের কিছুটা সুবিধেই হবে তাতে।

মিলন দত্ত

৪৭ পৃষ্ঠার পর

ফাইটিং—এর ওপর ভিত্তি করে যেমন করেই হোক ফিল্ম তৈরি হচ্ছে। প্রথম দিকে ওড়িয়া ফিল্ম ছিল উড়িষ্যার সংস্কৃতি ও জীবনের প্রতিনিধি। কিন্তু আজ তা কেবল পয়সা কামানোর ধান্দা ছাড়া আর কিছু নয়। যা উড়িষ্যার অন্যতম চিন্তার বিষয়, কেননা এই সব ফিল্ম কেবল উড়িষ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে সে তো সমাজকে বিকৃত করবেই।'

নিতাই পালিতের মত প্রণব দাসও ইদানিং ব্যবসায়িক ফিল্মে হাত দিচ্ছেন। অবশ্য আদিবাসী জীবন কাহিনীর ওপর প্রণবের 'হাকিমবাবু' ফ্লপ করে। এর নির্মাতা ছিলেন অমিয় পট্টনায়ক। হয়ত প্রণব দাসের সেই মোহ কেটেছে। কিন্তু অমিয় পট্টনায়ক পরবর্তীকালে বহু ব্যবসায়িক ফিল্ম তৈরি করলেও তাঁর কাছে প্রণব দাসের মত ট্যালেন্টের যে আর কোন জায়গা নেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৭৬—এ মনমোহন মহাপাত্রের 'শীতরাতি'র সংযুক্ত নির্দেশক হিসেবে ওড়িয়া ফিল্ম দুনিয়ায় প্রণব দাসের প্রথম আবির্ভাব। এর পরেই প্রণব একাই 'শেষ প্রতীক্ষা' তৈরি করেন। তারপর 'হাকিমবাবু'। ১৯৮৬ তে এটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায়। ১৯৮৭ তে দূরদর্শনেও দেখানো হয়। ফলে প্রণব দাসকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এখন তিনি 'হসা লহু ভরা দুনিয়া' নামে একটি ব্যবসায়িক ফিল্মের কাজ খুব দ্রুতগতিতে করে চলেছেন। এই ফিল্মটিতে তিনি উত্তম মহান্তি বিজয় মহান্তি এবং অপরাজিতা ছাড়াও ওড়িয়া ফিল্ম দুনিয়ার নতুন স্টারদের দিয়ে কাজ করিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই এর ওপর প্রণবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কারণ প্রণব ব্যবসায়িক ফিল্মের অনুপযোগী, এই ইমেজ দর্শকদের মন থেকে কাটিয়ে তোলার এ এক পরীক্ষা বলা যায়। 'কাবেরী' ফিল্মের জন্য নির্দেশক গোবিন্দ তেজ পুরস্কার পেয়েছিলেন। এতে অবশ্য তিনি কিছু প্রচলিত ফর্মুলার ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু ইদানিং কালে তার যতটা প্রয়োগ ততটা নয় নিশ্চয়ই। তিনি এখন পর্দার পেছনে।

বর্তমান ওড়িয়া ফিল্ম ভীষণ সংকটময় অবস্থায়। এর জন্য উড়িষ্যার ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির সকলেই চিন্তিত। অবশ্য একে শুধরে নেওয়া যায় বলেও অনেকের ধারণা। উড়িষ্যার সরকারও রাজ্যের ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি বিকাশের জন্য গত সাত—আট বছর ধরে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। ভারতের মধ্যে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে এমন সরকারি নজির কেবল উড়িষ্যাতেই। ১৯৮২ তে ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যা সরকার ফিল্ম নির্মাতা এল.বি. প্রসাদের সঙ্গে 'কলিঙ্গ স্টুডিও'—র স্থাপন করেছিলেন। অবশ্য দু'বছর আগে এল.বি. প্রসাদের সঙ্গে স্টুডিওর পার্টনারশিপ মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এখন তা পুরোপুরিই সরকারের। গত ৪ মাস আগে আবার এল.বি. প্রসাদের সঙ্গে সমঝোতা করে উড়িষ্যা সরকার কলিঙ্গ স্টুডিওতে ল্যাবরেটরির শিলান্যাস করেছেন। ওড়িয়া ফিল্ম কারিগরি কাজের জন্য

অভিনেত্রী সুজাতা আনন্দ

বর্তমান ওড়িয়া ফিল্ম ভীষণ সংকটময় অবস্থায়। এর জন্য উড়িষ্যার ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির সকলেই চিন্তিত। অবশ্য একে শুধরে নেওয়া যায় বলেও অনেকের ধারণা। উড়িষ্যার সরকারও রাজ্যের ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি বিকাশের জন্য গত সাত—আট বছর ধরে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন।

এখনও অনেকটা কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজের ওপর নির্ভর, কিন্তু কলিঙ্গ স্টুডিও ওড়িয়া ফিল্মের সেই পরনির্ভরতা কাটিয়ে তুলবে। নির্দেশক প্রণব দাস এই প্রতিবেদককে বলেন, 'ফিল্ম নির্মাণের ব্যাপারে রমেশ সিপ্পী এবং মৃণাল সেনও এখানকার কলিঙ্গ স্টুডিও—র দ্বারস্থ হন।' কলিঙ্গ স্টুডিওর ডিরেকটর প্রদ্যুম্ন কুমার মিশ্রও এ ব্যাপারে ছিলেন বেশ সচেষ্ট।

সরকার রাজ্যে 'জনতা সিনেমা হল' তৈরির জন্য ঋণও দিয়ে থাকেন! উড়িষ্যার সিনেমা ব্যবসাও বেশ অনুকূল দিকে এগোচ্ছে। বর্তমানে ওই রাজ্যে ছোট বড় মিলিয়ে আড়াইশ—রও বেশি সিনেমা হল রয়েছে।

১৯৩৩—এর প্রথম ওড়িয়া ফিল্ম 'সীতা বিবাহ'-র সমসাময়িকই প্রথম হিন্দি ফিল্ম 'আলম তারা'। 'সীতা বিবাহ' তৈরি করেছিলেন মোহন সুন্দর গোস্বামী। এরপর হিন্দি ছবির সংখ্যা যেভাবে বেড়েই গেছে, ওড়িয়া ছবির কিন্তু তা হয়নি। এই শিথিলতা চলে আসছিল প্রায় ১৯৭০ পর্যন্ত। কিন্তু এই শিথিলতা ওড়িয়া ফিল্মকে এক বিশিষ্টতা দিয়েছিল। এ সময়ের সব কটি ফিল্মই উড়িষ্যার নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। সত্তরের দশকে ব্যোমকেশ ত্রিপাঠির সঙ্গীতবহুল ছবি 'মমতা' হিট করে। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন প্রফুল্ল কর। 'মমতা' রঙিন ফিল্ম না হলেও মারপিট আর সঙ্গীতের দরুন ওড়িয়া ফিল্মের ধারাবাহিকতা বদলে বেশ
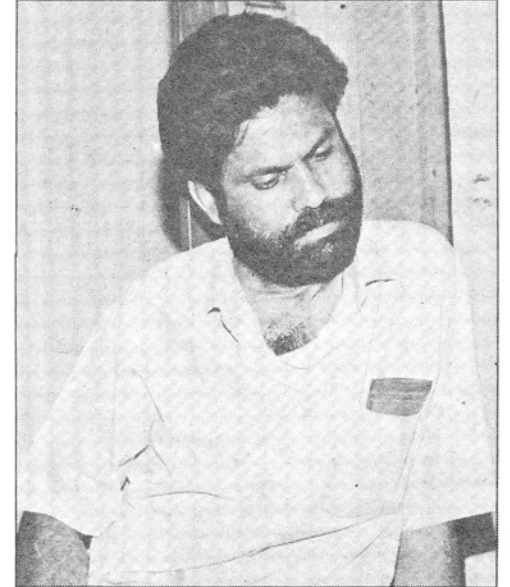
নির্দেশক প্রণব দাস

সাড়া জাগিয়ে তোলে। ওড়িয়া ফিল্মের নির্দেশকরা ভাবতে শুরু করলেন শুধুমাত্র সংস্কৃতি সংস্কারের মধ্যে বন্দী থেকে ওড়িয়া ফিল্মকে ব্যবসায়িকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তৈরি হয় সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ফর্মুলায় নির্দেশক নগেন রায়ের প্রথম রঙিন ছবি 'গপ হেলেবি সত্য'। ছবিটি হিট করে।

প্রশান্ত নন্দ এবং মহম্মদ মহসিনও আজ ব্যবসায়িক ওড়িয়া ফিল্ম নির্দেশকের লাগাম তুলে নিয়েছেন। মহম্মদ মহসিন 'মমতার ডোরি' 'জগা হাতরে পগহা' প্রভৃতি বেশ কয়েকটি হিট ফিল্ম তৈরি করতে পেরেছেন। তাঁর ওড়িয়া ও বাংলা যৌথভাবে তৈরি 'বিধির বিধান' রিলিজের মুখে। আজকাল অবশ্য একই ফিল্ম ডাবিং করে বাংলায়ও করা হচ্ছে। যাতে উড়িষ্যায় ফিল্মটি মার খেলে পশ্চিমবঙ্গেও কিছু ব্যবসা করার সুযোগ থাকে। ১৯৮৭ তে উদয়শঙ্কর পাণীর এমনি একটি

ফিল্ম, 'মিচ্ছ মায়া সংসার' বাংলায় 'সংসার' নামে ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিয়েছে। কারণ ফিল্মটি উড়িষ্যায় না চললেও 'সংসার' কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বেশ ভালই চলে। এই রকম 'বিধির বিধান' ছাড়াও 'সুনা চড়েই' ও বাংলায় 'জীবন সঙ্গী' হিসেবে মুক্তি পাবে। ওর শুটিং অবশ্য চলছে। নির্দেশক মারাঠি চলচ্চিত্রের পরিচালক রবি কিনাগী। দ্বিভাষী ফিল্ম বানাতে চলেছেন নির্দেশক প্রশান্ত নন্দও। ফিল্মটির নাম 'যা দেবী সর্ব ভূতেষু'।

অভিনেতা মিহির দাস বলছিলেন, 'আসলে ওড়িয়া ও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে কিছু সামঞ্জস্য থাকায় এমন দ্বিভাষী ফিল্ম চলে যাচ্ছে।' এর মধ্যে আরেকটি ব্যাপারও চলছিল। হিন্দি ফিল্মের নির্মাতা–নির্দেশকরা হিন্দি ফিল্মের ডাবিং করে উড়িষ্যায় তাঁদের ব্যবসা শুরু করেন। তারাচাঁদ বড়জাত্যা–র 'তকদীর' ডাব হয়ে উড়িষ্যায় 'ভাগ্য' নামে চলে। দেখাদেখি দক্ষিণী নির্মাতা–নির্দেশকরাও তামিল–তেলেগু ফিল্ম ওড়িয়ায় ডাবিং করে উড়িষ্যায় ব্যবসা করতে শুরু করেন। এতে আসল ওড়িয়া ফিল্মের ব্যবসা খুবই ক্ষতি হতে থাকে। এই সব ফিল্ম ওড়িয়া দর্শকদের রুচিকে বিকৃত করে তোলে।

নতুন অভিনেতা মিহির দাস

কৌতুক অভিনেত্রী সাধনা দাস

হিন্দি ফিল্মের মত ওড়িয়া ফিল্মেও 'মাল্টি স্টার' রীতি চালু হয়েছে। 'পঞ্চপাণ্ডব' ফিল্মে শ্রীরাম পণ্ডা, উত্তম মহান্তি, প্রশান্ত নন্দ, শ্রীকান্ত নন্দ, প্রমুখ ওড়িয়া হিরোদের ভিড় দেখা গেছে। যদিও ফিল্মটি বাজারে হিট করতে পারেনি। পার্শ্ব সঙ্গীতের ব্যাপারে ওড়িয়া ফিল্ম আজও আত্মনির্ভর নয়। বম্বের ওপর নির্ভর করতে হয়।

এদিক থেকে রাজু মিশ্র ওড়িয়া ফিল্মে হিট মশলা জোগান দেওয়ায় বেশ নাম করেন। তাঁর নির্দেশিত 'পুঅমোর করা ঠাকুর' প্রভৃতি ছবি বাজার গরম করে দেয়। রাজুর নির্দেশিত 'চকা আঁখি সবু দেখুচি'র নায়কের ভূমিকায় উত্তম মহান্তি, ভিলেনের ভূমিকায় বিজয় মহান্তি এবং নায়িকার ভূমিকায় মাদ্রাজের অভিনেত্রী শ্রীপ্রদা অভিনয় করছেন। এই ফিল্মটির সম্পর্কে রাজু খুবই আশা করে আছেন।

তেমন বড়মাপের অভিনেতা অভিনেত্রী যথেষ্ট না থাকায় ওড়িয়া ফিল্মে যথেষ্ট সমস্যাও রয়েছে। নায়কের ভূমিকায় কেবল উত্তম মহান্তি, শ্রী রাম পণ্ডা, অজিত দাস তথা বিজয় মহান্তি ছাড়া আর কেউ নেই। হালে মিহির দাস এবং মুন্না খাঁ নামে দুই নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে। নায়িকা নিয়ে তো আরও সমস্যা। মহাশ্বেতা, অপরাজিতা এবং তন্দ্রা এই তিনজনই নামকরা অভিনেত্রী। সম্প্রতি বৈশালী নামে নতুন নায়িকা কিছুটা সাড়া জাগিয়েছেন। ওড়িয়া ফিল্মের প্রখ্যাত অভিনেতা বিজয় মহান্তি এই প্রতিবেদককে বলছিলেন, 'অভিনেতার অভাবে ডেট নিয়ে খুবই সংকটে পড়তে হয়। একটি ফিল্ম তৈরি করতে এখানে তিন চার মাস লেগে যায়।' এক একটি ফিল্মের জন্য খরচ হয় ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা। 'পুঅমোর করা ঠাকুর'–এর বাজেট ছিল ১৬ লাখ টাকা। ওড়িয়া ফিল্মের সবচেয়ে বড় বাজেটের ফিল্ম 'চকা আঁখি সবু দেখুচি,' খরচ হচ্ছে ৩১ লাখ টাকা। তবে অভিনেতা অভিনেত্রীদের রেট এখানে খুব বেশি নয়। নায়ক নায়িকারা ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকায় এক একটি ফিল্মে অভিনয় করেন। ১৯৮৭–তে বিজয় মহান্তি নিজেই 'ভুলি হয়ে না' নির্দেশন করেছিলেন। এই ফিল্মটির নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রীরাম পণ্ডা, নায়িকার ভূমিকায় বম্বের রামেশ্বরী। ফিল্মটি কিন্তু মশলা ফিল্ম না হওয়ায় ফ্লপ করে। এর নির্মাতা ছিলেন উড়িষ্যার শিক্ষা মন্ত্রী যদুনাথ দাস মহাপাত্র। এই ফিল্মটির কাহিনীও যদুনাথবাবুর।

হিন্দি ফিল্মের মত ওড়িয়া ফিল্মেও 'মাল্টি স্টার' রীতি চালু হয়েছে। 'পঞ্চপাণ্ডব' ফিল্মে শ্রীরাম পণ্ডা, উত্তম মহান্তি, প্রশান্ত নন্দ, শ্রীকান্ত নন্দ, প্রমুখ ওড়িয়া হিরোদের ভিড় দেখা গেছে। যদিও ফিল্মটি বাজারে হিট করতে পারেনি। পার্শ্ব সঙ্গীতের ব্যাপারে ওড়িয়া ফিল্ম আজও আত্মনির্ভর নয়। বম্বের ওপর নির্ভর করতে হয়। উড়িষ্যার দক্ষ সঙ্গীত পরিচালক বলতে কেবল অক্ষয় মহান্তি। গায়কদের মধ্যে প্রণব পট্টনায়ক, শ্রীকান্ত দাস, বিভু, গীতা দাস ও তামী–র নাম করা যায়।

খল নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার মত দু'তিন জন মাত্র আছেন। যাঁদের প্রায় প্রত্যেকটি ফিল্মেই দেখা যায়। এঁরা হলেন নেত্রানন্দ মিশ্র ও অসিত পতি। কৌতুক অভিনেত্রী সাধনা দাস এই প্রতিবেদককে জানান, 'কৌতুক অভিনেতা অভিনেত্রীও খুবই কম। অভিনেত্রীদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ আছেন কিনা জানি না।'

ওড়িয়া ফিল্মের ব্যবসায়িক ক্ষেত্র উড়িষ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবুও বিহারের উড়িষ্যা সীমাবর্তী কিছু শহর ছাড়াও কলকাতা, খড়গপুর এবং অন্ধ্রপ্রদেশ তথা উড়িষ্যার সীমানা এলাকার ভিন রাজ্যগুলিতেও প্রদর্শিত হতে দেখা যায়। কিন্তু একটা প্রশ্ন বারবার জাগে, ওড়িয়া ফিল্মের ভবিষ্যৎ কি? কেন নতুন মুখ উঠে আসছে না? ওড়িয়া ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি উড়িষ্যার উন্নতির পাথেয় হতে পারত কিন্তু উড়িষ্যার ফিল্ম জগতে আশার আলোও তেমন দেখা যাচ্ছে না। অভিনেতা মিহির দাসের কথায়–'ওড়িয়া ফিল্মের দর্শকদের মধ্যে মহিলারাই বেশি। মহিলারা চোখের জল পছন্দ করে। ফিল্মে যে নির্দেশক যত চোখের জল ঝরাতে পারবে সে তত সফল।' মিহিরের কথা হয়ত সত্যি। কিন্তু ওড়িয়া ফিল্মের জন্যে বর্তমানে চোখের জল কেউ ফেলছেন কিনা জানা নেই।

বিকাশ কুমার ঝা

ছবি: দীপক কুমার

বালান্দার বলিদান

বৌদ্ধ–হিন্দু এবং মুসলিম তিন ধর্মের সমন্বয় যে বালান্দাকে আশ্চর্য ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে পরিণত করেছে একসময়ে এখানেই হত নরবলি। হিন্দুরা যাকে মন্দির মানে মুসলিমরা তাকেই মসজিদের সম্মান দেয়। নালন্দার সমকালীন বালান্দা বৌদ্ধ-বিহারের ঐতিহাসিক প্রাচুর্য ও নস্টালজিক ধারা-বিবর্তনের আলেখ্য।

সালংকারা যক্ষিণী

এরপরে আমাদেরকে ওরা বাঁচতে দেবে না।

–কেন ?

–তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, আর আমি নমঃশূদ্র। আমাদের কোন সম্পর্ককেই সমাজ স্বীকার করে নেবে না ।

–আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাব । অনেক অনেক দূরে। অজানা জায়গায় গিয়ে নিরুপদ্রব সংসার বাঁধবো ।

–তাতেও বোধহয় আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না। ওরা আমাদের ঠিক ধরে ফেলবে ।

উপরের সংলাপগুলি পড়লে বোঝা যায় এটি কোন এক প্রেমিক–প্রেমিকার শঙ্কিত প্রেমালাপ । কিন্তু প্রেমের এই সংলাপ যদি পাঁচশ বছর আগে-কার প্রেমিক–প্রেমিকার মুখে বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ধর্ম-পরিচালক ও শাস্ত্রবেত্তাদের মুখের ভাবটা কল্পনা করতেও গায়ে কাঁটা দেয় । ব্রাহ্মণ–নমঃশূদ্রে অবৈধ প্রণয় ? এ অপরাধের শাস্তি প্রণয়ীর প্রাণ-দণ্ড। কোন গত্যন্তর নেই। শাস্ত্রের বিধান অমান্য করা আর স্লেচ্ছাচারের শাস্তি প্রাণদণ্ড। ব্রাহ্মণ-কন্যার প্রণয়ীকেও তাই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল । তান্ত্রিক মতে হল বলি আর ব্রাহ্মণকন্যাকে পণ্ডিত প্রবর মোড়লের রায়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হল। বালান্দার ব্রাহ্মণকন্যার জীবনে সেদিন অন্ধকার রাত্রি নেমে এসেছিল ।

শাস্ত্রীয় হিন্দু বিধান সেকালে এতখানিই নির্মম আর অমানবিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল দক্ষিণবঙ্গে। তখন ধর্মের নামে চলত নারকীয় খেলা। কথায় কথায় বলি দেওয়া ছিল রেওয়াজ। আজ স্বাধীন কোন রাষ্ট্রে অপরাধীকে সুপ্রীমকোর্টের রায় অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার পরও আত্মপক্ষ সমর্থন আর প্রাণভিক্ষার জন্য অপরাধী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাতে পারে। সেকালে এ নিয়ম ছিল না। অপরাধ লঘু হোক আর গুরুই হোক ধর্মনিয়ামকের আদেশ বলবৎ হবেই। কোন আবেদন নিবেদনে সিদ্ধান্তের রদবদল হবার কথা কল্পনাতেও আনা যেত না। তখন বালান্দার অধিবাসীদের ভাগ্যনির্দ্ধারণে হিন্দু তান্ত্রিকের কর্তৃত্বই যে সর্বময় ছিল বালান্দার বহুকাল আগের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাই তার সাক্ষী। বৌদ্ধযুগে, গুপ্তযুগে, বাগড়ী বা ভবদেব ভট্টের রাজধানী হিসেবে শেরশাহের আমলে, মুঘল আমলে, ইংরেজ আমলে বালান্দার গতিপ্রকৃতি আশ্চর্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ঐতিহাসিক চন্দ্রকেতুগড়ের সাক্ষ্য–প্রমাণ বক্ষে ধারণ করে আছে এই বালান্দা। এখানে বৌদ্ধযুগে অহিংস বুদ্ধনীতিতে চলত বৌদ্ধ মহাবিহার যা ছিল বৌদ্ধবিহারের সমকালীন। সভ্যতার ইতিহাস বালান্দাকে তারও আগে মহিমান্বিত করেছিল। হাড়োয়া বালান্দার প্রত্নশালায় রক্ষিত প্রস্তরীভূত পাঁচটি দাঁতের ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষায় জানা গেছে এগুলি ১০ হাজার বছর আগেকার। যার মানে দাঁড়ায় হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতারও আগে বালান্দায় গড়ে উঠেছিল আরেক সভ্যতা। হরপ্পা–মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদ, মূর্তি মুদ্রা যা যা পাওয়া গেছে হাড়োয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত মুদ্রা ও মূর্তির সঙ্গে তার আশ্চর্যরকম মিল।

বালান্দার সঙ্গে শুধু বলিদান নয়, জড়িয়ে আছে ইতিহাসের ধারাপরিবর্তনের ধারাবাহিকতা এবং নানা কিংবদন্তী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইতিহাসবেত্তা প্রয়াত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বালান্দাকে ভারতীয় প্রত্নস্থানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর লেখা বইতেও লিখলেন বালান্দার কথা। কিন্তু ইংরেজ সরকার সে সময়ে নিজেদের শাসনকার্য চালাবার ব্যাপারে এতখানিই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে ভারতীয় প্রত্নরত্ন আহরণে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। কারণ সেই মুহূর্তে বাংলার তামাম মানুষ ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। ১৯০৫–এর বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের ব্যাপকত্ব বেনিয়া ইংরেজদের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খননকার্য না চালালেও ইংরেজ সরকার একটি নোটিশ টাঙিয়ে দিল–'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত।'

বালান্দায় একসময় যে বৌদ্ধমহাবিহার গড়ে উঠেছিল তার উল্লেখ আছে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ 'অষ্ট সহস্রাহিকা শক্তি প্রজ্ঞপারমিতা'তে। এগুলি রয়েছে নেপাল ও তিব্বতে। সেখানে উল্লেখ করা আছে–নালন্দা মহাবিহারের সমসাময়িক কালে পূর্বভারতের দক্ষিণবঙ্গে বালান্দাতে বৌদ্ধ মহাবিহার ছিল। নালন্দা মহাবিহারের ছাত্র ইউ-এন-সাং থেকে শুরু করে ৬৭১ খৃষ্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক ইচিং এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় দেড় হাজারের বেশি বৌদ্ধবিহারের, সাংঘারামের অবস্থিতি ছিল বলে উল্লেখ আছে। 'প্রজ্ঞাপারমিতা'

এম.এ. জব্বার, সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা

বইতে আরও উল্লেখ আছে খৃষ্টপূর্ব ৪০০ বছর আগে গঙ্গারিডি রাজ্য ও তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র গড় চন্দ্রকেতু বন্দরের কথা। টলেথির লেখায় উল্লেখ আছে গঙ্গারিডি রাজ্যের সীমানা চন্দ্রকেতু গড় থেকে হাড়োয়া, মিনাখাঁ, মেড়েলি, ভাঙ্গড়, হেতোগড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সদাগর–এর বাণিজ্য ছিল ইতিহাস-খ্যাত গঙ্গারিদাই রাজ্যে।

ইতিহাসের এই বালান্দার কেন্দ্রভূমি হাড়োয়া কলকাতা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে সুন্দরবনের উত্তর পশ্চিম অংশে অবস্থিত। জঙ্গলে বাঘ থাকত একসময়, বিদ্যাধরী নদীতে ছিল কুমির। হেতালবনে মিঞার আনাগোনার কথায় এবং পায়ের ছাপ ও গায়ের বোঁটকা গন্ধে গ্রামবাসীদের কাছে সন্ধ্যার অনেক আগেই অন্ধকার নেমে আসত। চারদিক চুপচাপ হয়ে যেত। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত পীর মাজারে সেলাম করে নিলে মিঞা কেটে পড়ে, তাড়া করে তখন সাপও নেতিয়ে যায়, কামড়াতে সাহস পায় না। আজও এ ধারণা আছে মানুষের মনে। উত্তররানীগাছি, লতার বাগান, শিবপুকুরের বিলুপ্ত শিবমন্দির, লাল মসজিদ চন্দ্রকেতু গড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে মানুষ আজও পীরকে 'সেলাম' জানায়। আজও পীর গোরাই গাজীর দরগায় প্রত্যেক বছরের ১২ ফাল্গুন মেলা বসে, আমোদ আহ্লাদ করে গ্রামবাসীরা। ১৩ ফাল্গুন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পাঁচ সাত হাজার মানুষকে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। স্মরণ করে পীর গোরা চাঁদকে, ১২ ফাল্গুন তিনি শহীদ হয়েছিলেন এখানে।

কিন্তু কি করে বালান্দা বৌদ্ধ মহাবিহার শেষ পর্যন্ত গোরাই গাজীর আস্তানা হয়ে উঠল সে বিষয়ে জনমানসে কৌতূহলের শেষ নেই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, 'আজ থেকে হাজার বছর আগে বালান্দায় বৌদ্ধবিহার বা মঠের অস্তিত্ব ছিল।' নলিনীকান্ত ভট্টাচার্যের মতে, 'ষোড়শ শতাব্দীর ভূমিকম্প অথবা প্রচণ্ড জলোচ্ছাসে নিম্নবঙ্গে মাটি ধ্বসে যায়, তার ফলেই বৌদ্ধবিহার ধ্বংস হয়।' প্রাকৃতিক বিপর্যয়েই হোক কিংবা রাজনৈতিক বিবর্তনেই হোক বৌদ্ধধর্মচর্চা কেন্দ্রগুলি বিলুপ্ত হয়। হীনযান, মহাযান, যোগাকার, বজ্রযান এবং তন্ত্রযানের প্রভাবে অনুপ্রবেশ ঘটে হিন্দু ব্রাহ্মণ ধর্মের। হিন্দু ব্রাহ্মণ ধর্মের উত্থানে বৌদ্ধধর্ম নির্বাসিত হলেও বুদ্ধ নানামূর্তিতে আজও পূজা পেতেন। ক্রমে হিন্দু ধর্মের মধ্যে গোঁড়ামি, বৈষম্য আর বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রকাশ পায় তন্ত্রের নামে নানা উৎকট ও বিকৃত ব্যাভিচার ক্রিয়াকর্ম। বালান্দার নরবলিও এসময়কারই। তখন নরবলি বিষয়ে ধর্ম সঞ্চালকদের ইচ্ছাই সর্বময় ছিল।

হিন্দুধর্মের নামাবলী চাপিয়ে তখন দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন হিন্দু ধর্মের কর্তাব্যক্তিরা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকে শালু জালালের নেতৃত্বে তিন'শর বেশি আউলিয়া দরবেশ সুদূর বাগদাদ থেকে ভারতে এলেন ইসলাম ধর্মপ্রচারের জন্য। এই সময়ে আগন্তুক গাজীদের সঙ্গে প্রায়শই বিবাদ লাগত হিন্দু রাজা জমিদার ও প্রভাবশালী লোকেদের মধ্যে। সামন্তরাজা, জমিদারদের সীমাহীন অত্যাচার, শোষণ দমন পীড়ন এবং স্বার্থান্বেষী পুরোহিত সম্প্রদায়ের বর্ণবিদ্বেষের ও নিষ্ঠুর নরবলিপ্রথার শিকার হয়ে দরিদ্র মানুষ যখন চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছে, তৎকালীন রাজা চন্দ্রকেতুর সময়ে সৈয়দ আব্বাস ওরফে গোরাই গাজীর নেতৃত্বে বাইশজন দরবেশ ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে দক্ষিণ বঙ্গতে আসেন। বিবাদ বাধে চন্দ্রকেতুর সঙ্গে। চন্দ্রকেতু আর গোরাই গাজীর বিবাদ নিয়ে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। চন্দ্রকেতুর সামনে পীর তাঁর অলৌকিক শক্তির পরীক্ষা দেন। লোহার দরজায় পাকা কলা হয়, লোহার বেড়ায় চাঁপা ফুল ফোটে। এখনও একটি গ্রামের নাম বেড়াচাঁপা। কিন্তু তবু চন্দ্রকেতু গাজীর বশ্যতা স্বীকার করল না। যুদ্ধ বাধে চন্দ্রকেতুর দুই সেনাপতি হামা-দামার সঙ্গে। দু'জনেই মারা যায়। পরে আরও দুই বীর আকানন্দ ও বাকানন্দ গোরাই গাজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সমরে লিপ্ত হয়! আকানন্দ মারা

যায় বটে কিন্তু বাকানন্দ শিবপ্রদত্ত চক্রবাণে গাজীর ঘাড়ে আঘাত করে। এজন্য গোরাই গাজীকে ঘাড় কাটা পীর বলে কেউ কেউ। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গাজী চলে আসেন বালান্দায়। সেখানে তখন পানের চাষ হত। দুঃসহ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পীর গোরাচাঁদ সহকারী ছোন্দলকে পাঠান গ্রাম থেকে পান ও ইঁটের সুরকি আনতে। এগুলি থেকেই ওষুধ তৈরি করে ক্ষতে লাগাবার কথা। কিন্তু গ্রামবাসী তাদের জমিদারের ভয়েই হোক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক ছোন্দলকে পান–সুরকি দেয় না। এদিকে কিনু ঘোষের গাইয়ের দুধে যখন গোরাচাঁদ সেরে উঠছিলেন সেই গাইটাকেও মেরে ফেলে গ্রামবাসীরা। ১২ ফাল্গুন মারা গেলেন গোরাই-গাজী। মরার সময় 'বদদোয়া' দিয়ে বললেন, 'বালান্দার পানের চাষ ধ্বংস হবে, চুনসুরকির বাড়ি ধ্বসে পড়বে।' তাই আজও হাড়োয়ায় পানের চাষ হয় না, আজও কেউ সুরকি দিয়ে বাড়ি তৈরি করতে চায় না। গ্রামবাসীদের অনেকেরই বক্তব্য, সিমেন্ট সুরকি দিয়ে যারা বাড়ি তৈরি করেছে তাদের বাড়ির কিছু না কিছু ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে।

গোরাই গাজীকে কি হিন্দু কি মসুলিম সবাই শ্রদ্ধা জানায়, পুজো করে। মুসলিমরা তাকে 'ধর্মযোদ্ধা' হিসেবে অভিহিত করে। তার মৃত্যুদিনকে তাই শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয় বালান্দায়।

কিংবদন্তী কাহিনীর পাকে পাকে বালান্দার ইতিহাস যতই রহস্যময় হোক না কেন বালান্দার একটি স্বকীয় ঐতিহাসিক মূল্যমান আছে। হিন্দু ধর্ম উত্থানের সময়ে যে নানা মূর্তিতে বুদ্ধের পূজা প্রচলিত ছিল, বালান্দায় প্রাপ্ত বিভিন্ন মুদ্রার বুদ্ধমূর্তি তারই পরিচায়ক, তৎকালীন গুপ্তরাজারা ছিলেন হিন্দু তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণব। স্কন্দ গুপ্তের সময় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার শুরু হলেও চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বিষ্ণুপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। বালান্দা এলাকায় পাওয়া ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তিগুলি তারই সাক্ষ্য দেয়। রাজগীর ও সারনাথের পাথরের স্তম্ভগুলির সাথে বালান্দার লালমসজিদের পাথরও আট ফুট চওড়া লাল ইটের তৈরি ভাঙা পাঁচিলের ভাস্কর্যের প্রচুর সাদৃশ্য আছে। শুধু তাই নয়, বুদ্ধদেবের জন্মভূমি, লুম্বিনী, নালন্দা ও বালান্দায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির জিনিসপত্রে আশ্চর্য মিল। বৌদ্ধযুগের শিল্পকলায় এগুলি প্রভাবিত। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং ২৪ পরগণা জেলায় রাজা চন্দ্রকেতু বা চন্দ্রকেতু গড় সম্বন্ধে বহু লোককাহিনী প্রচলিত। রামায়ণের উত্তরকান্ডে ১০২ সর্গের ৯ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে রামানুজ লক্ষ্মণের দ্বিতীয় পুত্রের নাম চন্দ্রকেতু। মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় চন্দ্রকেতু ও তাঁর বংশধরেরা দেড়'শ বছর রাজত্ব করেন বলেও উল্লেখ আছে। বর্ধমানের কেতু গ্রামের চন্দ্রকেতু ২৪ পরগণার বালান্দার চন্দ্রকেতু, হুগলীর চন্দ্রকেতু যে একই ব্যক্তি সে বিষয়ে যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যের সংগতি আছে। কিংবদন্তীর চন্দ্রকেতু

তহমীনা খাতুন

প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী জব্বার সাহেব জীবৎকালের শেষ দশ বছরের দৃষ্টিহীনতাকে উপেক্ষা করে গড়ে তুলেছেন বালান্দা সংগ্রহশালা। সংস্কারমক্ত শ্রদ্ধেয় মানুষ জব্বার–এঁর পর এটি দেখাশোনার ব্রতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন জব্বারের ভাইঝি তহমীনা খাতুন।

সমুদ্র গুপ্তের কাছে যুদ্ধে হেরেছিলেন আর চন্দ্রগুপ্তের করদ রাজ্যের রাজা হিসেবে বসেছিলেন চন্দ্রকেতুর ছেলে, ঠিক ষোল'শ বছর আগে।

বার'শ শতাব্দীর আগের বহু নিদশন চন্দ্রকেতু গড় হাড়োয়া ও তার দক্ষিণের অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে আছে। কে জানে বর্তমান মীনাখাঁ থানার গ্রাম কুসাংরা–'কুষাণ' শব্দের অপভ্রংশ থেকে এসেছে কিনা। মঠের দীঘি ভগ্নস্তূপটিকে মুসলিমরা বলেন মসজিদ আর হিন্দুরা বলেন মন্দির। ভগ্নস্তূপের নিচের সুড়ঙ্গ কিংবা হাড়োয়া থানার গোপালপুরের মিত্রদের বাড়ির নিচে আবিষ্কৃত সুড়ঙ্গ সেই সময়কার রাজাদের ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের সাক্ষ্য দেয়। পিলখানায় এখন যে প্রাথমিক স্কুল গড়ে উঠেছে তা একটি বৌদ্ধমঠের উপর। মাটি খুঁড়তে গিয়ে ওখান থেকেই পাওয়া গেছে পোড়া ইঁটের পদ্ম এবং জাফরি, যা সামান্য দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত শানপুকুর, উত্তর রানীগাছি এবং লাল মসজিদে পাওয়া পদ্ম ও জাফরির সঙ্গে অভিন্ন।

বালান্দা ও নালন্দার সমকালীনতা আজও তেমনভাবে প্রমাণের চেষ্টা হয়নি। তবু যেটুকু পরিচয় বালান্দা সম্পর্কে পাওয়া গেছে তার প্রায় সবটা কৃতিত্বের অধিকারী প্রয়াত এম.এ. জব্বার। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী জব্বার সাহেব জীবৎকালের শেষ দশ বছরের দৃষ্টিহীনতাকে উপেক্ষা করে গড়ে তুলেছেন বালান্দা সংগ্রহশালা। সংস্কারমুক্ত শ্রদ্ধেয় মানুষ জব্বার–এর পর এটি দেখাশোনার ব্রতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন জব্বারের ভাইঝি তহমীনা খাতুন। নিজের বসতবাটিতেই তৈরি এই সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালায় ট্রাস্টী করে গেছেন ডঃ নিশীথ রঞ্জন রায়, ডাইরেক্টর ইন্সটিটিউট অব হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ, শ্রীযুক্ত এস. এ.এম, হবিবুল্লাহ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ড. দীপক বড়ুয়া, প্রধান অধ্যাপক, পালি ডীন অব দি ফ্যাকালটি অব আর্টস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখকে। কিন্তু এ তো সংগ্রহশালার কথা, জব্বার কিভাবে বালান্দার ইতিহাসকে জনসমক্ষে আনার জন্য চেষ্টা করেছেন ভাবতেই অবাক লাগে।

১৯৪৮ সাল থেকে বারবার তিনি সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন চন্দ্রকেতু গড়, লালমসজিদ, পিলখানায় মাঠ খনন ও সংরক্ষণের জন্য। কোন উদ্যোগই সরকার পক্ষ নেননি। ১৯৫৮-তে লোকসভা সদস্যা রেনু চক্রবর্তী ১৮ এপ্রিল তারিখে ১৭৪৫ নং প্রশ্নাবলীতে হাড়োয়া বালান্দার প্রত্নতত্ত্ব রক্ষণ বিষয়ে লিপিবদ্ধ করলেন। তৎকালীন সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড কালচার অ্যাফেয়ারের কেন্দ্রিয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের উদ্যোগে কেবলমাত্র গড়-খনাবরাহ মিহির ঢিপির খননে যে প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা প্রাক–মৌর্যযুগ থেকে গুপ্ত যুগের বলে স্বীকৃতি দেবার ব্যবস্থা করেন। খনাবরাহ মিহিরের ঢিপি ছাড়াও বালান্দার বিস্তৃত অঞ্চল পড়ে আছে। এমনও হচ্ছে, এলাকার কিছু দুষ্ট লোক গোপনে মাটি খুঁড়ে মূর্তি ও প্রত্ন নিদর্শনের চোরাকারবার শুরু করেছে।

বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম তিন ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় বালান্দায় এক আশ্চর্য ঐতিহাসিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। যাকে হিন্দুরা মন্দির মানে, মুসলিমরা তাকেই মানে মসজিদ। ধর্মমত নির্বিশেষে গোরাই গাজী সবার শ্রদ্ধেয়। সংস্কৃতির এই মেলবন্ধন আমাদের যেমন অনুপ্রাণিত করে, তেমনি কিংবদন্তীর বালান্দায় বলিদানের কথা শুনলে সকলকে ব্যথিতও হতে হয়।

গুরুপ্রসাদ মহান্তি

ছবি : তপন কুমার সর্বাধিকারী

শতবর্ষের মোহনবাগান ক্লাবে এখন পরস্পরবিরোধী দুই গোষ্ঠী শাসকশ্রেণী এবং মেম্বারস ফোরামের আদর্শগত দ্বন্দ্বে ধ্বংসপ্রায় হাল হকিকতের আবর্তে পড়ে ফুটবলাররা তথা খেলা হাবুডুবু খাচ্ছে—এমতাবস্থায় খেলার মাঠ থেকে বাড়ির বউ পর্যন্ত কি রকম মানসিক-তার শিকার হচ্ছেন তাই নিয়ে লিখেছেন গত দুই দশকের কিংবদন্তী ফুটবলার ও মোহনবাগান নায়ক সুব্রত ভট্টাচার্য।

মোহনবাগান ক্লাব : খেলার নাকি দ্বন্দ্বের আখড়া

মোহনবাগান :

কিস্‌সা কুরশি কা

শতবর্ষে মোহনবাগান ক্লাব এখন-দারুণ সংকটের মধ্যে পড়েছে। দীর্ঘ ষোল বছর আমি এই ক্লাবের সুখ দুঃখে জড়িয়ে রয়েছি। আসলে এই ক্লাবে দীর্ঘদিন জড়িত থাকায় ক্লাবের ওপর আমার কেমন একটা অধিকার বোধ জন্মে গেছে। তার থেকেই ক্লাব সম্পর্কে কিছু বলারও অধিকার তৈরি হয়েছে। এই ক্লাবের শতবর্ষে থাকতে পেরে খুবই খুশি লাগছে। যদিও শতবর্ষে দারুণ কিছু অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা যে রয়েছে তা কিন্তু নয়। তবুও শতবর্ষের পূর্তিতে ক্লাবের সঙ্গে থাকতে পেরে আমি যথেষ্টই গর্বিত।

এই মোহনবাগান ক্লাব থেকে আমি অনেক কিছুই পেয়েছি। পরিবর্তে ক্লাবকে আমি কতটা কি দিতে পেরেছি সেটা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। ক্লাবের প্রতি আমার আনুগত্য আগেও ছিল,

মোহনবাগানের ক্লাবহাউস : আদর্শগত বিবাদে এমনিই বিজন ?

এখনও আছে। এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমার সাধ্যমত খেলাধুলোর মাধ্যমে মোহনবাগানের সম্মান বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। সব সময়ই যে সাফল্য পেয়েছি, তা নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে, সাফল্য—অসাফল্য নিয়েই তো শিল্পীর জীবন!

মোহনবাগান ক্লাবের উন্নতির জন্য আমি অনেক কিছুই করেছি। ক্লাবের যখন আর্থিক চরম দুরবস্থা, তখন অনেকই ত্যাগ স্বীকার করেছি। অন্য ক্লাবে গেলে অনেক বেশি টাকা পেতাম। সে রকম অফারও ছিল। তবু যাই নি। কারণ ক্লাবের প্রতি আমার অন্যরকম অনুভূতি ছিল। সে জন্য টাকাকে বড় করে দেখিনি। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে যারা ক্লাব পরিচালনা করছেন, তাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে আমি একেবারেই সন্তুষ্ট নই। এই ক্লাবে আমি সই করি ১৯৭৪ সালে। তখন থেকে ১৯৮২—৮৩ সাল পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। সে সময়কার কমর্কর্তাদের ক্লাব পরিচালনা বেশ সুষ্ঠভাবেই হত। আমিও তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট আন্তরিক ব্যবহার পেতাম। বেশ একটা ঘরোয়া সম্পর্কও ছিল। পরবর্তীকালে সেটায় ভাঙন ধরে। এখন ক্লাবে সেইসব কর্মকর্তাও নেই, সেরকম পরিবেশও নেই। কর্মকর্তাদের মধ্যে সি.এম. রায় বা তেওয়ারির সেক্রেটারি পদ পরিবর্তন হয়। পরবর্তী সেক্রেটারি বা কর্মকর্তারা খেলোয়াড়দের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করতেন না। বিশেষ করে আমার সঙ্গে তাঁরা কখনোই আন্তরিক ব্যবহার করতেন না।

ক্লাবের সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক অনেক ক্লাব কর্মকর্তাদের একেবারেই পছন্দ হল না। বিশেষ করে আমার প্রতিবাদী মনোভাবকে তাঁরা পছন্দ করতেন না। আসলে তাঁরা যেসব ভুলভ্রান্তিকর কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, আমি তার প্রতিবাদ করতাম। এর ফলে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তাঁরা বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে দেন। তবে সকলেই নয়, একটা অংশ এরকম ব্যবহার করতেন। এইসব ক্লাব কর্তারা কিভাবে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, তা জানতেন না। যেমন ধরুন, বুয়া মিত্র, গজু বসু, শক্তি ঘোষ—এরকম কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা জানেন না খেলোয়াড়দের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয়। এই কর্মকর্তারা আমার সঙ্গে একেবারেই অন্যরকম ব্যবহার করতেন। তাঁদের কথায় আমি বেশি গুরুত্ব দিতাম না। সেখানেই আমাদের দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বটাই পরবর্তীকালে বিরাট রূপ ধারণ করে। আমি স্বীকার করছি যে আমার বহিঃপ্রকাশ হয় একটু উচ্চস্বরে বা বহিঃপ্রকাশের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা থাকে। কিন্তু যে কারণে আমার মধ্যে উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সেটা কোনভাবেই অসত্য ঘটনা বা নমিনাল ব্যাপার নয়। আমি সত্যের ওপরই দাঁড়িয়ে আছি। হয়ত উত্তেজনাটা একটু বেশিমাত্রায় থাকে, যার জন্য একটু খারাপ শোনায়। লোকের চোখে বা সাংবাদিকদের কলমে ব্যাপারটা অন্যরকম প্রচার হয়ে থাকে। ক্লাবের এইসব কর্মকর্তাদের খারাপ ব্যবহারে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। এঁদেরকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারিনি যে মোহনবাগান ক্লাবের জন্য আমি অনেক করেছি। এই সুব্রত ভট্টাচার্য অন্য দলে গেলে অনেক বেশি টাকা পেত। কিন্তু কেন যায় নি সেটা কিছুতেই বোঝাতে পারি না। আসলে তাদের মনের মধ্যে 'সুব্রত হটাও' এই চিন্তাধারা একেবারে গেঁথে গেছে। এসবই কিন্তু মুষ্টিমেয় কর্মকর্তাদের ব্যাপার। মোহনবাগানের অসংখ্য অনুরাগী, মেম্বারদের কাছ থেকে আমি কোনদিনও খারাপ ব্যবহার পাই নি।

সামনেই শতবর্ষ। নানারকম দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে ক্লাবের ঐতিহ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মোহনবাগানের বিরোধী দল পঞ্চাশ দশক থেকেই আছে। একমাত্র সুব্রত ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিরোধিতা করাতেই যে বিরোধী দল গড়ে উঠেছে তা নয়। অমল বোস, গৌর সাহা দীর্ঘদিন এই

ধীরেন দে

রূপালী বছরের সোনালী মাস এই জুলাই

বছরের সবচেয়ে কম দামে মাত্র ১৩·৪০ টাকায় এই জুলাই-এ ইউনিট কিনুন

১৯৮৮-৮৯ সালে বিশেষ রজত জয়ন্তী ডিভিডেন্ড-১৮%

তাড়াতাড়ি করুন। এই সুযোগ পাওয়া যাবে মাত্র ৩১শে জুলাই, ১৯৮৯ পর্যন্ত।

যে কোন বছরের যে কোন সময়ে ইউনিটে বিনিয়োগ সত্যিই লাভজনক।

কিন্তু এ বছরের জুলাই মাসে ইউনিটে বিনিয়োগের কোন তুলনা হয় না।

বিশেষ কমদামে আপনি এই জুলাইএ ইউনিট কিনতে পাবেন। মাত্র ১৩·৪০ টাকায়

আপনার টাকার বিনিময়ে আপনি পাবেন· নিরাপত্তা, যে কোন সময় ভাঙিয়ে নেওয়ার সুবিধা, বিনিয়োগের বৃদ্ধি আর আকর্ষনীয় হারে ডিভিডেন্ড।

এ বছর ডিভিডেন্ড ঘোষনা করা হয়েছে চমকপ্রদ ১৮% হারে।

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

(একটি সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)

প্রধান কার্যালয়ঃ ১৩, স্যার ভিটলদাস থ্যাকারসে মার্গ, (নিউ মেরিন লাইনস), বম্বে-৪০০ ০২০ ফোনঃ ২৮৬৩৭৬৭

আঞ্চলিক কার্যালয়ঃ ২, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোনঃ ২০-৯৩৯১, ২০-৫৩২২

শাখা কার্যালয়ঃ জীবন দীপ, এম এল নেহেরু রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি ৭৮০ ০০১, ফোন ২৩১৩১
আশা নিবাস, ২৪৬, লুইস রোড, ভুবনেশ্বর-৭৫১ ০১৪
ফোনঃ ৫৬১৪১
জীবন দীপ, একজিবিশন রোড, পাটনা-৮০০ ০০১ ফোনঃ ২২৪৭০

Sisia's-UTI/077-BEN
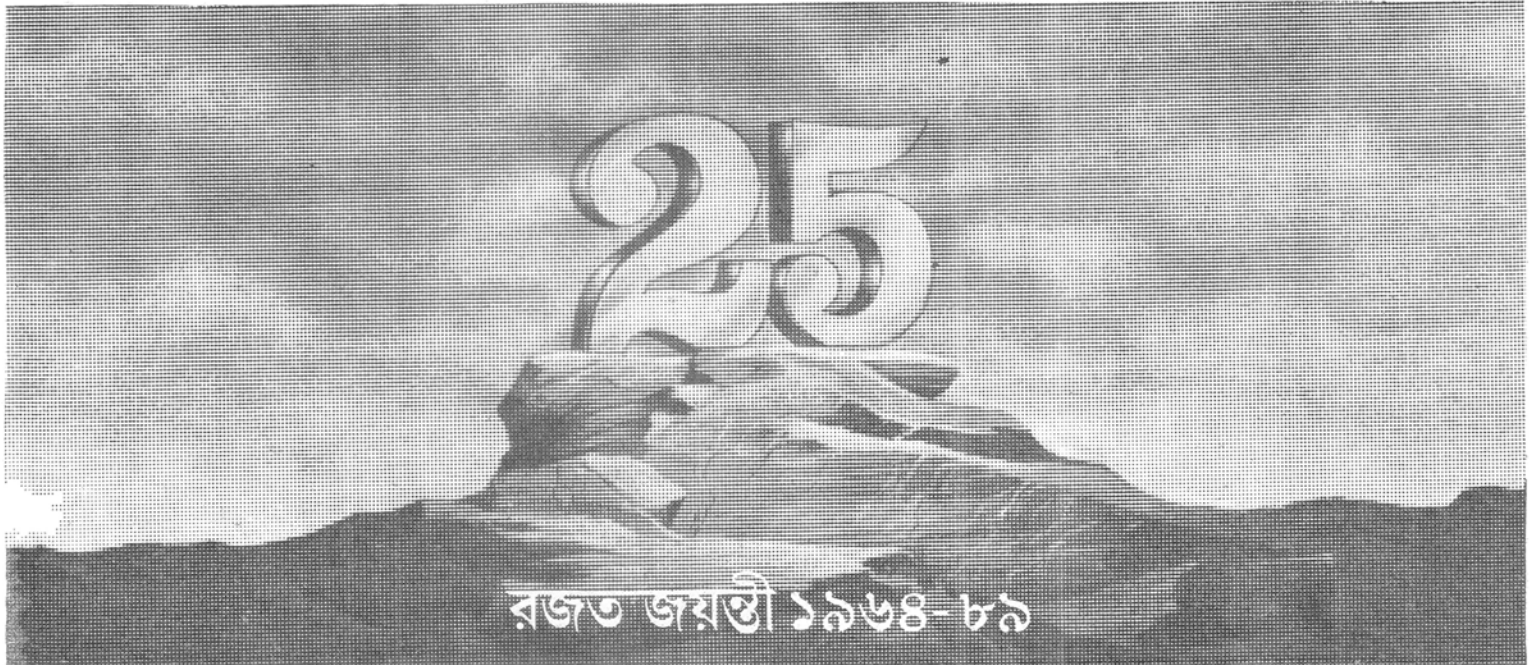
ক্লাবের বিরোধী। আজকে সেটা বিরাট রূপ ধারণ করেছে। আসলে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন খেলোয়াড়রা অত্যাচারিত হচ্ছেন। তাই আমি রুখে দাঁড়িয়েছি। আর কেউ এরকম মনোবল নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে নি। টাকা দিয়ে যারা সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এই ক্লাবটিকে ঘিরে খেলোয়াড়দের ওপর তাঁবেদারি করছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান দরকার। তাই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। আজ এই বিরোধিতাটা একটা রূপ ধারণ করেছে। আসলে আজ বিভিন্ন খেলোয়াড়রা একজোট হয়েছেন। তবে প্রথমেই দেখতে হবে যে এই বিরোধী দল হল কেন? বিভিন্ন দুর্নীতির জন্যেই কিন্তু বিরোধী দল গড়ে উঠেছে। দল যদি সুষ্ঠুভাবে চলে তাহলে তো বিরোধিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এই ক্লাব সুষ্ঠুভাবে চলে নি। ক্লাবের দীর্ঘদিনের অ্যাকাউন্টস্ মেলে নি। যদি মোহনবাগান ক্লাব থেকে ইডেন গার্ডেনের ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার হিসেব দেখান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সন্দেহ থাকবেই। যে ক্লাবে আট ন'বছর ভোট হয় না সেখানে যে একটা দুর্নীতি হচ্ছে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করার কেউ নেই। বিরোধীরা যেটা বলে আসছে আজকে আমরা সেটাকেই প্রকাশ্যে তুলে ধরছি। আজ পরিচালক গোষ্ঠীর কিছু অংশ বলছেন যে আমরাই নাকি ক্লাবটিকে ধ্বংস করছি। আসলে ক্লাবটিকে নষ্ট করছেন এঁরাই। তাঁরাই সুষ্ঠুভাবে ক্লাবটির পরিচালনা করতে পারছেন না। নানারকম দুর্নীতি তাঁরা চেপে রেখেছেন। সেটাকেই আমরা প্রকাশ করছি। এই বিরোধিতা আজ না হয়ে এক বছর পরেও হতে পারত। অনেকদিন হল কোর্টে কেস চলছে। কোর্টের রায় এসেছে এমন সময় যেটা শতবর্ষের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। পরিচালক গোষ্ঠী যাতে আরও দুর্নীতি না করতে পারে তার জন্যেই আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমার মনে হয় শীঘ্রই একটা নির্বাচন দরকার। নয়ত একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন। কেউ কেউ বলছেন ধীরেনদাকে জেনারেল সেক্রেটারি চাই না, কেউ বলছেন ছ'মাসের জন্যে রাখা হোক। সেটা নিয়েই একটা দ্বন্দ্ব চলছে। দেখা যাক মিটিং—এ ওঁরা কি ঠিক করেন।

যেহেতু আমার পরিবারের সকলেই মোহনবাগানের সমর্থক, সেহেতু বাড়িতে বরাবরই মোহনবাগানী আবহাওয়া চলে আসছে। বিগত দিনগুলিতে নানা ধরনের দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়েছে আমার স্ত্রীর ওপর। ছোট থেকে ওরা সবাই মোহনবাগানের মেম্বার। তাই আমার বউ কিংবা বাড়ির সবাই এই ক্লাবের প্রতি যথেষ্ট দুর্বলতা অনুভব করে। তাঁরা অবাক হয়ে যান আমার প্রতি ক্লাবের এই ব্যবহার দেখে। আমাকে বলে, কি দরকার কাগজে এরকম বক্তব্য রাখার। এই দ্বি—মুখী প্রতিক্রিয়াটা আমার স্ত্রীর ভাল লাগছে না। তাই তাঁর একটাই কথা, তোমাকে আর মাঠে যেতে হবে না। তাঁর মতে, তোমাকে নিয়ে যখন রাজনীতির খেলা চলছে তখন তোমার না খেলাই ভাল। অথচ আমাদের পরিবারের সকলেই মোহনবাগান অন্ত প্রাণ। লতা মোহনবাগানের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাছাড়া ইদানিংকালের অহেতুক কিছু সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমেও বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। আমি তাঁকে সব কিছু বোঝানর পরে সে বলে, ক্লাবে যাওয়া বন্ধ কর। কারণ এভাবে তোমার ইমেজটা নষ্ট করা উচিত নয়।

আমাদের বিয়ে '৮২ সালে। বিয়ের আগেও আমাদের পরিচয় ছিল। মোহনবাগান ক্লাবে আসার প্রথম দিন থেকেই ওরা আমাকে চিনতো। তাই তারা আমার ফুলফর্মের ব্যাপারটি জানে। ও ভাল ভাবেই জানে যে ইস্টবেঙ্গল কি মহামেডান ক্লাব আমায় কিভাবে চেয়েছে। তার মতে, যেখানে ভালবাসা আন্তরিকতা কিছুই নেই সেখানে না যাওয়াই ভাল। আমার শুধু একটা কথা মনে হয় যে এইসব অন্যায়কে মেনে নেব কেন? তাই প্রতিবাদ করি। কিন্তু যদি দেখি কোনই উন্নতি সম্ভব হল না তখন অন্য ব্যবস্থা নিতেই হবে। কারণ জলে বাস করে তো আর কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না। তখন দল ছেড়ে চলে যাব।

আমি বিভিন্ন সার্কেলে মিশি। সেখানে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া হয় এ ব্যাপারে। তাদের প্রশ্ন দীর্ঘদিন খেলার পরে তোমার সঙ্গে ক্লাব এরকম ব্যবহার করছে কেন? খেলোয়াড়দের মধ্যে আমার ঘনিষ্ঠ কেউ নেই। শুধু কেষ্ট মিত্র ছাড়া। আমার

মোহনবাগানের মাঠ

চুনী গোস্বামী : সুব্রতকে কি ওয়েলকাম জানাবেন না ?

ছবি : সুধাংশু পাল

সুব্রত : দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছি

শৈলেন মান্না

মনে হয় গড়ের মাঠে খেলোয়াড়রা কেউ কারও ঘনিষ্ঠ হয় না। তবে কারও যদি ঘনিষ্ঠ কেউ থেকে থাকে তাহলে সেটা আলাদা কথা। আমার নেই। আমার বন্ধু অনেক আছে তবে ঘনিষ্ঠ কেউ নয়। খেলার জগতের বাইরে আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু রয়েছে। তারাও সবাই মোহনবাগানেরই সমর্থক। তাদের পরিষ্কার বক্তব্য, আমাকে ঘিরে ক্লাবে এইসব কি চলছে। তারা কোন কোন সময়ে এ ব্যাপারে প্রতিবাদও করে। তবে শেষ পর্যন্ত সবাই বলে মাঠ ছেড়ে দাও। আসলে আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, ক্লাবের গোটা বিষয়টাকে তাদেরকে ঠিক বোঝাতে পারি না। সংবাদপত্রেও অনেক বিভ্রান্তিকর খবর বেরোয়, আমার সামনেই অনেকে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করে। আসলে সাফল্য প্রতিষ্ঠা শব্দ দুটি পাশাপাশি রয়েছে। ক্লাবে আমি সাফল্য পেলে আমাকে রাখবে নয়ত তাড়িয়ে দেবে। এটাই মূল কথা। কিন্তু যেক্ষেত্রে আমি সাফল্য এনে দিচ্ছি সেখানে আমায় সরিয়ে দিলে দ্বন্দ্ব আসতেই পারে। সক্রেটিস তিন বছর খেলা ছেড়ে দেবার পর আবার খেলায় ফিরে এসেছিল। ওকে পেলে নিজে ডেকে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের চুনীদা আমাকে ওয়েলকাম জানাবেন না। কারণ আমার দীর্ঘদিন ধরে একভাবে খেলাটা কেউ সহ্য করতে পারছে না। আসলে আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের কমপ্লেক্সই হল এইরকম। কেউ কারও ভাল সহ্য করতে পারে না। একে অন্যের সাফল্যকে ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। মাঝ থেকে ফুটবলই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অসংখ্য অনুরাগী দর্শক। ক্লাবে আমায় প্রতিটি পদক্ষেপ দেখেশুনে ফেলতে হচ্ছে। কখন কি ক্ষতি হয় সেজন্যে চারিদিকে নজর রাখতে হয়।

এই ফুটবল খেলাতে দেখি অনেক মহিলা অনুরাগীও রয়েছেন। তারাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী। সেই ৭০ দশক থেকে দেখছি অনেক মহিলা খেলা দেখতে আসেন। তারা চেষ্টা করেন আমাদের সান্নিধ্যে আসার। তবে আমার সঙ্গে কারোর হৃদ্যতা ছিল না কোনদিন।
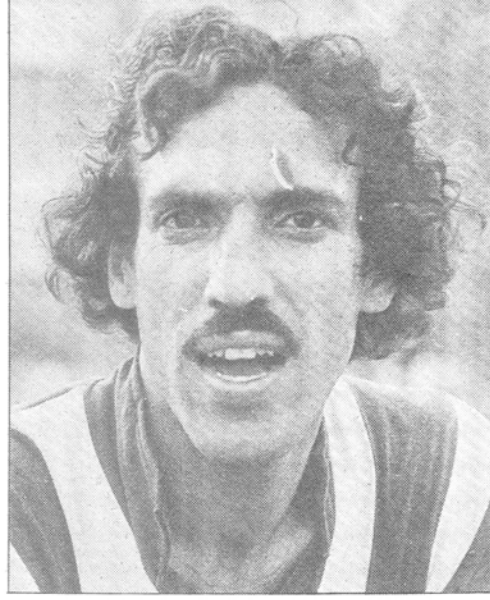
আমার সাফল্যে বউ–এর অবদান যে একেবারেই নেই তা নয়। ও যথেষ্টই সহযোগিতা করে আমাকে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা স্বামীর মঙ্গলকামনায় যেসব জিনিস করে থাকে। এই পুজোআর্চা, পালাপার্বণ সবই সে করে। আমার স্ত্রীর সব সময় চিন্তা কি করলে আমার শরীর ভাল থাকবে, আমি আরও ভাল খেলতে পারব। তবে আমার খেলার সাফল্যে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে মায়ের নাম। আসলে খেলার প্রথম দিন থেকেই মা আমাকে দেখছেন। তাই তিনিও এ ব্যাপারটিতে ঠিক অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। খেলার সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করা থেকে প্রায় সবই মা করতেন। আগে আমাদের খেলার কিড্‌স নিয়ে ক্লাবে যেতে হত। ক্লাব থেকে আমরা কিছুই পেতাম না। এখন সেসব ক্লাব থেকেই পাই। প্র্যাকটিসের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সব মা গুছিয়ে দিতেন। অনেক আর্থিক দুরবস্থায়ও মা যাহোক করে যোগাড় করতেন সেসব। আমার মা–ই আমাকে মোহনবাগানের হাতে তুলে দিয়েছেন। আসলে ইস্টবেঙ্গলে আমার খেলবার কথা কনফার্ম ছিল। কিন্তু মা আমাকে ইস্টবেঙ্গলে সই করতে দেন নি। তিনি রাত বারটার সময় আমাকে তুলে দিয়েছিলেন চুনী গোস্বামীর হাতে। এতেই বোঝা যায় আমাদের পরিবার মোহনবাগানের প্রতি কতটা অনুগত। এখন মা নিজেই আমাকে মোহনবাগান ক্লাবে যেতে বারণ করেন। তিনি বলেন তুই যে ক্লাবের জন্যে এত করলি তাদের এরকম ব্যবহার! তোকে আর ওই ক্লাবে যেতে হবে না। তাছাড়াও যেসব লোকে আগে অনেক ভাল ভাল কথা বলতেন তারাই এখন এমন ব্যবহার করেন যে মা অবাক হয়ে যান। সেসব মোহনবাগানের কর্মকর্তাদের কথা শুনে মা খুব দুঃখ পান। আমার মামা–মাসিরা, দাদা, শ্বশুর–বাড়ির আত্মীয়স্বজন সুবাই এখন মাঠে যেতে বারণ করেন। বাবাও বলেন, বিভিন্ন ধরনের লোক মাঠে আসছে, যা ব্যবহার তোমার আর মাঠে যাবার প্রয়োজন নেই। আমার মাঠে যাবার ব্যাপারে বাড়ির সকলেই আপত্তি তুলছেন।
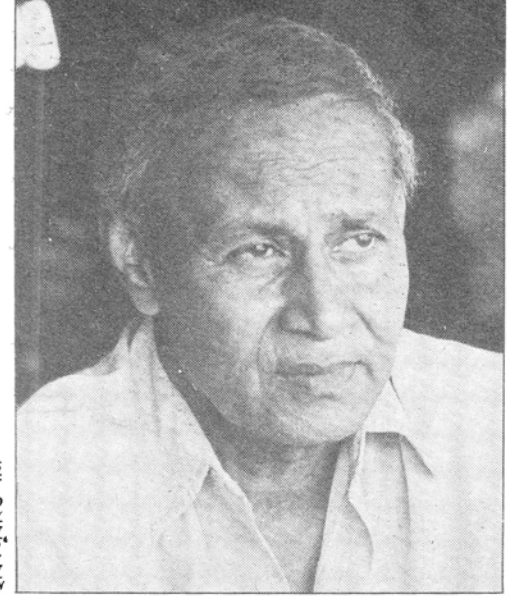
এই ক্লাবে ভোট হয় না। এখানে জেনারেল মিটিং–এর কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে মেম্বারদের কোনও দোষ নেই। তাদের হাতে তো আর ঐতিহ্যের ভার দেওয়া হয় নি। এক্ষেত্রে দোষ পুরোপুরি পরিচালক গোষ্ঠীর। তারাই ঐতিহ্যকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। হয়ত আগেকার সেই ঐতিহ্য আবার ফিরে আসতে পারে। তবে এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়। ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনেক ভাল অনুষ্ঠান হয়েছিল। কিন্তু ১০০ বছরের পূর্তিতে কোন অনুষ্ঠান করার ক্ষমতা এঁদের নেই। মাঝ থেকে অসংখ্য অনুরাগী দর্শক বঞ্চিত হচ্ছেন। এই অব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে নির্বাচন চাই।

স্ত্রী লতা, মেয়ে মেমসাহেব, এবং ছেলে সৌম্যকে নিয়েই আমার জগৎ। দুঃখের সময় এরাই আমাকে সাহচর্য দেয়।

মোহনবাগানের পক্ষে আমি ১৬ বছর খেলছি। আমরাই যথার্থ এটা প্রমাণ করতে না পারলে আমি ক্লাব ছেড়ে চলে যাব। যে পক্ষে আমরা দাঁড়িয়েছি, যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি তাতে যদি জিততে না পারি তাহলে আর থেকে কি করব? তবে অন্য দলে আর নয়। বাড়ি, অফিস আর ফিল্ম লাইনে আমার কিছু বন্ধুবান্ধব আছে তাদের নিয়েই সময় কাটিয়ে দেব।

ছবি: তপন কুমার সর্বাধিকারী, তাপস কুমার দেব

গুপ্তরোগ চিকিৎসা

শুধু আমাদের দেশ কেন, সারা পৃথিবীর দেশে দেশে যার চাহিদা; যাকে নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানী থেকে ফুটপাতের দোকানিটি পর্যন্ত ফাটকা ব্যবসা চালাচ্ছে সেই গুপ্তরোগ চিকিৎসার গোপন অন্দর মহলের দিকে চাঞ্চল্যকর আলোকপাত।

বছর তিনেক আগের কথা। শীতকাল। ডিসেম্বরের মিঠে রোদ ঝলমল করছে চারদিকে। সকাল প্রায় দশটা। কিছুক্ষণ আগে হাতিবাগানে নিজের চেম্বারে এসে বসেছেন কবিরাজ কৃষ্ণানন্দ গুপ্ত। তখনও কোন রোগী নেই। একটি আয়ুর্বেদিক বইয়ের পাতা উল্টেপাল্টে দেখছিলেন। এমন সময় তাঁর চেম্বারের সামনে অফ হোয়াইট রঙের চকচকে অ্যামবাস্যাডর এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামলেন খাটো চেহারার এক ভদ্রলোক। বলিষ্ঠ শরীর। পরণে পাটভাঙা ধবধবে হাফ শার্ট। ট্রাউজারও একই রকম। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি।

ভদ্রলোক সরাসরি তাঁর চেম্বারে উঠে এলেন। পরিচয়ে জানা গেল একটি বড় কোম্পানির উঁচুদরের এক্‌সিকিউটিভ তিনি। কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎই কৃষ্ণানন্দবাবুর হাত ধরে কেঁদে উঠলেন। আচমকা এমন পরিস্থিতির জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। নিজেকে সামলে নিয়ে আসল রহস্য জানতে চাইলেন। জানতে পারলেন, একটু বিশেষ বয়সে বিয়ে করেছেন এই ভদ্রলোক। স্ত্রীর চাহিদা মেটানোর শক্তি তাঁর নেই। ফলে স্ত্রীর ক্ষোভে তিনি দুরন্ত মানসিক অবসাদে পড়েছেন।

দীর্ঘ জীবন আর যৌবন নিয়ে সুস্থ হয়ে চিরকাল মানুষ বেঁচে থাকতে চেয়েছে। তাই আদিকালেও সেই গহন অরণ্যের মধ্যে থেকে মানুষ চেয়েছে নিজের যৌবনকে টিকিয়ে রাখার সঞ্জীবনী ভেষজ। সেই চাওয়া আজও ফুরিয়ে যায় নি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্যাসোলিগেচার আর রিজুভিনেশন-এর পরশ পাথরের জন্য বৈজ্ঞানিকের দল হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অন্যদিকে মানুষের এই সহজাত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চিরদিনই এক শ্রেণীর অসাধু কারবার চলে আসছে। রাজধানী কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল শহরগুলিতে এখন সেই অসাধু চক্রের রমরমা বাজার। গুপ্তরোগ চিকিৎসার নামে কোটি কোটি টাকা লুফে নিচ্ছে তারা। কলকাতার প্রতিটি গলি ঘুপচি রাজপথ, বাস ট্রাম আর লোকাল ট্রেনে ছেয়ে গেছে গুপ্তরোগ চিকিৎসকদের বিজ্ঞাপন। এইসব বিজ্ঞাপনে কেউ বা লিখছেন গোল্ড মেডালিস্ট, কেউ বা লিখছেন বিলেত ফেরৎ অভিজ্ঞ গুপ্তরোগ চিকিৎসক!

এইসব পোস্টার হ্যাণ্ডবিল ছাড়াও সংবাদ পত্রগুলিতেও এইসব বিজ্ঞাপনের বহর কম নয়। এই 'সেক্‌স মেডিসিন চক্র'টি যে কেবল কোটি কোটি টাকা রোজগারের ধান্দা নিয়ে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল শহরগুলিতে জাল বিস্তার করে চলেছে তা অনস্বীকার্য। কয়েক মাস আগে 'হীরা হোটেল' এর ১২ নং রুম থেকে এমনি এক অসাধু যৌনরোগ চিকিৎসক ডঃ সাম্‌সি ধরা পড়েন লালবাজারের গোয়েন্দা পুলিশের হাতে।

লালবাজারের ইমমবাল ট্রাফিক বিভাগের ও সি তারিনীপ্রসাদ সিং বলেন, কলকাতা, হাওড়ার

একশ শতাংশ উপশমের গ্যারান্টি!

আনাচে কানাচে এইসব যৌন রোগ চিকিৎসক তথা বিশেষজ্ঞদের ঠেক গড়ে উঠেছে। শহর কলকাতায় যৌন রোগ যেমন দ্রুত ছড়াচ্ছে, ওদের কারবারও জাঁকিয়ে উঠছে সেই হারে।

আসলে জীবনে নারী পুরুষের সম্পর্কের একটা বড় অংশ হলো শরীর সম্পর্ক। অর্থাৎ যৌনতৃপ্তি। এটি প্রত্যেকটি জীবনের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী হলেও বিশেষ করে আমাদের দেশে এখন তা লজ্জাস্বরূপ। এটাই বোকামি, নির্বুদ্ধিতা। এই নির্বুদ্ধিতাই 'সেক্‌স মেডিসিন চক্র' ব্যবসার অন্যতম মূলধন। কারণ এই সব যৌনরোগ চিকিৎসকদের কার্যকলাপ কোন ভুক্তভোগীই লজ্জায় প্রকাশ করতে চায় না। ফলে সাধারণের কাছে তা গোপনই থেকে যায়।

কেতকীর গন্ধবিহ্বল মধু মাসের পূর্ণিমা রাত্রি। মধুর নূপুর বেজে উঠছে প্রতি পদক্ষেপে। যৌবন মদে মদির শর্য্যাতি তনয়া সুকন্যার রাজপ্রাসাদ ভালো লাগছে না।

দূরে শিপ্রা নদীর তটপ্রান্তে এক ঋষির পল্লী গৃহ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পর্ণকুটিরের পাশেই চম্পক বৃক্ষ লতারই পাদমূলে এক বল্মীক স্তূপ। চম্পক চুম্বিত লিপির বিন্দু ঝরে পড়ে ওই বল্মীক স্তূপের ওপর। রাজবালা এগিয়ে যান ওইদিকে। একটা মাদকতা, একটা শিহরণ সারা শরীরে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। ওই স্তূপের ভিতর দুটি পদ্মপরাগ মণি জ্বলে ওঠে। কি ওটা? নিজ কবরী থেকে তিনি তুলে নেন স্বর্ণমঞ্জিরা। বিদ্ধ করেন ওই পদ্মপরাগ মণি।

এক বুক ফাটা আর্তনাদ ওই আরণ্যক অন্ধকারের নিস্তব্ধতাকে যেন ঝংকৃত করে তোলে। বল্মীক স্তূপ স্পন্দিত হয়ে ওঠে। বেরিয়ে আসেন এক তপঃক্লিষ্ট ঋষি, চ্যবন। জরাশীর্ণ-শরীর। চোখেমুখে যন্ত্রণা কাতর অভিব্যক্তি। মৈরেয়ী ক্রন্দন করে ওঠে। বন্য বেতসের মত কাঁপতে থাকেন সুকন্যা। যন্ত্রণাকাতর ঋষি অভিশাপ দেন সুকন্যার পিতা শর্য্যাতিকে—'প্রজাকুল ব্যাধিক্লিষ্ট হয়ে উঠবে।' শর্য্যাতি জানতে পারেন চ্যবনের দেওয়া অভিশাপ। ঋষির পদপ্রান্তে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকেন।

যৌবন মদে মদির পীনোন্নত পয়োধর উর্বশী নিন্দিত রক্তিম কম্রতনুর দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে থাকেন চ্যবন। সুকন্যার পানি গ্রহণ করতে চান ঋষি। শর্য্যাতির শ্বাস প্রশ্বাস স্তব্ধ হয়ে আসে। হায় ভগবান এ যে বৃদ্ধ! উদ্ভিন্ন যৌবনা তন্বী কন্যা সুকন্যার সাথে বিবাহ দিতে হবে বৃদ্ধ জরাক্লিষ্ট চ্যবনের।

সুকন্যা জানেন—কোন না কোন প্রারব্ধের জন্যই যৌবন মদে মদির জীবনটা ব্যর্থ হল। নিরুত্তাপ, নিশ্চুপ, জরাজীর্ণ চ্যবনের বুকে শাতনরী

দিয়ে আঘাত করেন। চুম্বনে চুম্বনে বিহ্বল করে তোলেন ঋষি চ্যবনকে। কোন সাড়া নেই। হিমশীতল স্তব্ধতা। প্রাণহীন শবদেহ যেন। মিলন রাত্রির ব্যর্থতার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন সুকন্যা। যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠে যৌবন।

পর্য্যাতির আহ্বানে ঋষি দর্শনে আসেন অশ্বিনীদ্বয়। সুকন্যার তৃষ্ণার্ত তন্বী যৌবনের দিকে চেয়ে থাকেন। নিভৃত, বিশ্রব্ধ, মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে আকর্ষিত হন। বিবাহের প্রস্তাব দেন তাঁরা।

রোগমুক্তির দাওয়াই পথের ধারেই!

প্রত্যাখ্যান করেন সুকন্যা। পতিরেকো গুরু স্ত্রীনাম-ছিঃ ছিঃ কানে ও শব্দ যেন শোনা না যায়। হোক জরাগ্রস্ত-হোক সে বৃদ্ধ-তবুও তিনি স্বামী-অগ্নীসাক্ষী করেই তো বিবাহ করেছেন।-সন্তুষ্ট হন অশ্বিনী-কুমার। চিকিৎসার সহায়তায় চ্যবনের হৃত যৌবন ফিরিয়ে আনেন। সুকন্যার অতৃপ্ত যৌবন তৃপ্ত হয়। দেখা যাচ্ছে নারী-পুরুষের যৌনতা নিয়ে সমস্যা ও তার প্রতিকার সেই আদিযুগ থেকেই চলে আসছে। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাকাহিনীর বহু দৃষ্টান্ত আমাদের চিরাচরিত যৌনসমস্যার সাক্ষী হয়ে আছে। সেই সমস্যা আজও বর্তমান। কিন্তু প্রতিকারের রীতিনীতি পাল্টেছে অনেক। ফ্রি সেক্স বা অবাধ যৌনতা আর অ্যাবরশন চালু হওয়ায় সেক্স মেডিসিন-এর বাজারও গরম হয়ে উঠেছে। এর দৌলতে হাতুড়ে ডাক্তাররাও কামিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

এই সমস্ত যৌনরোগ চিকিৎসকদের ব্যাপারে পাটনার সরকারি টিব্বি কলেজের জি·ইউ·এম·এস (গ্র্যাজুয়েট অব ইউনানি মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি) হাকিম মহম্মদ সালিম আদিব বলেন, শারীরিক ব্যর্থতাকে সফলতার দিকে ফিরিয়ে আনাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজ। পুরুষের এই ধরনের রোগের বড় চিকিৎসক হলেন তাঁর স্ত্রী। স্ত্রীর ক্ষেত্রে ঠিক একই ভাবে স্বামীও। আসলে এ ধরনের রোগীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হীনমন্যতায় ভোগেন। স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করা দরকার। তা না করে অনেকেই নিজেদের দুর্বলতা গোপন রাখেন। আর এদিক ওদিক যৌনরোগ চিকিৎসকের বিজ্ঞাপন দেখে সেক্স মেডিসিন চক্রে পা বাড়ান।

পশ্চিমবঙ্গের স্টেট কাউন্সিল অব ইউনানি মেডিসিনের কার্যকরী কমিটির সদস্য হাকিম নেহান আহমদের কথায়, সেক্স মেডিসিন নিয়ে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক উপায়ে এক শ্রেণীর মানুষ এমন রমরমা বাজার চালাচ্ছে অথচ ওদের রোখার প্রচেষ্টা কতটুকু? চিকিৎসা সম্পর্কে হাকিম মহম্মদ সালিম আদিব বলেন, রোগের অবস্থা বুঝে প্রথম দাওয়াই হলো মালিশ। তারপর টিকোড়। সবশেষে তোলা। এর সঙ্গে অবস্থা বুঝে খাওয়ার ওষুধ–মাজুন সারদা সুর্মা, মাজুন সাহ লব, লবুর কাবির, মাজুন সাসাব আওয়ার, মাডল লাহাম ইত্যাদি। এই ভাবে যৌনক্ষমতা বাড়ানোরও নির্দিষ্ট দাওয়াই নাকি আছে। হাব্বে মোকাবি-এ-খাস কিংবা লবুর কাবির এ দিক থেকে খুবই উপকারী। 'পাখির মাংস খাওয়াও' খুব উপকারী।

আগেকার দিনে রাজা বাদশারা হামেশাই বহু পত্নীতে উপগত হতেন। সেই শক্তি টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা খেতেন বিভিন্ন শক্তিশালী ধাতব ভস্ম। যেমন সিরাজদৌল্লাহ খেতেন পানের সঙ্গে মুক্তা ভস্ম। জাহাঙ্গীর খেতেন স্বর্ণভস্ম। এছাড়া চাঁদি, কস্তুরী কেশর এইসবের ভস্ম তাঁরা ব্যবহার করতেন। কিন্তু এই ধরনের চিকিৎসা তথাকথিত বিজ্ঞাপনধারী যৌনরোগ বিশেষজ্ঞরা করেন বলে জানা নেই।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ অমিতাভ মাইতির কথায়, এই ধরনের রোগে সবচেয়ে বড় ওষুধ স্বামী স্ত্রীর দু'জনের মানসিকতার আদান প্রদান। কারণ ব্যাপারটা স্বামী স্ত্রীর একেবারে নিজেদেরই। স্বামীর অসুবিধায় স্বাভাবিক ভাবে স্ত্রীর ওপর দায়িত্ব বর্তায়। প্রতিটি স্ত্রীকে তাই সদা সর্বদাই সচেতন থাকতে হবে। জাগিয়ে তুলতে হবে স্বামীকে। তার শক্তিকে। শৌর্য, বীর্যকে। ভালবাসার সঙ্গে সাহস দিতে হবে। নইলে শুধু ওষুধে এ রোগ সারে না।

যৌনরোগ প্রসঙ্গে কবিরাজ গুপ্ত বললেন, অনেক সময় স্বামীরা মনে করে যে স্ত্রীর কাছ থেকে সে প্রাপ্যটি যথাযথ ভাবে পাচ্ছে না। এর থেকে তাদের ভেতর এক ধরনের লজ্জাবোধ জন্মায়। স্ত্রী দিতে পারছে না, নাকি সেই নিতে পারছে না! এর সংশয়হীন উত্তর খুঁজে পাওয়ার একটা চেষ্টা মানসিকতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এক ধরনের ভেদাভেদ তৈরি হয়। স্বামীর ক্ষেত্রে দেখা যায় শৈত্য।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, চিকিৎসা বিজ্ঞানে যৌন রোগের প্রতিকারের সুনির্দিষ্ট উপায় থাকা সত্ত্বেও এইসব আনরেজিস্টার্ড হাতুড়ে যৌনরোগ চিকিৎসকদের খপ্পরে সাধারণ মানুষ পা বাড়াচ্ছে কেন? এর প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এদের ব্যাপক প্রচার। কলকাতার রাস্তাঘাটে চোখ পড়লেই কোন না কোন বিজ্ঞাপন দেখা যাবে যেখানে যৌনরোগ উপশমের জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারের নাম ঠিকানা লেখা আছে।

যৌনরোগ চিকিৎসক ডঃ লামা অবশ্য এই ধরনের রোগের উপশমের ব্যাপারে হান্ড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি দেন। তাঁর কথায়, এই ধরনের রোগ আমাদের সমাজে কলংকজনক। তাই রোগীরা তার রোগকে যথাসম্ভব গোপন করে রাখে। এবং ভেতরে ভেতরে এক রকম মরিয়া হয়ে ওঠে। ভাল মন্দ বিচার করার মানসিকতা থাকে না। একে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণীর অসাধু চিকিৎসকের নামে ওদের পাকড়াও করে। কলকাতায় এখন চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় শতাধিক।

কলকাতারই জনৈক ডাক্তার আবার এই চিকিৎসার জন্য অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁর কাছে চিকিৎসারত রোগীরা সুস্থ কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারটি আবার ভাড়া করা মেয়ে রাখেন।

যৌনরোগ আজ আমাদের সমাজে গোপনে গোপনে ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। এই আকার আরও বেড়ে চলছে অসাধু চিকিৎসকদের দৌলতে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই রোগ সারানোর যথার্থ উপায় তো আছে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমাদের প্রশাসকের ওপর বর্তায়। দিবালোকে সর্বসমক্ষে যেসব অসাধু যৌন চিকিৎসকেরা নির্দ্বিধায় হোয়াইট কালার ক্রাইম চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে কি কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না?

–রমাপ্রসাদ ঘোষাল

ছবি: সুস্মিতা চৌধুরী সহায়তা: তাপস মহাপাত্র

পাশ্চাত্য নাচের স্কুলগুলি : সন্দেহ কেন?
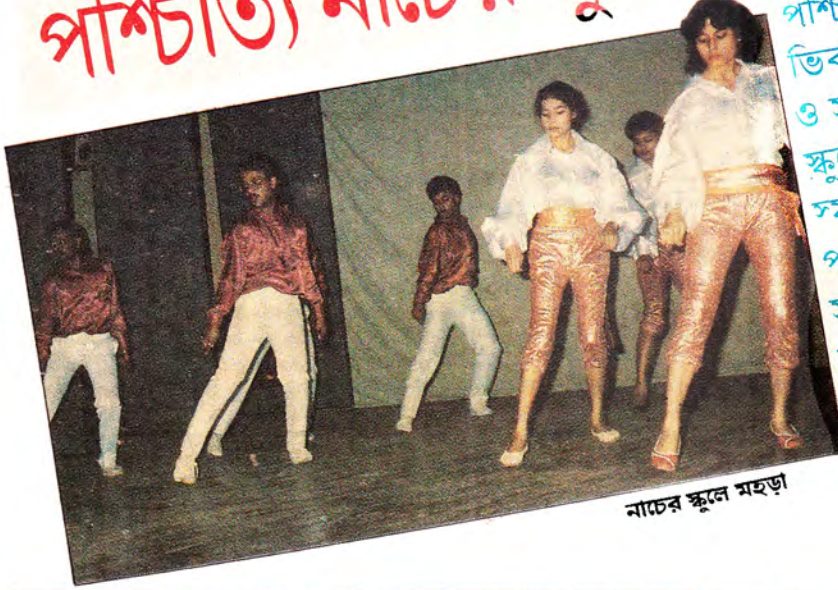
নাচের স্কুলে মহড়া

পাশ্চাত্য নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্রের ব্যানারে ভিক্টোরিয়া টেরাসের চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রশাসক ও সাংস্কৃতিক মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। নাচের স্কুলের নামে কলকাতায় তবে কি শরীরী স্ফূর্তির ব্যবসা জাঁকিয়ে উঠছে? কেনই বা পাশ্চাত্য নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্রগুলি আজ জনসাধারণের সন্দেহের কারণ? রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে ব্রেক ডিস্কো বিতর্কের পর পাশ্চাত্য নৃত্যের স্কুলগুলি নতুন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে কেন? পুলিশ রেকর্ড ও পাশ্চাত্য নৃত্যশিল্পীদের বক্তব্যসহ অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন।

পাশ্চাত্য নৃত্যকলার আকর্ষণে

৭৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

অনিল কাপুরের দিনরাত্রি

আমি আমার নিজস্বতা বজায় রাখতে চাই । অন্যান্য শিল্পীরা যে ধরনের রোল করে খ্যাতি পেয়েছেন সে ধরনের রোল করতে আমি মোটেই লালায়িত নই ।

এই কথাগুলি অনিল কাপুরের । তিনি এখন দুঃসাহসিক ভাবে চেষ্টা করছেন একটি বহুমুখী ইমেজ তৈরি করার । প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধুমাত্র একজন স্টার হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চান না । তিনি এমনই একজন শিল্পী হয়ে উঠতে চান যিনি বিভিন্ন ধরনের চরিত্র রূপায়ণে সমানভাবে সক্ষম । চরিত্র, পরিচালক, ব্যানার ইত্যাদি পছন্দ করে যে ভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন তাতে আশা করা যায়, আজ অথবা কাল তিনি তা হয়ে উঠতে পারবেন । পরিচালক কে. বিশ্বনাথ–এর 'ঈশ্বর' ছবিটিতে একটি ভিন্ন

ছবি : তায়েব বাদশা

ধরনের অনবদ্য চরিত্রে অভিনয় তাঁর ক্যারিয়ার তৈরিতে একটি দিকচিহ্ন। এবং এই ছবিটি তাঁকে এক নতুন ধরনের ইমেজ দিয়েছে। এর অব্যবহিত আগে 'তেজাব' ছবিটি তাঁকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দিয়েছে, যা তাঁর পক্ষে বিগত বছরগুলিতে ছিল অকল্পনীয়।

'মিঃ ইণ্ডিয়া' ছবিটিতে অনিল অভিনয় করে-ছিলেন। কিন্তু সেখানে সমস্ত কৃতিত্বই ছিল শ্রীদেবীর। আসলে ঐ ছবিটিতে অনিলের কিছু করার ছিল না। যেন শ্রীদেবীকে মনে রেখেই নায়িকার চরিত্রটি তৈরি হয়েছিল। আর প্রত্যেক নতুন নায়কই শ্রীদেবীর সঙ্গে অভিনয় করায় যথেষ্ট আগ্রহী। অনিলও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। ছবিটির লেখক জাভেদ এবং পরিচালক শেখর কাপুর ছবিটির জন্যে শ্রীদেবীর কথাই ভেবেছিলেন, অনিলের কথা ততো ভাবেননি। কারণ, তাঁদের লক্ষ্য ছিল বক্স অফিসের দিকে যা শ্রীদেবীই একমাত্র ফাঁপিয়ে তুলতে পারেন। অনিল নায়ক হিসেবে তখনও খুব একটা গুরুত্বের মধ্যে আসেন না।

আকস্মিকভাবেই 'তেজাব' এবং 'রাম—লক্ষণ' হিট করল। এবং সমস্ত কৃতিত্বই অনিলের শূন্য ভাঁড়ারে জমা পড়ল। রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। শুধু তাই নয় তিনি এখন থেকেই তাঁর অন্যতর ইমেজ তৈরির জন্যে সঠিক চরিত্রটি বিচক্ষণতার সাথে বাছাই করতে শুরু করলেন।

তাঁর দুর্দিনের সময় তড়িঘড়িতে সই করা কিছু ছবিও তিনি বাতিল করেছেন কিছুদিন আগে। এবং সাইনিং এ্যামাউন্টও ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। কারণ ছবিগুলিতে যে সব সহশিল্পী নেওয়া হয়ে-ছিল তাঁদেরকে তাঁর পছন্দ হয়নি কিংবা অন্যগুলিতে তাঁর বর্তমান সুপারস্টার ইমেজ ক্ষুণ্ণ হবার আশংকা ছিল।

—আপনি কি নিজেকে নাম্বার ওয়ান স্টার ভাবতে শুরু করেছেন। এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বল-লেন, 'এটা আমার বলার ব্যাপার নয়। সকলেই বলতে শুরু করেছেন যে, আমিই পরবর্তী সুপার-স্টার। আমি যে ধরনের চরিত্র করতে ভালবাসি, আমার সেই নিজস্ব গণ্ডিতে আমি এক নম্বর হতে চাই। আমি আমার নিজস্বতা বজায় রাখতে চাই। অন্যান্য শিল্পীরা যে ধরনের রোল করে খ্যাতি পেয়ে-ছেন সে ধরনের রোল করতে আমি মোটেই লালা-য়িত নই। অর্থাৎ আমার বক্তব্য হল, অন্য নায়করা যা করেছেন আমি তা নকল করতে চাই না। অন্য নায়কদের সঙ্গে আমাকে বা আমার সঙ্গে অন্য নায়কদের তুলনার সুযোগ না দিয়ে আমি যদি নিজস্ব ইমেজের উন্নতি ঘটাতে চাই তাতে ভুল কোথায়?

তা ছাড়া, আমি যা করেছি কঠোর পরিশ্রম দিয়েই করেছি। সে কারণেই 'ঈশ্বর' ছবিতে রোলটি নেবার সাহস করেছিলাম। তখন তো আমার কোন গ্ল্যামার ছিল না। আমি যেখানে এ ছবিটিকে পৌঁছে দিয়েছি সে দায়িত্ব নিতে এত সাহসী কে হত?

নিশ্চয়ই একজন শিল্পীর পরিচিতি নির্ভর করে বক্স অফিস কতটা রিটার্ন দিতে পারে তার ওপর। আমার অনুরাগীরা আছেন এবং তাঁদের জন্যেই আমি অভিনয় করি। অনুরাগীদের নিজস্ব পছন্দ

অনিল কাপুর, অমৃতা সিং
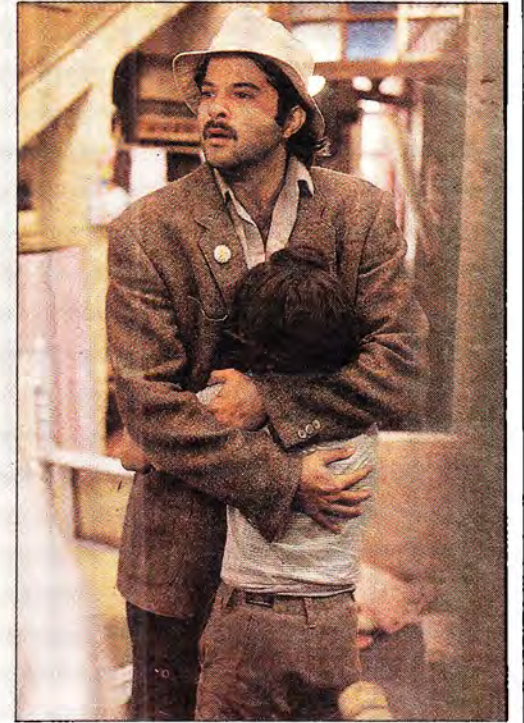
ক্যারিয়ারের রাস্তায় কতটা এগোচ্ছেন?

এবং ইচ্ছা আছে, এবং যাঁরা আমার ছবি দেখতে যান আমি তাঁদের খুশী করতে চাই। যদি আমি অন্যকে অনুকরণ করি বা তাঁরা যে ধরনের রোল করেন সে ধরনের রোল করি তাহলে আমার অনুরাগীরা নিশ্চয়ই হতাশ হবেন।'

তাহলে কি ধরনের চরিত্রে তিনি অভিনয় করতে চান? এমনি একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, সেভাবে নির্দিষ্ট কিছু নয়। তবে চরিত্রটি যেন যথেষ্ট শক্তিশালী হয় যেখানে তিনি কিছু কাজ দেখাতে পারেন। তাঁর মতে, একটি ভাল চরিত্র

ছাড়া একটি ছবিতে একজন অভিনেতার কাজ দেখানোর সুযোগ কোথায়। এ ব্যাপারে তিনি একটি উদাহরণ দিলেন। 'গোলাপ যদিও গোলাপই। কিন্তু তার ফুটে ওঠার জন্যে এক বিশেষ ধরনের মাটির দরকার হয়। সেইরকম, একজন অভিনেতাও বিকশিত হতে পারে, একটি ভাল গল্প, একজন ভাল পরিচালক ছাড়াও একটি ভাল চরিত্র পেলে।'

একটি ছবিতে একজন অভিনেতা কি পরিচালকের নির্দেশ মান্য করেন মাত্র? এর উত্তরে, অনিলের বক্তব্য, 'হ্যাঁ আবার নাও। হ্যাঁ এইজন্য যে, যদি ছবির বিষয়বস্তুতে সত্যিই ভাল কিছু থাকে তবে

শ্রীদেবীর সঙ্গে অনিল কাপুর

পরিচালক একজন অভিনেতার কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিতে পারেন। আর ছবির বিষয়বস্তু যদি অন্তঃসারশূন্য হয় তবে যত ভালই পরিচালক হন তিনি ভাল অভিনেতাকে দিয়ে কি করালেন তাতে কিছুই যায় আসে না। আমি বলতে চাইছি, অভিনেতা পরিচালকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুবই জরুরী। আর একজন অভিনেতাকে পরিচালকের নির্দেশ তো মানতেই হবে।'

আপনি যে সব রোলে অভিনয় করেন তাতে কি আপনার ফেলে আসা জীবনের প্রভাব পড়ে? 'নিশ্চয়ই। আমার পনেরো বছর বয়েস পর্যন্ত এক নিম্নমধ্যবিত্ত এলাকায় একটা এক ঘরের ফ্ল্যাটে আমরা থাকতাম। সত্যি বলতে কি একটা অত্যন্ত ঘিঞ্জি অঞ্চলেই থাকতাম। সে কারণেই জীবনে সংগ্রামের মূল্য কি তা বুঝি। আর যেহেতু মুখে রূপোর চামচ নিয়ে জন্মাইনি তাই এক সময় লড়াইয়ে জেরবার হয়ে হতাশায় ডুবে গিয়েছিলাম। পারিবারিক জীবন থেকে অনেক সাহায্যই পেয়েছি। কিন্তু মূলত বাইরের জীবনের এই বঞ্চনা ও হতাশা থেকেই নিশ্চিতভাবে আজ আমার অভিনয়ে গভীরতা এসেছে। এই মাটির কাছাকাছি বাস করার জীবনই আমি প্রতিফলিত করেছি 'তেজাব'–এ। আমি নিজেও যে লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও বেকারিতে ভুগেছি!

এন. চন্দ্র 'তেজাব' করার সময় আমায় বলেছিলেন যে, তিনিও তাঁর ফেলে আসা জীবনে বেকারির যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। শুধু তিনিই নন যেখানে তিনি থাকতেন সেখানেও লোককে দেখেছেন এই চাকরীহীনতায় ভুগতে। সুতরাং পরিচালক এবং অভিনেতার একই ধরনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলনই যে ঘটেছে 'মুন্না' চরিত্রটিতে সেটা মানতে আপত্তি কোথায়?'

অভিজ্ঞ দক্ষিণী পরিচালক বাপু–র ছত্রছায়ায় অনিল আস্তে আস্তে বিকশিত হয়েছেন। সে দিক থেকে তিনি ভাগ্যবান। আসলে, অনিলের ফিল্ম কেরিয়ার শুরু হয় তেলেগু পর্দা থেকে। তারপর 'একবার কহো' ছবিতে অভিনয় করেই তিনি হিন্দি চিত্র জগতে প্রবেশ করেন।

সেটা এমন একটা সময়, যখন হিন্দি ছবিতে আসছেন অতীতের দিকপাল অভিনেতাদের ছেলেরা–ঋষি, কুমার গৌরব, সানি দেওল, সঞ্জয় দত্ত। অনিলের বাবা সুরিন্দর কাপুর ছিলেন শাম্মী কাপুরের একজন সেক্রেটারি। পরে ফিল্ম প্রডিউসার হওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন। তবে বলা যায়, অনিল চিত্র জগতের আবহাওয়ার মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু রাজকাপুর, ধর্মেন্দ্র বা সুনীল দত্তের মত তো বহুল পরিচিত কেউ নন। তাঁর মধ্যে চিত্রজগতে আসার ইচ্ছা জাগে যখন তার বাবার

'পরিন্দা' ছবিতে অনিল কাপুর, মাধুরী দীক্ষিত

'রাম অবতার' ছবিতে সানি দেওলের সঙ্গে

প্রডিউস করা একটি ছবির পরিচালক 'বাপু'র সহকারী হিসেবে তিনি কাজ শুরু করেন। সে সময় অনিলের মনে হিরো হবার বাসনা ছিল না। বাপুই এই বাসনা তার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

অনিল বললেন, 'তখন মজহর খান ছবি করে বিরাট সাফল্য পেয়েছেন, যদিও এ লাইনে তাঁর কোনও খুঁটি ছিল না। সেটাই আমার মনে একটা দৃঢ়তা এনে দিয়েছিল যে, আমিও পারবো। একটা সিদ্ধান্ত আমি শুরুতেই নিয়ে নিয়েছিলাম। আমি প্রধান ভূমিকাতেই অভিনয় করবো এবং তা যদি না পাই এ লাইন ছেড়ে হয় গল্প লিখবো নয় যে কোনও ব্যবসা করবো, তবু ছোটখাট কোনও চরিত্রে অভিনয় করবো না। এতে আমার কেরিয়ার সায় দেয়নি তবু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম।'

এই সময় যশ চোপড়া তাঁর 'মশাল' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে অনিলকে প্রস্তাব দেন। এটা কিন্তু যশ চোপড়ার প্রথম নির্বাচন ছিল না। সানি দেওলকেই প্রথমে সেই রোলটি দেওয়া হয়েছিল। পরে তা পান অনিল কাপুর। পরে আবার কমল হাসানকে তা দেওয়া হল। তিনিও ঐ রোলটি ঠিকমত করতে পারলেন না। শেষমেশ অনিলকেই নির্বাচন করা হল কেননা ছবিটি বেশিদিন আর অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। শেষমেষ অনিলকে দিয়েই ঐ রোলটি করানো হল।

ঐ সময়েই সানি এবং জ্যাকি শ্রফও যথাক্রমে 'বেতাব' এবং 'হিরো' ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সুতরাং সানি, জ্যাকি ও অনিল তিন নতুন অভিনেতা পরস্পরের প্রতিযোগী হয়ে উঠলেন।

তিনটি ছবি মুক্তি পাওয়ার পর, অনিল পেলেন মামুলি অভিনেতার স্বীকৃতি, আর অন্য দুজন রাতারাতি পরিণত হয়ে গেলেন তারকায়।

'কিছু পত্রপত্রিকা এবং সিনেমা শিল্পের কিছু মানুষের কাছে আমি সমালোচিত, অবহেলিত হলাম। কিন্তু সে সবই আমাকে লক্ষ্যে পৌঁছতে, আরও কঠিন পরিশ্রম করতে শেখালো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, রেসের ঘোড়া যেমন ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে মাথা সোজা রেখে দৌড়োয়। তার লক্ষ্য থাকে শুধুমাত্র বিজয়সীমার দিকে। আমিও ঠিক তাই করব।'

আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীরা দুহাতে ছবির জন্যে সই করছেন কি করে? আপনি কেন পারছেন না?

'আমি অত লোভী নই। আমার ছবির কোটা এখন পূর্ণ। তাছাড়া একজন আর কত চাইতে পারে। আমার পদক্ষেপ মাপা। আমার প্রতিটি অধ্যায় দৃঢ় এবং আমার ফ্লপ ছবির সংখ্যাও পরিমিত। সত্যি বলতে কি, আমার ছবি সুপার ফ্লপ করেছে খুবই কম, যেখানে অন্য কয়েকজনের ভুরিভুরি। আমার ক্ষমতানুযায়ী সবচেয়ে ভাল কাজ করছি এবং আমি আমার নিজস্বভাবে অনুশীলনও ঠিক ঠিক চালিয়ে যাচ্ছি। আমার হাতে যে ছবিগুলি রয়েছে তার গুনগত দিকটাই জানতে আগ্রহী, কটা ছবিতে সই করেছি তার সংখ্যা নিয়ে কোনও আগ্রহ আমার নেই।'

প্রযোজক এবং পরিচালকরা অন্যদের ছেড়ে আপনাকে পছন্দ করেন কেন?

'সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তাঁদের জিজ্ঞেস করুন। নিশ্চয়ই তাঁরা আমার মধ্যে কিছু দেখেছেন।'

আপনি কি মনে করেন, নিজস্ব স্টাইল দিয়ে এক অনন্য পরিচিতি আপনি বজায় রাখতে পেরেছেন?

'এখনও তো তেমন কিছু করতে পারিনি বলেই মনে হয়। গত দেড় বছরে বহু ছবির অফার এসেছে যেখানে পরিচালকরা বলেছেন, তাঁরা শুধু আমাকেই চান। তাঁরা এমনও বলছেন, আমার সময় না হলে তাঁরা অপেক্ষা করতেও রাজি আছেন। ভাববেন না, এটা আমার বড়াই। আমার কাছে এটা তো বিস্ময়ের ব্যাপারই।'

যাঁরা এককালে আপনাকে সাহায্য করেছেন তাঁরা বলেন আপনি সুযোগসন্ধানী এবং আপনার কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। জাভেদ তাঁর ছবিতে প্রথম আপনাকে একটা ব্রেক দেন। তাঁর এখন খুব খারাপ সময় যাচ্ছে, আর আপনি সুযোগ দিচ্ছেন সেলিমকে!

'এটা সত্যি যে জাভেদ সাহেব 'মশাল' ছবিতে আমাকে সুযোগ দিয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটা সময় তিনি আমার দিকে মোটেই তাকান নি। বিশ্বাস করুন বা না করুন, দুটো ছবিতে তিনি আমাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তখন তিনি কানোয়ালজিতকে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। 'কাঁহা কাঁহা সে' দেখার পর তিনি অবশ্য আমার সম্পর্কে মত বদলেছিলেন। আর আমি তো তাঁকে আগাগোড়াই শ্রদ্ধা করি।

একমাত্র আমিই যে তাঁর পছন্দের শিল্পী তা নয় তবু আমাকে নিয়ে তিনি যে ছবি করেছেন সেটা ভাগ্য বলেই মানি। আর আমি এমন অবস্থায় এখনও নিশ্চয়ই পৌঁছোইনি যে কোন ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করব আর কার সঙ্গে করব না সেটা আমার মর্জির ওপর নির্ভর করবে। আমি অনেকের সঙ্গেই কাজ করেছি, সহযোগিতা পেয়েছি, আনন্দও পেয়েছি। তাঁরা যদি আমাকে আবার তাঁদের ছবি করার জন্যে ডেকে নেন সেটা হবে প্রথমত তাঁদের মহানুভবতা এবং তারপর, আমার অভিনয় ক্ষমতা...।'

কৃষ্ণ

ছবি: তায়েব বাদশা, রজনীকান্ত

৬৯ পৃষ্ঠার পর

পুরনো সিস্টেমকে ভেঙে বর্তমানকে নিজের মত করে নেওয়ার বৈজ্ঞানিক ধারাটি শুধ জীবনের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের সমাজও তার বিলক্ষণ পৃষ্ঠপোষক। আসলে জীবন ছাড়িয়ে জীবনের ওতপ্রোত সব কিছুর মধ্যেই ডারউইন যুগ যুগান্তর বয়ে চলেছেন। চলেছেন সংস্কৃতির মধ্যেও। তাই এবছর ২৫ বৈশাখে সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ১২৮ জন শিল্পীকে নিয়ে কবিপ্রভাতে রবীন্দ্র সংস্কৃতির মত আমাদের অতি রক্ষণশীল সংস্কারকেও ধুইয়ে দিতে পেরেছেন ব্রেকড্যান্সের ঝর্ণা ধারায়।

সেই সত্তর দশকের শুরুতে আমেরিকার কালো মানুষদের কলোনিতে ব্রেকের জন্ম হলেও তার ঢেউ প্রাচ্য–পাশ্চাত্যের পাঁচিল ভেঙে আছড়ে পড়েছে আমাদের দেশেও। ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতার গুলিগলিতে। কালো সাদা–বাদামী–হলুদ সকল তরুণতরুণীদের সঙ্গে মিশে এই পাশ্চাত্য কলাটি আজ অ্যান্টি এস্টাব্লিশমেন্ট চেহারায় আমাদের সামনে একটি সুপারহিট কালচার। তার প্রভাব কতটা ব্যকরণ সম্মত সেটা অবশ্যই বলা কঠিন। তবে বাজারি প্রচারের ক্ষেত্রে মাইকেল জ্যাকসন-এর থ্রিলার ভিডিও ক্যাসেট যে তুমুল আলোড়নের বাহক তা অবশ্যই বলা যায়।

এত সবের পরও তবু ব্রেক ডিস্কো একটি ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাও ভেঙে পড়ল এবার ২৫ বৈশাখে, সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের রূপকল্পের ভ্রাম্যমান রবীন্দ্রোৎসবে ব্রেকড্যান্সের বিতর্কিত ব্যবহার নিয়ে। সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ও পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন...'রবীন্দ্রনাথ কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আসলে সমালোচনা তাঁরাই করেছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে মানুষ হিসেবে না চিনে দেবতা ভাবেন, এক অর্থহীন পুজায় মেতে থাকেন। আর মনে করেন কবিগুরু তাঁদের একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। 'শেষের কবিতা'য় তিনি অমিতের মুখ দিয়ে তো বলেছেন 'পুজো জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মত অপবিত্রতা, অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না।' তাই এমন মানসিকতাপুষ্ট রবীন্দ্র–বিশেষজ্ঞদের রবীন্দ্র ব্যবসায়ী বলা আরও যুক্তিযুক্ত।'

এদিকে পাশ্চাত্য নৃত্যের এমন আগ্রাসী ভূমিকা দেখে আমাদের রক্ষণশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের আসন কেঁপে ওঠে। অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইতে প্রকাশ্যে এর নিন্দায় মেতে ওঠেন নিমাই সাধন বসু, অমলা শঙ্কর, সুচিত্রা মিত্র, শান্তিদেব ঘোষ, ভবতোষ দত্ত, সুপ্রিয় ঠাকুর প্রমুখ একালের বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা। বিতর্কের ঝড় ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত সাংস্কৃতিক মহলে।

সেই বিতর্ক আবার নতুন দিকে মোড় নিল গত ১৩ জুন '৮৯ ভিকটোরিয়া টেরাসের পাশ্চাত্য নাচের স্কুলের নাক্কারজনক ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে। আমাদের সংস্কৃতি মহল আঙুল তুলে ওয়েস্টান ড্যানসিং–এর বিরুদ্ধে চরম কু–প্রচারে নামলেন। আর সেই ঘটনাটিও পাশ্চাত্য নৃত্য কলার মুখে কালি লেপন করে জনসাধারণের সামনে এক বিকৃত রূপের দর্শন ঘটাল।

ভিক্টোরিয়া টেরাসের এই নাচের স্কুল চালাচ্ছিলেন ৮৮ বছরের বৃদ্ধ সামসুল হক ওরফে টোভে। এই স্কুলের ব্যাপারে লালবাজারের ইমমোরাল ট্রাফিক বিভাগে বেশ কিছু আপত্তিকর অভিযোগ আসায় ওসি তারিণী প্রসাদ সিং ১৩ জুন '৮৯ সন্ধ্যায় সাদা পোশাকে ভিকটোরিয়া টেরাসে হানা দিলেন। তারিণী প্রসাদবাবুর কথায়, সেদিন সন্ধ্যায় দূরে পুলিশ ফোর্স দাঁড় করিয়ে তিনি একাই স্কুলটির দোরগোড়ায় পৌঁছলে পাহারারত দারোয়ান ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়। তারিণী-

ভিক্টোরিয়া টেরাসের এই বাড়িতে নাচের স্কুলের আড়ালে চলত অন্যকিছু!

বাবু নিজের পরিচয় গোপন রেখে, তিনি নাচ শিখতে এসেছেন বলে জানান। এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে এক যুবতী মহিলা বেরিয়ে এসে দারোয়ানটিকে ধমক দিয়ে কাস্টমারকে বিরক্ত করতে বারণ করে। এবং সাদাপোশাকে উপস্থিত তারিণীবাবুকে জানায়, নাচ শিখতে হলে ৪০ টাকা লাগবে। তারিণীবাবুও তাই মেনে নেন। এদিকে দর দাম ইত্যাদির ব্যাগারে নির্ধারিত সময় কেটে যাওয়ায় অপেক্ষমাণ ফোর্সের দুই সাব ইন্সপেকটর জে.আর. কুমার ও এস.সি. রাওয়াৎ স্পটে এসে গেছেন। অতিরিক্ত দু'জনকে দেখে মেয়েটি বলে, আরও ৮০ টাকা লাগবে। তারিণীবাবুও নির্দ্বিধায় মোট ১২০ টাকা মেয়েটির হাতে তুলে দেন।

মেয়েটি তারিণীবাবু সমেত আরও দু'জনকে নিয়ে যায় দোতলার একটি ঘরে। ঘরের দরজা বন্ধ করতেই তারিণীবাবুর সন্দেহ আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তবুও তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানেই কি নাচ শেখানো হয়?' জবাবে মেয়েটি ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করে লাইট নিভিয়ে দেয়। তারিণীবাবুও এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাকড়াও করেন মেয়েটিকে। সংকেত পেয়ে অপেক্ষমাণ পুলিশফোর্স ঘিরে ফেলে বাড়িটি। তল্লাশি চালিয়ে চারজন সুন্দরী মহিলা সমেত মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেন তাঁরা। বাড়ির মালিক তথা স্কুলের প্রিন্সিপাল সামসুল হককেও গ্রেপ্তার করা হয়। সামসুল হক ছাড়া পুলিশের হাতে ধৃত অন্যান্যরা হল রামস্মরণ পাণ্ডে, মহম্মদ সাকীল, গোপাল আহুজা, অনিরুদ্ধ দত্তগুপ্ত, রবীন্দ্র হরলালকা, পি.ভি. মধুকুমার, চাঁদ রতন খেমকা, লীনা গোমস্‌, রমা নন্দী, মায়া ময়ূর, মায়া মাকাল। এদের সকলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয় পার্কস্ট্রিট থানায়। পার্কস্ট্রিট থানায় এদের বিরুদ্ধে ইউ/এস ৩৪৫ আই.পি. অ্যাক্ট-এ কেস জারি করা হয়। কেস নং-৩৪৩, তারিখ, ১৩.৬.৮৯।

তারিণীবাবু বলছিলেন, আশ্চর্যের ব্যাপার, স্কুলটির মালিক সামসুল হক একজন কোটিপতি। ভিকটোরিয়া টেরাসেই রয়েছে চারটি বিশাল বাড়ি। এছাড়াও ডালহৌসি স্কোয়ারে একটি বাড়িরও মালিক তিনি। তাঁর চার মেয়ে ও এক ছেলে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত। এত প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও সামসুল হক বহুদিন ধরেই নাচের স্কুলের নামে এই নিষিদ্ধ ব্যবসা চালাচ্ছিলেন।

কিছু দিন আগে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞাপনে বলা ছিল– 'মহিলা ট্রেনার দিয়ে সব রকমের পাশ্চাত্য নাচ শেখানো হয়।' এই বিজ্ঞাপনের টানেই পয়সাওয়ালা লোকেরা নাচের স্কুলে পাড়ি জমায়। তাদের সঙ্গে এক এক জন করে সুন্দরী দিয়ে এক একটি ঘরে পাঠানো হত। তারপর ১৫০/২০০ টাকার বিনিময়ে তারা নাচের বদলে ফূর্তি করে ফিরে যায়। এই উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে বেশ কিছু সুন্দরী তরুণীকেও এনে

'মে ফেয়ার' এর নৃত্যপ্রশিক্ষক সন্দীপ মিত্র

রাখা হয়েছিল। যাই হোক, স্কুলের নামে এই ধরনের অবৈধ কার্য কলাপ চালানোর ঘটনা পুলিশের খাতায় এই প্রথম। যে জন্যই এই অভিনব পদ্ধতিতে এ ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ ইমমোরাল ট্রাফিক বিভাগকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। কানাঘুষো খবরও আসছে, স্কুলের নামে এ ধরনের কারবার বহু জায়গায় চলছে। বিশেষ করে পার্কস্ট্রিট রাসেলস্ট্রিট, ফ্রি স্কুলস্ট্রিট এলাকায় এই পদ্ধতিতে কাঁচা টাকা ইনকামের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাল আমলে পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা ওয়েস্টার্ন ড্যানসিং স্কুলগুলির সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যেও সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। ফলে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও যাঁরা সত্যি স্কুলের আদর্শে নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলেছেন তারাও বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়েন। তাই এর প্রতিক্রিয়া জানতে হাজির হলাম রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর 'সুরতীর্থ'-তে। কথা হচ্ছিল প্রখ্যাত পাশ্চাত্য নৃত্য শিল্পী বব দাসের সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, 'যে কোন শিল্পের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা খুবই লজ্জার। খুবই অপরাধজনক। তাই সামসুল হক নাচের স্কুলের নামে ফূর্তির কারবার চালিয়ে শিল্পের মুখে কালি ঢেলেছে।' কথাগুলি বলতে বলতে খানিকটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। বাংলা ফিল্মে পাশ্চাত্য নৃত্যের প্রসারের ক্ষেত্রে বব দাস এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রাণ-পুরুষও বটে। সেই পাহাড়ি সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া, সুচিত্রা থেকে হাল আমলের শতাব্দী, জয় ব্যানার্জী ছাড়াও বহু গুণিজনের গুরু তিনি। এখন তিনি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর 'সুরতীর্থ'-তে পাশ্চাত্য নৃত্যের শিক্ষক।

অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে শিল্পী বব দাস বলছিলেন, 'মেয়ে নিয়ে নাচের আড্ডায় কেবল ফূর্তির উদ্দেশ্যে যাতায়াত করার প্রবণতা অনেকের মধ্যেই দেখেছি। এই তো কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি দু'লাখ টাকা খরচ করে একটি পাশ্চাত্য নৃত্যের স্কুল গড়ার জন্য খুব বায়না ধরেছিলেন। সেখানে মোটা টাকার বিনিময়ে শুধু আমার নামটাই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আমি তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলাম কোন রকম উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বদ মনোভাব পোষণ করা চলবে না। সেই ব্যক্তি অবশ্য আমার এই কথায় পিছিয়ে যান। কারণ তাতে তার ব্যবসাটাই মার খাবে।

আসলে আমি একজন শিল্পী। এই ৬৮ বছর বয়সেও আমি নাচ চালিয়ে যাচ্ছি। নাচই আমার মন প্রাণ। সেখানে টাকার লোভে আমি আমার শিল্পকে বিকিয়ে দিতে পারি না। যেমনটা হাল আমলে বেশ চলছে দেখছি। এই কলকাতার গুলিতে-গলিতে নির্লজ্জ ভাবে শিল্পকে সামনে রেখে আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে বসছে মদ-মেয়ের আড্ডা। নারী-ফূর্তি চলছে। নাচের স্কুলের টাকা উড়ছে। এমন চলতে থাকলে যে কোন সংস্কৃতিই বিপন্ন হবে। সে প্রাচ্যেই হোক আর পাশ্চাত্যেই হোক। সুতরাং শিল্পের বিকৃত রূপটাই সংস্কৃতি বিপন্নতার উৎস। প্রাচ্যের জন্য পাশ্চাত্য কিংবা পাশ্চাত্যের জন্য প্রাচ্য সংস্কৃতি কখনওই বিপন্ন হয় না। বিপন্ন হয় এই সামসুল হকের মত মানুষের নির্লজ্জ মানসিকতার জন্য। আর এই ধরনের লোকেই আজ আমাদের সমাজে ছেয়ে গেছে। বিশেষ করে পার্কস্ট্রিট এলাকায়। সেখানে দেখবেন ওয়েস্টার্ন ড্যান্সিং-এর আসরে কেমন রমরমা শরীরী-ব্যবসা চলছে।'

'মে ফেয়ার'-এর ক্লাসরুম। ডেক কাঁপিয়ে চলছে মডার্ণ টকিং গ্রুপের ডিস্কো মিউজিক। ছাত্র-ছাত্রীরা 'ইউ অব মাই হার্ট, ইউ অব মাই সোল...'

'সিলভার স্টার'-এর টিটো দে
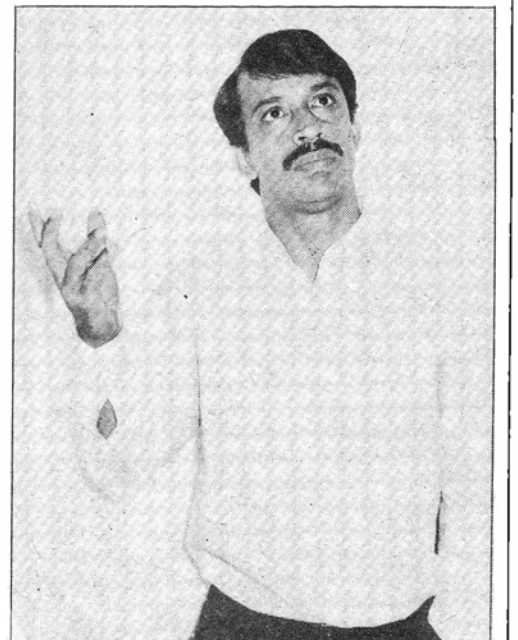
এর তালে তালে ডিস্কো –ব্রেক–এ মশগুল। ৪০/৪ গড়িয়াহাট রোড (সাউথ)–এর এই পাশ্চাত্য নৃত্যের স্কুলটি সে সময় সুদূর ইউরোপীয় কিংবা আমেরিকার আবহাওয়া বইয়ে দিচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন স্কুলের শিক্ষক সন্দীপ মিত্র। বয়সে তরুণ। খুব আন্তরিকও। স্কুলের প্রিন্সিপাল অচ্যুত দাস ইউরোপে থাকায় সন্দীপবাবুর সঙ্গেই কথা হচ্ছিল। তার কথায়, 'ওয়েস্টার্ন ড্যান্সিং–এর জোয়ারে আমাদের সংস্কৃতি বিপন্নতার কথা উঠছে ঠিকই, কিন্তু এমন অভিযোগের পেছনে অভিযোগকারীদের নিছক গোঁড়ামি কাজ করছে। আমাদের কত্থক, মনিপুরী কিংবা ভরতনাট্যম–এর মতই ওয়েস্টার্ন ড্যান্সিং–এর বলরুম, লাতিন সম্পূর্ণ ক্ল্যাসিক ড্যান্স। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এর বিকৃত রূপটাই প্রকট। তাঁরা মনে করেন পাশ্চাত্য নৃত্য মানেই রাস্তাঘাটের বিকৃত ডিস্কো ব্রেক ইত্যাদি। যা কেবল উচ্ছৃঙ্খলতা ও উচ্ছাস মাত্র। আর এরই সুযোগ নিয়ে কলকাতারই কিছু কিছু স্কুল এমন নোংরা ব্যবসায়ে নেমেছে যাতে সংস্কৃতি বিপন্নতাটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

আমি তেমন কোন স্কুলের নাম করতে চাই না, কিন্তু এও বলতে পারি আজ কলকাতায় ব্যাঙের ছাতার মত এমন বহু স্কুল গজিয়ে উঠলেও তাদের মধ্যে অল্প কয়েকটিই কেবল শিল্পের কথা ভাবে। কারণ শিল্পকে যখন কেউ ব্যবসার চোখে দেখে সেখানে ব্যবসাটাই মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পের নামে চলে আমোদ প্রমোদের খেলা। ভিক্টোরিয়া টেরাসের সামসুল হক হয়তো সেই ব্যবসার দিকে নজর দিয়েছিলেন, হয়তো ভাবছিলেন নাচ শিখিয়ে পয়সা পাওয়া যাবে না। যার জন্য এমন একটা ঘৃণ্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন। এই নাচের স্কুল চালাতে গিয়ে আমিও দেখেছি নাচ শিখতে আসা

সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়
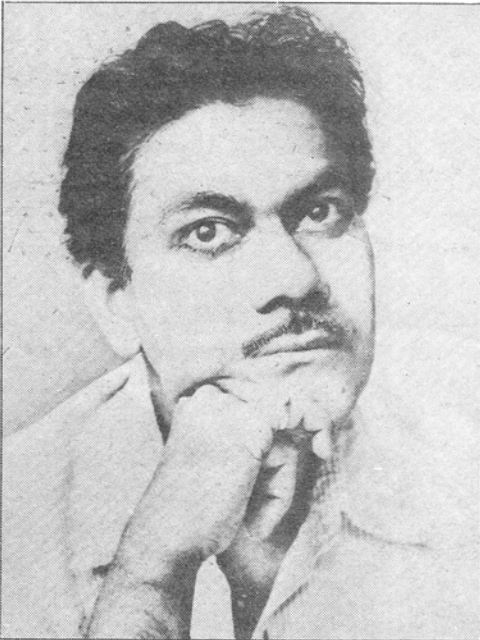
ও.সি.টি পি সিংহ

বহু ছেলেদের মধ্যে তেমন একটা আমোদ প্রমোদের প্রবণতাও থাকতে। তাদের একমাত্র কৌতূহল কতজন মেয়ে পার্টনার আছে সঙ্গে। শুধু ব্যবসার খাতিরে সেই প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিলে তার মারাত্মক পরিণামের উদাহরণ হিসেবে আমরা অন্তত সামসুল হকের নাম করতে পারি।'

কলকাতায় ওয়েস্টার্ন ড্যান্সিং স্কুলগুলির মধ্যে খুবই পরিচিত নাম 'সিলভার স্টার'। লিণ্ডসে স্ট্রিটে এই স্কুলটি সেই ১৯৪৬ থেকে চলে আসছে। শুরু করেন কলকাতায় পাশ্চাত্য নৃত্যের কিম্বদন্তী শিল্পী পিটার দে। পিটার দে–র মৃত্যুর পর এই স্কুলটির প্রিন্সিপাল তাঁরই ছেলে টিটো দে। সঙ্গে আছেন ভাই মাণিক দে। সম্প্রতি ভিক্টোরিয়া টেরাসের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এই সমস্ত স্কুলের প্রতি সাধারণ মানুষেরা কি মনোভাব পোষণ করছেন সে ব্যাপারে টিটো দে বললেন, 'এ সব ঘটনার কোন ছাপ আমাদের ওপর পড়ে না কারণ যাঁরা সত্যিকারের নাচ শিখতে আসেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন কোথায় কেমন পরিবেশ। আমার স্কুল সেই '৪৬ সাল থেকে চলে আসছে। এত পুরানো এই ধরনের নাচের স্কুল আর আছে কোথায় ?'

টিটো দে খুব জোর গলাতেই বললেন, 'এই ধরনের নাচের স্কুলকে কেন্দ্র করে কলকাতায় আজকাল মধুচক্র গড়ার হিড়িক উঠেছে। নাম প্রকাশ না করেই বলছি, পার্কস্ট্রিট পাড়ায় এমন মধুচক্রের আড্ডা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। আমার মনে হয় অনেকে মনে করেন ওয়েস্টার্ন ড্যান্স মানেই এক ধরনের আমোদ প্রমোদের আখড়া। রাস্তাঘাটে উৎসব অনুষ্ঠানেও দেখা যায় ওয়েস্টার্ন ড্যান্সকে বিকৃত করে ছেলেমেয়েরা এক ধরনের কদর্য নাচে মেতে ওঠে। কিন্তু ওয়েস্টার্ন ড্যান্সও যে ইস্টার্নের মত ক্ল্যাসিক শিল্প ছাড়া আর কিছু না সে জ্ঞান আর ক'জনের মধ্যে আছে ! তাই শিল্পের বিকৃত রূপটাই এই সমস্ত মানুষদের অপরাধের দিকে নিয়ে যায়। টাকার লোভে শিল্পীরাও মেনে নেন সেসব। সামসুল হকও হয়তো সেভাবেই এই ধরনের কুপথে পা বাড়িয়েছিলেন। এবং এখনও যারা গোপনে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের সম্পর্কেও এই একই যুক্তি দেখানো যেতে পারে। তাই আমাদেরও খুব নজর রাখতে হয়, যাতে ওই ধরনের প্রবৃত্তি এখানকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে না জন্মায়। আর এই শৃঙ্খলার জন্যই আমাদের স্কুল ৪২ বছর ধরে সমান তালে এগিয়ে চলেছে।'

এই ধরনের পাশ্চাত্য নৃত্যের স্কুলগুলির মধ্যে 'কার্ণানি ম্যানসনের' 'সোনরাস ড্যান্সিং স্কুল'–এর ব্যাপারে বহু আপত্তিকর অভিযোগ শোনা যায়। এই প্রতিবেদকও সোনরাস–এর প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি। এমন কি নামটিও বলতে চাননি। আশ্চর্যের কথা, নাচের স্কুলের প্রিন্সিপাল নাম বলতে এত ভয় পান কেন ? খোঁজ নিয়ে জেনেছি প্রিন্সিপালের নাম মি. মুন্‌জি। মিসেস খান্না নামে এক মহিলা স্কুলটির মালকিন।

বস্তুত সত্তর দশকে সারা বিশ্বব্যাপী হিপিদের ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্টার্ন কালচারের সঙ্গে ওয়েস্টার্ন ড্যান্সও প্রায় প্রত্যেক দেশে ব্যাপক পরিচিতির পথে পা বাড়ায়। আর সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে ওয়েস্টার্ন ড্যান্স শিল্পগুণ হারিয়ে একটি ক্লাসের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের উদাহরণ হয়ে পড়ে। নাইট ক্লাব প্রোগ্রামগুলি আমাদের মনে যে ধারণা সৃষ্টি করেছিল তা যে এখন ক্লাব, হোটেল ছাড়িয়ে নাচের স্কুলগুলিকেও গ্রাস করেছে তা নিশ্চয়ই ভিক্টোরিয়া টেরাসের ঘটনা প্রমাণ করে। তাই শিল্পকে উপেক্ষা করে জিন্‌স ও নর্থ স্টার মার্কা জুতোর সঙ্গে ব্রেক–ডিস্কোর কলা কৌশল যে কেবল শরীর সুখের আদব কায়দা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। কারণ পশ্চিমী স্রোতের টানে এক শ্রেণীর এলিট পরিবারের উঠতি তরুণ তরুণীরা এখন আর কিছু না হোক হিপিদের উচ্ছৃংখল জীবনযাপনের নেশায় মশগুল। তাই ব্যাকরণ তোয়াক্কা না করেই তাদের মনে এই ধরনের নৃত্যকলা কেবল জিন্‌স, নর্থ স্টার, ঢোলা জামা, টুপি সর্বস্ব নয়, এক বাঁধন হারা শরীর স্বাদের খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই উচ্ছৃংখলতাকে মদত দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে পড়ে একদল সুযোগসন্ধানী লোক। উপযুক্ত এলাকাগুলিতে গড়ে তোলে ওয়েস্টার্ন ড্যান্সিং–এর স্কুল। যেখানে শিল্পের নামে চলে অবাধ দেহ ব্যবসার রমরমা আসর। এই ধরনের ব্যক্তিদের দৌলতে পাশ্চাত্য নৃত্যের ক্ল্যাসিক ঘরানাটি আজ সত্যিই বিলুপ্তির দিকে দ্রুত এগোবে, যদি সেই বিকৃতি ও ব্যবসাকে বন্ধ না করা হয়।

তাপস মহাপাত্র

ছবি : আলেখ্যনীল গুপ্ত, বিকাশ চক্রবর্তী

চারণের চর্যাপদ

এ কালের চারণ কবি প্রভূত প্রতিভার অধিকারী নায়ক গায়ক সবিতাব্রত দত্তের জীবন কাহিনীর পাতায় পাতায় ঘটনার নানা চমক, অতীত ও বর্তমানে শিল্পকৃতির নানা কথা। শিল্পী সবিতাব্রতের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলির পূর্বাপর আলেখ্য।

আইন আদলতের ভেতরে থেকেও তিনি যখন সাংস্কৃতিক জগতে দাপিয়ে বেড়ান তখন সকলে অবাক হয়ে যান। তবে নিজের ভেতর দ্বন্দ্ব ছিল। বারবার চাকরি ছেড়ে চেয়েছেন পুরোপুরি শিল্পের সমুদ্রে ডুব দিতে। কিন্তু বাদ সেধেছেন হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ। বলেছেন, না, আপনি চাকরি ছাড়বেন না, কাজ করুন। আর এ কারণে সবিতাব্রত কাজ ছাড়তে চাইলেও কাজ তাঁকে ছাড়ে নি। তবে পরিবেশ ছিল অনুকূল। কোন বাধাও পান নি। শিল্প সাধনার সব রকম সুযোগ তিনি পেয়েছেন।

ছোটবেলায় আশপাশ ঘিরে ছিল এক দুরন্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশ। তখন বয়স ছিল খুব অল্প। বাড়ির সামনে বকুলতলা রোডে বসত যাত্রার আসর। বিনা টিকিটে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু নাটক পাগল কিশোর সবিতাব্রত তা না দেখে কিছুতেই থাকতে পারতেন না। দরজার সামনে ঘুরঘুর করছেন কিশোর সবিতাব্রত। হয়ত গেটরক্ষক বলত, 'খোকা তুমি যাত্রা দেখবে?' কিশোর তো এক কথায় রাজি। সুযোগ পেয়ে ঢুকে পড়তেন সেইসব আসরে।

সেই থেকে শুরু হল অভিনয়কে ভালবাসা। সেদিনের 'নদের নিমাই' যাত্রাপালার নিতাই চরিত্রটি নাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁকে। পরবর্তী কালে যখন 'নিতাই' চরিত্রাভিনেতা ঋষিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে তখনই খ্যাতিমান সবিতাব্রত সবিনয়ে বলেছেন আপনার ঋণ আমি জীবনে ভুলব না, আপনার সেই অভিনয়, গান আমার মনে কিশোর বয়সে অনুরণন তুলেছিল। সেই সুবাদেই আজ আমি এখানে পৌঁছলাম। এরকমটা সহজে হয় না। খ্যাতির বিড়ম্বনা তো আছেই। তাছাড়া কোন মানুষ মান যশ খ্যাতি পেলে অতীতকে ভুলে যান। সবিতাব্রতের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যতিক্রম। অকুণ্ঠ চিত্তে শ্রদ্ধেয়দের শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন বলেই অন্যদের থেকে শ্রদ্ধা পেতে তাঁর সেরকম অসুবিধে হয় নি।

সবিতাব্রত দত্ত ১৯২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মেছিলেন। বাবা সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বীমা জগতের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। যেমন অসাধারণ বেহালা বাজাতেন তেমনি পারদর্শী ছিলেন অভিনয়ে। স্বয়ং অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'হারায়ে খুঁজি' বইটিতে সুরেন্দ্রনাথের অভিনয় ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। গান, বাজনা, নাটক দত্ত পরিবারের রক্তের মধ্যে মিশে ছিল। সবিতাব্রতের এক দিদি কল্যাণী দত্ত তখন নামী সঙ্গীত শিল্পী। তাঁকে গান শেখাতে আসতেন শিক্ষক। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সবিতাব্রত তন্ময় হয়ে সেই গান শুনতেন, শেখার চেষ্টা করতেন। আর তখন থেকেই গান গাওয়ার শুরু।

তখন রেডিওতে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বিনোদ গাঙ্গুলী গান শেখাতেন। কিশোর সবিতাব্রত রেডিওর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের সঙ্গে গলা মেলাতেন। এইভাবেই গান দখল করে নিল তাঁর মনপ্রাণ। এছাড়া বাবা সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বেহালার সুরও কিশোর সবিতাব্রতের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এর ফাঁকেই চলছিল পড়াশুনো, অভিনয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলেন সাউথ সুবার্বন ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে। স্কুলে থাকাকালীন অল্প স্বল্প অভিনয় করেছেন। ইতিমধ্যে পরিবারের সবাই মিলে বেড়াতে গেলেন সাহেবগঞ্জে, পুজোর ছুটিতে। ওখানকার ছেলেরা ঠিক করেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষরক্ষা' মঞ্চস্থ করবে। ঠিক হলো 'শেষরক্ষা'র নায়কের চরিত্রে অভিনয় করবে সবিতাব্রত। সেই শুরু, তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি। ইতিমধ্যে ভর্তি হলেন সাউথ সিটি কলেজে। পরীক্ষার ফলও হল খুব ভাল। তারপরই চাকরি জীবনের শুরু।

চারণ কবির যোগ্য উত্তরাধিকারী, সবিতাব্রত দত্ত

ঠিক এই সময়ই একটা মজার ঘটনা ঘটল। সবে তখন আই.পি.টি.এ থেকে শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, তুলসীদাস লাহিড়ীরা বেরিয়ে এসেছেন, তখনও বহুরূপীর জন্ম হয় নি, তবে একটা নাটকের দল তৈরি করার পরিকল্পনা করছেন শম্ভু মিত্র ও কয়েকজন মিলে। সেই সময় ওঁরা নাটক করলেন বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। 'নবান্ন'তে অভিনয় করেছিলেন সদ্য প্রয়াতা অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র। নাটক মঞ্চস্থ করার পর চিন্তা হল এরপর কি? তুলসী লাহিড়ী সেই সময় পথিক নাম দিয়ে একটি নাটক লিখলেন। সেই 'পথিক' নাটকের জন্য নায়ক খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। তখন যারা রেডিওতে অনুষ্ঠান করতেন তাঁরা সব অর্থেই শোষিত হতেন। ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হল 'আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'। আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনে গিয়ে সবিতাব্রতর আলাপ হল অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ওয়ার্কস ইউনিয়নের সেক্রেটারী মহম্মদ ইসরাইলের সঙ্গে। তিনি শম্ভু মিত্রের সঙ্গে নাটক করতেন। ইসরাইল শম্ভুবাবুকে জানালেন যে তাঁর একজন পরিচিত ছেলে খুব সুন্দর

অভিনয় করছে। শম্ভুবাবু তাকে নিয়ে আসতে বললেন। মহম্মদ ইসরাইল সবিতাব্রতকে নিয়ে যাবেন শম্ভু মিত্রের কাছে, কিন্তু সবিতাব্রত কিছুতেই যাবেন না। মনে একটা ভয়, আমি হয়ত পারব না। একদিন মহম্মদ ইসরাইল তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন। শম্ভু মিত্রের সঙ্গে দেখা করে সবিতাব্রত সোজা বললেন, 'আমি অভিনয় করেছি স্কুল, কলেজে, পাড়ায়। তেমন কিছুই জানি না। আপনার কাছে আমার একটা আবেদন আছে, যদি রাজি হন তাহলে আমি আসব।' শম্ভুবাবু তখন তাকে তার কথাটা জানাতে বললেন। সবিতাব্রত বললেন, 'আমি প্রথম ছ'মাস এখানে বসে মহড়া দেখব, আপনারা কি আমাকে অনুমতি দেবেন ? দরকার

সপুত্র সবিতাব্রত

হলে বলবেন আমি ঘর ঝাঁট দেব, জল তুলে দেব, ফাইফরমাশ যা খাটার আমি খাটব, বিনিময়ে আমায় মহড়া দেখতে দিতে হবে। ছ'মাস বাদে যদি আমার মনে হয় আমি অভিনয় করতে পারব তখন আপনি আমায় একটা ছোট চরিত্র দেবেন।' সব শুনে শম্ভুবাবু রাজি হয়ে বললেন, 'আপনি আজ সন্ধেবেলায় চলে আসুন।' সন্ধেবেলায় রিহার্সাল দেখতে চলে এলেন সবিতাব্রত। ঘর ভর্তি লোক। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, গঙ্গাপদ বসু বসে আছেন। তাঁদের পাশে বসতেই হঠাৎ শম্ভুবাবু ডেকে উঠলেন, 'মনি'! ডাক শুনে পাশের ঘর থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। শম্ভু মিত্র সবিতাব্রতর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি 'পথিকের' অংশটা বের কর যেখানে অসীম আর সুমিত্রা রয়েছে।' তারপর সবিতাব্রতকে, 'উঠুন, উঠুন।' সবিতাব্রত রীতিমত অবাক !

অবাক হয়ে সকালবেলার কথা মনে করিয়ে দিতেই শম্ভুবাবু বলনে, 'আপনি উঠুন, আপনার কোন ভয় নেই। আমি তো আছিই।' মন্ত্রমুগ্ধের মত সবিতাব্রত উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর কতক্ষণ, কিভাবে অভিনয় করেছেন খেয়াল ছিল না। এক সময় কানে এল, 'ঠিক আছে আপনি বসুন।' বসতে গিয়ে দেখলেন যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি অভিনয় করেছেন সেখানকার লাল মেঝে গোল হয়ে ভিজে গেছে। শরীরের সব ঘাম জমা হয়েছিল ওখানে !

দিন পনের কুড়ি মহড়া চলার পর শম্ভুবাবু জানালেন, 'আমরা পরস্পর চরিত্র বদল করে নিই। তুমি এখন ডাকাতের চরিত্রটা কর, আমি তোমারটা করি।' রিহার্সাল চলছিল সেইভাবে। তারপর নাটক।

পথিকের পর শুরু হল শুধু এগিয়ে চলা। শম্ভু মিত্র ছদ্মনামে লিখলেন 'উলুখাগড়া'। 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়া তার'—এ অসামান্য অভিনয় করে সবিতাব্রত সকলকে চমকে দিলেন। শম্ভু মিত্র, অনেকদিন টানা মঞ্চস্থ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'। 'চার অধ্যায়' সেই সময় দারুণ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। কয়েক রাত্রি সবিতাব্রত চার অধ্যায়ে অতীনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আজও তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন শম্ভু মিত্র ও তুলসী লাহিড়ীর কথা। তাঁর নিজের কথায়, 'শম্ভুবাবু আমার অভিনয়ের ভিত শক্ত করে দিয়েছিলেন।' অভিনয় জীবনে অসংখ্য নট ও নটীর সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁদের কাছ থেকেও কিছু না কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অভিনেতা অভিনেত্রী হিসেবে পেয়েছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, অমর বসু, সন্তোষ দত্ত, গীতা দে, রবীন মজুমদার জহর গাঙ্গুলী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী, সুব্রতা—এরকম আরও অনেককেই। বহুরূপীতে অভিনয় করতে করতেই পরিচয় হলো গীতাদেবীর সঙ্গে। সেই পরিচয় ক্রমশ ভালবাসায় রূপান্তরিত হল। ১৯৫৫ সালে গীতাদেবীর সঙ্গে বিয়ে হলো। গীতা ছিলেন তৃপ্তি মিত্রের বোন। এই শিল্পী দম্পতি সত্যিই মেড ফর ইচ আদার।

বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে সুখদুঃখ হাসিকান্না সমানভাবে ভাগ করে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন গীতা দেবী। ইতিমধ্যে সবিতাব্রত বহুরূপী ছেড়ে 'আনন্দম্' নাট্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু আনন্দমে বেশিদিন টিকতে পারলেন না। দলের মধ্যে দেখা দিল গোলযোগ। দল উঠে গেল। সবিতাব্রত এবার নিজেই তৈরি করলেন, 'রূপকার' নাট্যগোষ্ঠী। সাল ১৯৫৫। তাঁদের অজস্র ভাল নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—'চলচিত্তচঞ্চরী', 'শাস্তি', 'ত্যাগ', 'মুচিরাম গুড়' আর 'ব্যাপিকা বিদায়' প্রভৃতি।

এইসব নাটক দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে সব জনপ্রিয়তাকে ম্লান করে দিয়েছিল রসরাজ অমৃতলালের 'ব্যাপিকা বিদায়'। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে নাটকটি অভিনীত হয়েছে। নানান সময় দলের উত্থানে পতনে স্বামী সবিতাব্রতের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছেন গীতাদেবী। অভিনয় করেছেন, দরকারে গায়ের গয়না পর্যন্ত খুলে দিয়েছেন। সাফল্য বোধহয় পায়ে পায়ে আসে। খ্যাতির শিখরে বিরাজমান সবিতাব্রত পেলেন বর্তমান কালের 'চারণ কবি' আখ্যা। এই আখ্যা পাওয়ার ইতিহাসও বেশ চমকপ্রদ।

১৯৪৯ সালের ঘটনা। সে সময়কার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর বাড়ির সামনে সরকারি কর্মচারীদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সবিতাব্রত কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। জনসাধারণ মুগ্ধ হয়ে সবিতাব্রতের অনুষ্ঠান শুনছিল। ঐ অনুষ্ঠানের সাত আট বছর বাদে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্তর সঙ্গে নির্মল চৌধুরী সবিতাব্রতের কাছে এলেন। চিত্র পরিচালক নির্মলবাবুর প্রথম ছবি 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', তিনি দ্বিতীয় ছবি করতে চান মুকুন্দ দাসকে নিয়ে। তিনি সবিতাব্রতের ঐ অনুষ্ঠানটি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই সবিতাব্রতকে অনুরোধ করলেন মুকুন্দ দাস চরিত্রে অভিনয় করার জন্য। সবিতাব্রত জানালেন তিনি অভিনয় করতে রাজি, যদি তাকে গান করতে দেওয়া হয়। নির্মলবাবু এক কথায় রাজি। সবিতাব্রত মুকুন্দ দাসের গান করবেন তা নির্মলবাবুর ইউনিটের অনেকেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। পরিচালক নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হল সবাইকে। সঙ্গীত পরিচালক পবিত্র চট্টোপাধ্যায়-এর কঠোর অনুশীলনে সবিতাব্রত 'মুকুন্দ দাস'

ব্য ক্তি ত্ব

ছবির গান রেকর্ডিং করে তার যোগ্য উত্তর দিলেন। এই সময় এক অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটল । তরুণ মজুমদার তখন 'বালিকা বধূ' করছেন। 'বালিকা বধূ'তে মুকুন্দ দাসের একটা দৃশ্য ছিল। মুকুন্দ দাস একটা অনুষ্ঠানে গান গাইছেন। তরুণবাবু সবিতাব্রতের কাছে লোক পাঠালেন। সবিতাব্রত তরুণবাবুর সঙ্গে দেখা করার পর সবিতাব্রতকে মুকুন্দদাসের দুটি বিখ্যাত গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলেন । সবিতাব্রত তখন নির্মলবাবুর 'মুকুন্দ দাস' চরিত্রে অভিনয় করছেন। তরুণবাবুর ছবিতে গান গাইবার জন্য অনুমতির প্রয়োজন। সবিতাব্রত অনুমতি চাইলেন । নির্মলবাবু এবং পবিত্রবাবু জানালেন যে তাদের ছবি শেষ হবে কিনা তা জানেন না, কারণ প্রযোজক আর টাকা দিতে রাজি হচ্ছেন না। তিনি স্বচ্ছন্দেই তরুণবাবুর ছবিতে গান গাইতে পারেন। এটা শুনে হতোদ্যম হয়ে পড়লেন সবিতাব্রত। কিন্তু ঠিক করলেন মুকুন্দ দাস ছবির শেষ গান 'সাবধান আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড' পুরোটা গাইবেন না। তরুণবাবুকে একথা জানাতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন । সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সবিতাব্রতকে দিয়ে 'ছেড়ে দে রেশমী চুড়ি' আর 'সাবধান আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড' রেকর্ডিং করালেন। সেইদিন রেকর্ডিং-এর সময় উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল। রেকর্ড করার পর তিনি শিল্পীকে বুকে জড়িয়ে ধরে তরুণবাবুকে বললেন, 'তনু তুই জানিস না সবিতাব্রত আজ কি করেছে। এই রেশমী চুড়ি গান বাঙালিকে পাগল করে দেবে, তুই সবিতাব্রতের কাছে যা চাইবি ও আজ তাই দেবে তোকে।' সবিতাব্রতকে তরুণ মজুমদার অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে মুকুন্দ দাসের চরিত্রে অভিনয় করতে বললেন । রাজি হয়ে গেলেন সবিতাব্রত । এরকম ভাবেই মুকুন্দ দাসের যেন নব জন্মান্তর ঘটল সবিতাব্রতের শরীরে। আত্মিক যোগাযোগ তো ছিলই। সবিতাব্রত স্বদেশী গান ও নাটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে 'মুকুন্দ দাস' ছবিও সম্পূর্ণ। এই সময় সবিতাব্রত মানসিক অস্থিরতার সম্মুখীন হলেন, স্বদেশী গান গাইবেন, না নাটকে অভিনয় করবেন, কোন পথকে বেছে নেবেন তিনি। এ দুটিই রক্তের মধ্যে মিশে তোলপাড় করে দিচ্ছে। একটা বাদ দিয়ে অন্যটার কথা চিন্তাও করা যায় না। অবশেষে চূড়ান্ত যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতেই হল । শেষপর্যন্ত মুকুন্দ দাসই জয়ী হলেন সেই টানাপোড়েনের খেলায়। তিনি মনস্থির করলেন নাটক তিনি ত্যাগ করবেন। রূপকার শেষ অভিনয় করল শিশিরমঞ্চে 'বিদ্রোহী নজরুল' প্রথম রজনীতে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট গুরুজনদের সঙ্গে ছিলেন বিপ্লবী গণেশ বসু। অভিনয় শেষে নজরুলরূপী সবিতাব্রত মঞ্চে এসে নত মস্তকে দাঁড়ালেন । জানালেন, 'আমরা যারা দল চালাই প্রথম রজনীতে কোন গুণীজনদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রথা নেই, কিন্তু আমি প্রথম রজনীতেই আপনাদের অমন্ত্রণ জানিয়েছি । কারণ আমাদের অভিনয় আজই প্রথম এবং শেষ রজনী হিসেবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। আমি এমন এক মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছি যা আমাকে দিনরাত অস্থির করে তুলছে। স্বদেশীগান আর নাটক কোনটাকে আমি ছাড়ব ? নাটক করতে গিয়ে আমার স্বদেশী গানের ক্ষতি হচ্ছে, আবার নাটকও আমার ধমনীতে বহমান। তবে স্বদেশী গান এমন এক বৃহত্তর নাটক যার পটভূমি বিশাল, আকাশছোঁয়া। আমি সেই আকাশে ডানা মেলে উড়ে যেতে চাই। আর তাই নাটকের বিরহ ব্যাথাটাই মেনে নিলাম।' একটু থেমে সবিতাব্রত আবার বলতে লাগলেন 'ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি কোন স্বদেশী গান শুনে প্রশ্ন করেন এই গান তো আমরা আগে কখনও শুনিনি? আমাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য সংস্কৃতির কোন ভূমিকা ছিল নাকি ? সেটা যে কত বড় লজ্জার হবে তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। আমাকে নাটক ছাড়তে হত না যদি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আরও অনেকে স্বদেশী গান করতেন । আমি আগামী প্রজন্মকে জানাতে চাই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে তিন শক্তির মিলিত উদ্যোগে, অহিংস আন্দোলন, বিপ্লববাদ, আর সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া—এই তিন প্রতিবাদ, প্রতিরোধে। আমি বলে থাকি যে ঈশ্বরপ্রতিম স্বাধীনতা আন্দোলনের ছিল তিনটি চোখ। তাঁর ডান চোখ যদি হয়ে থাকে অহিংস আন্দোলন, তবে বাম চোখটি ছিল বিপ্লববাদের—আর তার তৃতীয় নয়নটি ছিল সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের আপোসহীন চর্চা।'

'রূপকার' নাট্য গোষ্ঠীর সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করে দিলেন সবিতাব্রত। অভিনেতাদের অনুরোধ করেছিলেন দল চালাবার জন্য। কেউই রাজি হন নি। সে অনেকদিন আগের কথা। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আজও সেই বেদনা তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে দেয়। যেন সব হারানোর বেদনা তাকে কুরে কুরে খেতে থাকে । এরপর তিনি আত্মনিয়োগ করলেন স্বদেশী গানে। গাঁয়ে গঞ্জে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল চারণ কবির যোগ্য উত্তরাধিকারী সবিতাব্রতের সুরে। আর একজন অবশ্য চারণ কবির গান গাইছেন। তিনি বাঁকুড়ার বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সবিতাব্রত নাটককে ছাড়ব বললেও একেবারে কি ছেড়ে দিতে পেরেছেন ? মনে হয় পারেন নি। এখনও তিনি নাটক করেই চলেছেন। চারণ কবি মুকুন্দ দাসও তাই করেছিলেন।

এই অক্লান্ত শিল্পীর বুকের ভেতরে রয়েছেন চারণ কবি মুকুন্দ দাস। তাঁর চলাফেরা, বাচনভঙ্গিতেও মুকুন্দ দাসের ছায়া। যেন তাঁর অস্তিত্বের সর্বত্রই অগ্নিযুগের চারণ কবির প্রতিবাদী আত্মপ্রকাশ। তিনি জানালেন, 'আমি চারণ কবির কাছে কৃতজ্ঞ, চারণ কবি আমাকে অন্ন দিচ্ছে ! কিন্তু আমি তো দুধে ভাতে মানুষ হয়েছি, চারণ কবি মুকুন্দ দাসের মত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই।'

ব্যক্তিগত জীবনে সুখী সবিতাব্রত স্ত্রী, পুত্র নিয়ে শান্তিতে সংসার করছেন । ছেলে শুভব্রত একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। বেশ কিছুদিন আগে সবিতাব্রতের হৃদযন্ত্রে দুর্বলতা ধরা পড়েছিল । চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিয়েছিলেন গান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। সৃষ্টিশীল সবিতাব্রত হাঁপিয়ে উঠেছিলেন । হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ আর.এন. চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গান গাইবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন ।

অনুমতি মিলল তবে একা নয়, সঙ্গে থাকবে পুত্র শুভব্রত। শুভব্রতর হল অভিষেক। পিতা—পুত্র যৌথ সঙ্গীত পরিবেশন করতে' লাগলেন। সবিতাব্রতের ছেলের ওপর যথেষ্ট আস্থা রয়েছে। তাঁর বিশ্বাস শুভব্রত চারণ কবির পতাকাটি ভূলুণ্ঠিত হতে দেবে না ।

নির্মলবাবু 'মুকুন্দ দাস' ছবিটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন কিন্তু মুক্তি পেতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ছবি মুক্তি পেল যখন, তখন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলন চলছে। মার খেল ছবিটি। তা সত্ত্বেও ছবির গান লোকের মুখে মুখে শোনা যেতে লাগল। ওই ছবির 'ছেড়ে দে রেশমী চুড়ি' তাকে বিশাল খ্যাতি এনে দিয়েছে ।

এই মুহূর্তে সবিতাব্রত বিপ্লবী ক্ষুদিরামের উপর পড়াশুনা করছেন । সামনেই ক্ষুদিরামের জন্ম শতবার্ষিকী । স্বাভাবিক কারণেই সবিতাব্রতকে গান গাইতে হবে । তাই এই পড়াশুনা । হাজার ব্যস্ততার ফাঁকেও এই শিল্পীটি স্বামী এবং বাবার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন যথাযথ। কলকাতায় থাকলে ঝড়, জল, রোদ্দুর উপেক্ষা করেও দু'জনের মিলিত ভাবে বাজার করতে যাওয়া চাই, পছন্দ মত জিনিস নিজের হাতে কিনে আনতে হবে যে।

শিল্পীর স্বপ্ন বলতে—ভারতের জাতীয় সংহতি নিয়ে বিশাল স্তরে ভাবনা চিন্তা করা। তাঁর আক্ষেপ, সরকার এ ব্যাপারে তেমন উদ্যোগী নন । তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান করতে চান, যেখানে ভারতের সমস্ত প্রান্তের মানুষ নিজেদের সংস্কৃতির আদান প্রদান করবেন।

সরকারি সাহায্য না পেয়েও তিনি অবশ্য একক ভাবেই এই সংস্কৃতির বিনিময় করে চলেছেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির নাম দিতে চান 'ফাউণ্ডেশান অব ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশান'। প্রতীক করতে চান সাপকে, যার মাথার মণি হচ্ছে স্বাধীনতা। মণিতে আঘাত না দিলে সাপ ছোবল মারবে না। তবে শিল্পীর স্বপ্ন সত্যি সত্যিই কতদূর বাস্তবায়িত হবে, তা জানা নেই। হয়তো বা সরকারি লাল ফাইলেই লুকিয়ে থাকবে তাঁর স্বপ্ন ।

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

ছবি : সুস্মিতা চৌধুরী

৪৫ পৃষ্ঠার পর

মনোরম পাহাড়ী রাজ্য হিমাচল প্রদেশ। উঁচু উঁচু পাহাড়, ঘন বন, আর বছরভর বহতা নদীগুলি এখানকার মানুষের কাছে প্রকৃতির আশীর্বাদের মত। প্রতি বছর দেশ বিদেশের বহু ক্রীড়াপ্রেমী পর্বতারোহন, স্কীইং, জলক্রীড়া, মাছধরার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এখানে আসেন। এখানকার যে উঁচু বৃক্ষহীন টিলা আর উপত্যকা বছরের পর বছর উপেক্ষিত ছিল, আকাশে ওড়ার খেলা হ্যাং-গ্লাইডিং–এর জন্য তা আজ ক্রীড়াপ্রেমীদের মুখে মুখে। ভারত তথা বিদেশের বহু ক্রীড়াপ্রেমী প্রতি বছর এই খেলায় অংশ নিতে আসেন। হিমাচল প্রদেশই হল ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে গত ছ'বছর ধরে হ্যাংগ্লাইডিং–এর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এই খেলায় অংশ নিতে, আর তা দেখতে ক্রীড়াপ্রেমীরা 'বিলিং' আসছেন আরও বেশি সংখ্যায়। বোধহয় 'বিলিং' নামটা অনেকের কাছেই নতুন লাগবে। আসুন বিলিং–এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

পাঠানকোট–মানালি রাজপথে পাঠানকোট থেকে ১৪০ কিমি. দূরে মানালির দিকে যেতে একটা জায়গা আছে। নাম বিড রোড। বিড রোডের কাছে এহজু নামের রেল স্টেশন। বিড রোড থেকে

মেজর বিজয় মুণ্ডকর

একটা সর্পাকৃতি পাকা রাস্তা তিন কিলোমিটার দূরে চৌগান পর্যন্ত চলে গেছে। পাহাড়ের ঢালে গড়ে ওঠা একটি সুন্দর গ্রাম এই চৌগান। এখানে রয়েছে বড় বড় চা বাগান আর ১৯৫৯ সালের পর আসা তিব্বতি শরণার্থীদের বসতি। এখান থেকে একটা চোদ্দ কিলোমিটার লম্বা কাঁচা রাস্তা, চড়াই শেষ হয়ে ঘন জঙ্গলের মাঝে ৮,৫০০ ফিট উঁচু বিলিং–এ গিয়ে শেষ হয়েছে। বিলিং উপত্যকার উপরে কিছুটা সমতল জায়গা। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বিলিং উপেক্ষিতই ছিল। কখনও কখনও কোন লোক হয়তো তার ভেড়ার পাল নিয়ে দু'একদিন থেকে গিয়েছে। নইলে ওখানে কেউ যেতই না। ১৯৮৪ সালে গরমের সময় এই বিলিং খেলাধুলোর বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নিল দুঃসাহসিক হ্যাংগ্লাইডিং–এর আকর্ষণে। প্রথম হাজার হাজার লোকের পা পড়ল এই নির্জন

মোহন কুট্টি

বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী, জুডি লিডন,

গিরিকন্দরে।

বিলিং–এ একসঙ্গে ৪০ টা হ্যাংগ্লাইডার দাঁড় করানোর ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে একসাথে দু'জন লোক উড়তে পারে। যারা উড়বে তাদের জন্যে রয়েছে দু'কিলোমিটার–এর বিস্তৃত এলাকা। যদিও উড়ে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে যাওয়া যায় তবুও কোনও পাইলটের জরুরি অবতরণের দরকার হতে পারে। সেজন্যে কিছু দূরে দূরেই কিছুটা অবতরণের জায়গা দরকার হয়, অন্যথায় ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং–এ পাইলটের গ্লাইডার কোনও গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে। ঐ অবস্থায় পাইলটের জীবন সংশয় হতে পারে। গ্লাইডারে পাখনা থাকে। পাইলট এই পাখনার মাঝে সুবিধাজনকভাবে ঝুলে থাকতে পারে। উঁচু জায়গা থেকে দৌড়ে নিচের ঢালুতে এসে হাওয়ায় ভেসে পড়ে তারা। হ্যাংগ্লাইডারকে উপর–নিচ,
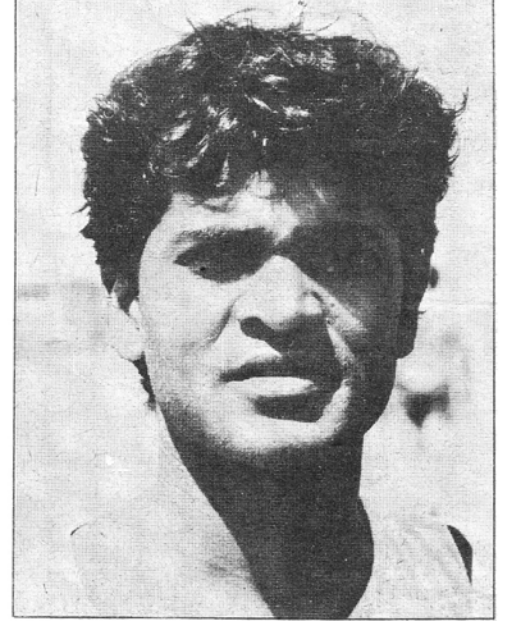
কুশলী গ্লাইডার দীপক মহাজন

ডাইনে বাঁয়ে ঘোরানোর জন্যে লিভার লাগানো থাকে। ফলে পাইলট নির্দিষ্ট স্থানে নির্বিঘ্নে অবতরণ করতে পারে।

পালামপুরের ওয়েস্টার্ন হিমালয়ান হ্যাংগ্লাইডিং এ্যাসোসিয়েশন সর্বপ্রথম বিলিং–এ আন্তর্জাতিক স্তরে হ্যাংগ্লাইডিং র‍্যালির আয়োজন করেন। ঐ র‍্যালিতে বিদেশি পাইলটেরা বিলিং থেকে ধর্মশালা (আকাশপথে ৩২ কিলোমিটার) পর্যন্ত উড়ে ক্রীড়ানুরাগীদের অবাক করে দিয়েছেন। ভারতীয় চার পাইলটও ঐ র‍্যালিতে অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু বিদেশি পাইলটদের আগেই তাঁরা অবতরণে বাধ্য হন। এর ফলে বোঝা যায় ভারতীয় পাইলটদের আরও কিছু অভ্যাসের দরকার এবং তাঁদের জন্যে কয়েক বছর সর্বভারতীয় স্তরে হ্যাংগ্লাইডিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো খুবই জরুরি। ১৯৮৫ তে হিমাচল প্রদেশের পর্যটন বিভাগ রাষ্ট্রীয় স্তরে হিমালয়ান হ্যাংগ্লাইডিং র‍্যালির আয়োজন করা শুরু করলেন। ততদিনে ভারতে ভাল হ্যাংগ্লাইডিং পাইলট তৈরি হয়ে গেছেন, এমন কি তাঁরা বিদেশি পাইলটদের সঙ্গে টক্কর দিতেও সক্ষম। বোম্বাইয়ের দীপক মহাজন, কেরলের মোহন কুট্টি এবং ভারতে বসবাসকারী ফরাসী পাইলট ডবলু.এম. জ্যোল এই সময়ে ভাল পাইলট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

New VIP Benz steers a touch of German precision to men's underwear. You have the most comfortable stretchable fabric. And you have the most reliable imported rubber elastic. The rest is sheer styling. All perfect. All German.

VIP BENZ. Great mileage in comfort.

সংগীতের মাধ্যমে সময় শুনুন
MIRACLE EYE
SOUND AUTO CONTROL
12 MELODY HOUR STRIKE
Ajanta®
মিরাকুল আই
এমনভাবে সেট করা—গভীর রাতে বাজে না
সময় জানায়
প্রতি ঘণ্টায় মনে করিয়ে দেয়
তাই সবাই নিশ্চিন্ত আর খুশী
ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় না
প্রতি ১৫ মিনিটেঃ একবার ১/৪ মেলোডি শোনা যায়
প্রতি ৩০ মিনিটেঃ একবার ১/২ মেলোডি শোনা যায়
প্রতি ৪৫ মিনিটেঃ একবার ৩/৪ মেলোডি শোনা যায়
প্রতি ৬০ মিনিটেঃ পুরো মেলোডি ও ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা যায়
ভারতে মিউজিকাল ক্লক্স-এর পথিকৃত
Ajanta®
QUARTZ
the touch of tomorrow's technology
রেজিস্টার্ড অফিসঃ
প্রুথভিরাজ প্লট, পো. বক্স নং. ১১৫.
মোরভি ৩৬৩৬৪১
ফোনঃ ৩৬২৭, ২২৮০, ২৪৫৭, ২৪৩৩
টেলেক্সঃ ০১৬৮-২১২ ATCM
গ্রামঃ ভনিথা
KPS/AM/9-39/BEN
M207
M267
M227
M257
সমস্ত নামী দোকানে পাওয়া যায়
সতর্কীকরণঃ ঘড়ি-তে 'অজন্তা' ছাপটা দেখে নিন। নকল থেকে সাবধান থাকুন।
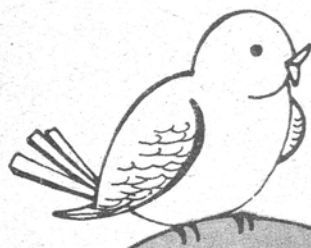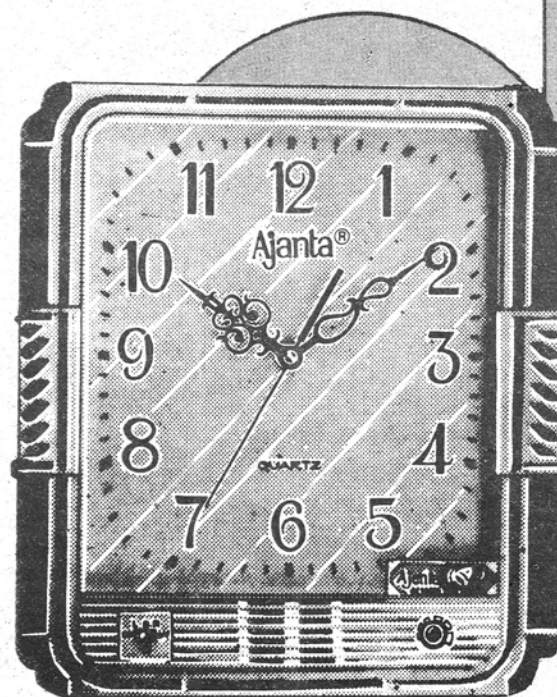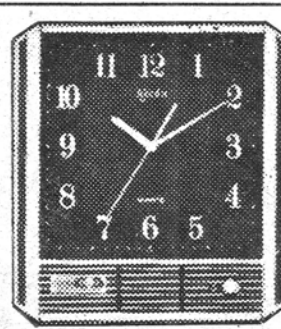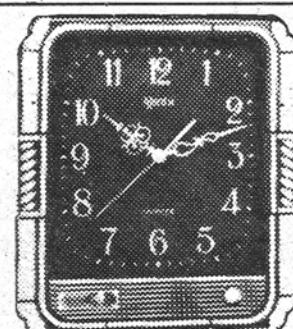
হিমাচল পর্যটন বিকাশ নিগম গত চারবছর যে র‍্যালির আয়োজন করেছিলেন সেগুলি প্রতিটিই আয়োজিত হয় অকটোবর মাসে। ঐসময় হিমাচল প্রদেশে মাঝে মাঝে বর্ষা হয়। হ্যাংগ্লাইডিং এর জন্যে ঝলমলে রোদ্দুর এবং পরিষ্কার আবহাওয়া দরকার। এই দিকে দৃষ্টি রেখেই হিমাচল পর্যটন বিভাগ পঞ্চম হিমালয়ান হ্যাংগ্লাইডিং র‍্যালির আয়োজন করেছিলেন গত মে মাসে। পঞ্চম হিমালয়ান হ্যাংগ্লাইডিং র‍্যালিতে সেনা বিভাগের তিনটি উইং থেকে ১১ জন প্রতিযোগী ছাড়াও ৬ জন সিভিলিয়ান অংশ নিয়েছিলেন। এই র‍্যালিতে অংশ নেবার জন্যে বৃটেন থেকে এসেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্লাইডার প্রতিযোগী নীল কোনিয়ার। দুর্ঘটনা ঘটলে যাতে প্রয়োজনীয় রক্তের অভাব না হয় সেজন্যে র‍্যালি শুরুর আগেই প্রতিটি পাইলটের রক্তের গ্রুপ নথিবদ্ধ করা হয়েছিল। এছাড়াও প্রত্যেক পাইলটের ব্যক্তিগত বীমা করা হয়েছিল ১ লাখ টাকা করে। প্রতিটি হ্যাংগ্লাইডারেরও বীমা করা হয়েছিল ৩২ হাজার টাকা করে।

সি বি প্রসাদ

২৯ এবং ৩০ মে এই দুটি দিন প্রতিযোগিদের অনুশীলনের জন্য রাখা হয়েছিল। প্রতিযোগিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিড রোডের ১০ কিলোমিটার দূরত্বে যোগীন্দ্রনগরে। ২৯ মে সকালে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ দেখে পাইলটরা খুশিই হয়েছিলেন। সকাল সকাল ১৭ টা জিপ পাইলটদের এবং তাঁদের হ্যাংগ্লাইডার নিয়ে বিলিং-এর দিকে রওনা দিল। বিলিং-এ পৌঁছে পাইলটরা নিজের নিজের গ্লাইডার-এর যন্ত্রাংশগুলো জুড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দুপুর বারোটার পর ক্রমে ১৭ জন পাইলট একে একে গ্লাইডার নিয়ে বিলিং থেকে নিচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে ১৭টা রং বেরং-এর প্রজাপতি যেন আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগল। নিচে দাঁড়ানো লোকেরা অবাক বিস্ময়ে আকাশে উড়ে বেড়ানোর এই সাহসিক সাবলীলতায় দৃষ্টি রাখল। কিছুক্ষণ আকাশে ওড়ার পর পাইলটেরা একে একে বিলিং-এর দু'কিলোমিটার দূরে চৌগান-এ নেমে পড়লেন। পর দিন ৩০ মেতেও পাইলটরা অনুশীলন করলেন।

হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী আর.কে. এস গান্ধী ৩১ মে পঞ্চম হিমালয়ান র‍্যালির উদ্বোধন করলেন। বিলিং থেকে সর্বপ্রথম উড়লেন ১৯৮৮ সালের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার বিজেতা দীপক মহাজন। তারপর, একে একে কম্যাণ্ডার মোহন কুট্টি, ডব্লু, এস. জ্যোল, নীল-কোনিয়ার, লেফটেন্যান্ট লোকেন্দ্র শর্মা, স্কোয়াড্রন লিডার আর.পি. দেব, অভিজাত তন্না, সুরেশ পাটিল, সার্জেন্ট সতীশ পাঠানিয়া, লেফটেন্যান্ট এস. নাইডু চন্দ্রন, বি.কে. দাস, মেজর শর্মা এবং ত্যাগী বিলিং থেকে ঝাঁপ দিলেন, আকাশে।

এবারের র‍্যালি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল-ক্রস কান্ট্রি এবং নোবিসিস। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বি.এস. প্রসাদ, ডব্লু.এম. জ্যোল, দীপক মহাজন, নীল, কোনিয়ার, কম্যাণ্ডার মোহন কুট্টি এবং লেফটেন্যান্ট বি.জে. এস চীমা দক্ষ গ্লাইডার চালক। এঁদের রাখা হয়েছিল ডিউরেশন, স্পটল্যাণ্ডি এবং পায়লঞ্জ প্রতিযোগিতায়। বাকি এগারোজন পাইলট

জার্মানীর একটি শহরের ওপর গ্লাইডার

ছিলেন নতুন। তাঁদের সহজতর প্রতিযোগিতায় রাখা হয়েছিল। ডিউরেশন প্রতিযোগিতায় বেশিক্ষণ হাওয়ায় ভেসে থাকতে হয়, স্পটল্যাণ্ডিং এ নামতে হয় একটি নির্দিষ্ট স্থানে আর তৃতীয় প্রতিযোগিতা পায়লঞ্জ রেস-এ ইংরেজি 'টি' আকারের কাপড় থাকে। তার ওপর একটা আয়না রেখে দেওয়া হয়। পাইলটকে তার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই পঞ্চম র‍্যালিতে তিন কিলোমিটার দূরে দূরে তিনটে পায়লঞ্জ রাখা হয়েছিল। এটা এক কঠিন প্রতিযোগিতা।

র‍্যালি শুরু হয়েছিল ৩১ মে। শেষ হল ৪ জুন। গত বছরে বিজেতা দীপক মহাজন এবারেও প্রথম হলেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন কম্যাণ্ডার মোহন কুট্টি এবং লেফটেন্যান্ট বি.জি.এস চীমা। এবং তৃতীয় হলেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বি.এস. প্রসাদ। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কারের অর্থমূল্য যথাক্রমে ১৫ হাজার, ১০ হাজার এবং ৭ হাজার ৫০০ টাকা। এই পুরস্কার ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতার। নোবিসিস প্রতিযোগিতায় স্কোয়াড্রন লিডার আর.পি. দেব প্রথম, সোয়েব আহমেদ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হলেন সার্জেন্ট সতীশ পাঠা-

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগী নীল কোনিয়র
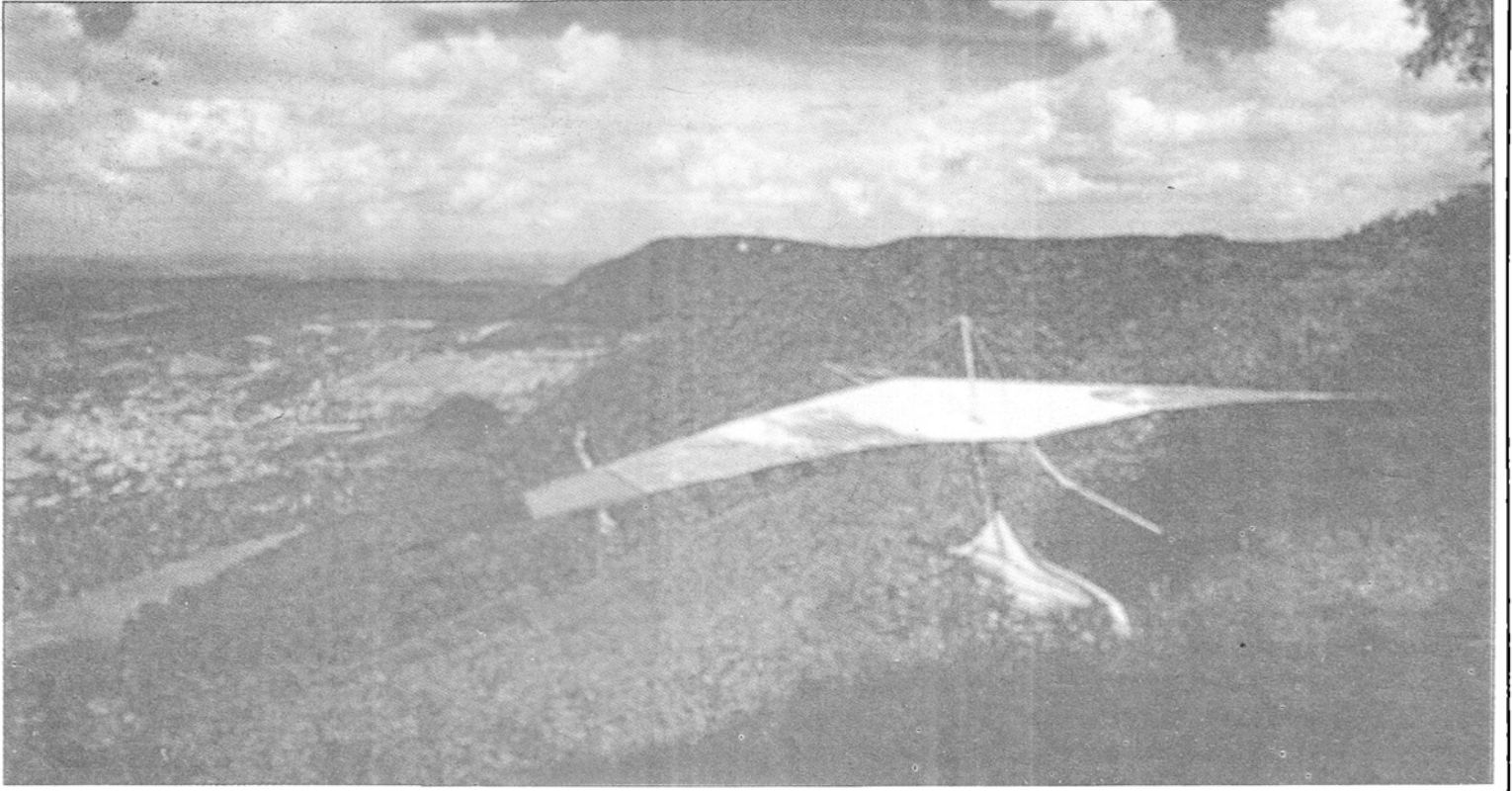
নিয়া। এঁদের পুরস্কার যথাক্রমে ১০ হাজার, ৭ হাজার ৫০০ এবং ৫ হাজার টাকা।

হ্যাংগ্লাইডিং–এর ইতিহাস বহু পুরানো। ১৮৯১ সালে জার্মানীর অটোলিলিয়েন্থল প্রথম হ্যাংগ্লাইডার তৈরি করে আকাশে ওড়েন সফলভাবে। তিনি ১৮৯১ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে প্রায় ২৫০০ বার আকাশে ওড়েন। তিনি তাঁর গ্লাইডারের কিছু দরকারি পরিবর্তনের কথা ভাবছিলেন কিন্তু হঠাৎই এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঠিক ঐ একই সময়ে ব্রিটেনবাসী পারসি পিলচারও গ্লাইডার নিয়ে মেতেছিলেন। তিনি তাঁর গ্লাইডারে ইঞ্জিন লাগানোর চেষ্টা করছিলেন। তাঁর স্বপ্ন প্রায় পুরো হতে যাচ্ছিল কিন্তু উড়তে গিয়েই এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। ল্যাংগলে নামে আমেরিকার জনৈক গ্লাইডার বাষ্পীয় ইঞ্জিন লাগানো গ্লাইডারও তৈরি করেছিলেন।

ফ্রান্সের রোগ্যালো নামের জনৈক বৈজ্ঞানিক আমেরিকার ভার্জিনিয়ায় ল্যাংগলে রিসার্চ সেন্টার, হাম্পটনে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি নাসা (ন্যাশনল এয়রোনোটিক এ্যান্ড স্পেস এজেন্সি)–র জন্যে হ্যাংগ্লাইডারের মডেল তৈরি করেন। এই মডেলকেই উন্নত করে ১৯৭০ সালে আমেরিকাবাসী ডেভিড কিলবোর্ণ নতুন ধরনের হ্যাংগ্লাইডার তৈরি করেন। এবং ঐ হ্যাংগ্লাইডারই কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে সারা বিশ্বের বেশ কিছু দেশে প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় এক লাখ হ্যাংগ্লাইডার পাইলট আছেন বলে অনুমান করা হয়।

ভারতে হ্যাংগ্লাইডিং–এর শুরু ১৯৭৬ সালে। এই খেলার শুরু করেন মেজর বিবেক মুন্ডকর। এই খেলার শুরুর ব্যাপারে তিনি বলেন:

'১৯৭৫ সালের কথা। আমি পুনার সি.এস.ই কলেজে পোস্টেড। এই সময় আমার খুড়তুতো ভাই আমেরিকা থেকে এসেছিল। সেই আমাকে হ্যাংগ্লাইডিং সম্পর্কে অনেক কিছু খোঁজখবর দিয়েছিল। এই খেলা সম্পর্কে আমি আগেও শুনেছিলাম। আমার সেই ভাই আমেরিকা থেকে হ্যাংগ্লাইডারের ড্রয়িং–ও নিয়ে এসেছিল, সঙ্গে কিছু নোটস। তার সাহায্যে আমিই ভারতে প্রথম হ্যাংগ্লাইডার তৈরি করি। বোম্বাই থেকে হ্যাংগ্লাইডিং–এর জিনিসপত্র নিয়ে পুনার কাছে বর্নের নামে একটা জায়গায় গেলাম। সেখানে অনেক উঁচু উঁচু টিলা রয়েছে। ওখান থেকেই আমি প্রথম হাওয়ায় ভেসে পড়ি। সেই প্রথমবার পাখির মত আকাশে উড়তে যে কি রোমাঞ্চ হয়েছিল তা বলে বোঝাতে পারবো না। ১,৫০০ টাকায় তৈরি ঐ হ্যাংগ্লাইডারে অনেক কিছুরই অভাব ছিল। ঐ কারণে প্রথম উড়ানে বেশ ভালরকম আহত হয়েছিলাম আমি।

আমাকে পাখির মত আকাশে উড়তে দেখে সেনাবাহিনীর লোকজনই মূলত আমার কাছে এই খেলার প্রশিক্ষণ নিতে এলেন। এই খেলা বিপজ্জনক এবং এ জন্যে উপযুক্ত গ্লাইডারেরও দরকার ছিল। এসব কারণে এই খেলা সম্পর্কে যথাযোগ্য জ্ঞান লাভের জন্য আর্মির লোকজনেরা আমাকে ইংল্যাণ্ডের ওয়েলসে একটা ৪৫ দিনের ট্রেনিং কোর্স করতে পাঠালেন ১৯৭৯ সালের মে মাসে। প্রশিক্ষণ শেষ করে জুনে আমি ভারতে ফিরে আসি। ঐ সময় ব্রিটেন থেকে তিনটে ভাল গ্লাইডার কিনে আনি যার দাম প্রায় ৪০ হাজার টাকা। এই তিনটে গ্লাইডারের মধ্যে হ্যারিয়ার নামের একটার ডিজাইন বেছে নিয়ে পুনাতে নিজের গ্লাইডার তৈরি করতে শুরু করে দিলাম। এই গ্লাইডারের নাম দিলাম ভারতীয় পাখি গরুড়ের নামে। আমার তৈরি এই গ্লাইডারের দাম পড়ে ৬ হাজার টাকা। এ পর্যন্ত আমি ১৫০ টি গরুড়' বানিয়েছি। সেগুলো চালাচ্ছেন প্রশিক্ষিত গ্লাইডার চালকেরা।

মেজর গুরুং, ক্যাপ্টেন কিজলকর, লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার মোহন কুট্টি, হাবিলদার শিশরাম, দীপক মহাজন, প্রভৃতি গ্লাইডার পাইলটকে আমিই প্রশিক্ষণ দিয়েছি। বোম্বাইতে এখন হ্যাংগ্লাইডিং ক্লাবও তৈরি হয়ে গেছে।

বিশ্বের বর্তমান শ্রেষ্ঠ গ্লাইডার পাইলটেরা হলেন, পুরুষ বিভাগে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী আমেরিকার লেরি টিউডর (২২১.৫ মাইল), মহিলা বিভাগে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারিনী বৃটেনের জুডি লিডন (১৪৬ মাইল) এবং তিনবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান আমেরিকার স্টিভ মায়াস প্রভৃতি। ভারতেও ভাল পাইলটেরা তৈরি হচ্ছেন। এঁদের মধ্যে পড়েন দীপক মহাজন, মোহন কুট্টি, ডব্লিউ এম. জ্যোল, লোকেন্দ্র শর্মারা।'

অশোক সারিন

যেকোন লোকের যেকোন সময়ে ক্যানসার হতে পারে। আপনি কি তার বিরাট খরচার বোঝা নিতে পারেন? এখন ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি আপনাকে এ থেকে রেহাই দিতে পারে –ভারতের প্রথম ক্যানসার বীমা পলিসির মাধ্যমে।

ক্যানসার বীমা ঃ সহায়তার এক মজবুত হাত

যখনই ক্যানসার রোগ হবে, আপনি আর আপনার স্ত্রী/স্বামী ৫০,০০০ টাকার বীমার আওতায় আসবেন যাতে আপনি রোগ নির্ণয়, বায়োপ্সি, সার্জারি, কেমোথেরাপি এবং/অথবা রেডিওথেরাপি আর হাসপাতালের খরচা মেটাতে পারেন।

প্রতিবার যেই আপনি দাবীমুক্ত নবীকরণ করবেন, এই ৫০,০০০ টাকার সীমা আরো ৫% বেড়ে যাবে, যার ঊর্ধসীমা হল ৭৫,০০০ টাকা।
আপনার যদি ক্যানসার হয় আর এই ঊর্ধ সীমার টাকাও খরচা হয়ে যায়, তখনও ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি আপনাকে সহায়তা করে চলবে – কেমোথেরাপি ওষুধের ওপর ৫০% ছাড়ের ব্যবস্থা করবে।

আপনি আপনার পুরো পরিবারকে এই বীমার ছত্রছায়ায় আনতে পারেন ১৫ বছরের নীচের দুটি সন্তানকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন, সন্তান পিছু বছরে মাত্র বাড়তি ৫০ টাকা দিয়ে।

অন্যান্য মূল্যবান সুবিধার মধ্যে আছে – ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির ক্যানসার ডিটেকশন সেন্টারে একবার বিনামূল্যে চেক্-আপের ব্যবস্থা। পরবর্তী চেক-আপের জন্যেও আসল খরচের ৫০% দিতে হয়।

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির সদস্যতা

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির সদস্য হয়ে যান। আপনি অভিনব ক্যানসার বীমা পলিসির ছত্রছায়ায় আসার যোগ্যতা পাবেন, কোন বাড়তি খরচা না দিয়েই।
আপনার আবশ্যকতার অনুরূপ সদ্যস্যতা বেছে নিন ঃ
শুভাকাঙ্খী (ব্যক্তিগত) ভর্তি ফী ৭৫ টাকা, তাছাড়া নবীকরণের জন্যে প্রতি বছরে ২০০ টাকা।
শুভাকাঙ্খী (আজীবন) এককালীন ৩০০০ টাকা দিতে হয়।
কর্পোরেট ভর্তি ফী ২,০০০ টাকা, তাছাড়া প্রতি বছরে ৫,০০০ টাকা। সদস্য হিসাবে কোম্পানী তার ২৫ জন কর্মচারীকে মনোনয়ন করতে পারেন।
সাধারণ ভর্তি ফি ৫০০ টাকা, তাছাড়া নবীকরণের জন্যে প্রতিবছরে ১,০০০ টাকা।
২৫ জনের বেশী ব্যক্তির গ্রুপের জন্যে দিতে হয় উপরোক্ত সদস্যতা ফী-এর কেবল ১৫% থেকে ৬৬.৬% যা নির্ভর করবে গ্রুপের সাইজের ওপর।

আজই বীমা করান!

আজই ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির সদস্য হয়ে যান। এর জন্যে দিনে খরচ হয় এক টাকারও কম। এটির ছত্রছায়ায় থাকাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি
ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার্স ঃ লেডি রতন টাটা মেডিক্যাল অ্যাণ্ড রিসার্চ সেন্টার,
এম. কার্ভে রোড, কূপারেজ, বম্বে - ৪০০ ০২১, ফোন ঃ ২০২৯৯৪১/৪২,
তাড়াতাড়ি ধরা মানে তাড়াতাড়ি সারা!

কলকাতা শাখা ঃ
১৫- এ, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০

daCunha ICS 2 89 BN

বরফের দেশে, লামাদের সাথে

বারো হাজার সাত'শ ফুট উচ্চতায় হিমালয়ের কোলে এক ছোট পাহাড়ী লোকালয়, নাম থিয়াংবোচে । একপাশে রয়েছে একটি বৌদ্ধ মঠ । থিয়াংবোচের বৌদ্ধ মঠটি এভারেস্টের নিচে একটি পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত । চারদিক ছড়িয়ে ছোট ছোট আরও কয়েকটি পাহাড় । প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপের ভাণ্ডার ভিন্ন রংয়ে বিরাজমান। থিয়াংবোচের পাহাড়ী পথের দু'ধারে ভিন্ন জাতের ফুলের মেলা । সহজে নজর কেড়ে নেয় সেই চেনা ফুল, রডোডেনড্রন যার নাম । সাথে রয়েছে সবুজের মেলা–পাইন, ফার আর ওকের অপূর্ব সাহচর্য ।

থিয়াংবোচে মঠ পৃথিবীর নামী বৌদ্ধমঠগুলোর মধ্যে অন্যতম । ওই মঠের প্রধান লামা স্থানীয় পাহাড়ী শেরপাদের কাছে দেবতার মত পূজনীয় । মঠটির দোতলার মাঝখানে উপাসনাকক্ষ। সৌভাগ্য হয়েছিল সেখানে প্রবেশ করবার, হাজির ছিলাম উপাসনার সময়ে । দেখেছিলাম উপাসনা ঘরের ভেতরে তিব্বতি নক্শা ও হাতে আঁকা রঙিন চিত্র। উপাসনার সময়ে লামা উপাসকের মন্ত্রপাঠসহ বাদ্য আর ঘন্টাধ্বনি, দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়ানো খুদে লামারা ...সব মিলিয়ে এক ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল ।

দিন কয়েক ছিলাম ওখানে। একদিন ভোরবেলা। ঘুম ভাঙতে কাঠের ঘরের দরজার বাইরে দেখি ঘন কুয়াশার আচ্ছাদন । দৃষ্টির সীমা আটকে যাচ্ছিল শুভ্র ধোঁয়ার প্রাচীরে । আলসেমিতে উঠতে ইচ্ছে করছিল না স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে । তবু একসময় উঠতে হল । হিমালয়কে দেখতে এসেছি সৌন্দর্যের টানে । অতএব বাইরে বেরতে হল সৌন্দর্য পিপাসার আশায়। চমৎকার লাগছিল। অনুভব করলাম এক অজানা আনন্দের শিহরণ। চারদিকে হিমালয়ের অঙ্গন জুড়ে শুভ্র তুষারের প্রলেপ । মনে হল, কে যেন সাদা তুষারের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে থিয়াংবোচের উপরে ।

দূরে শোভা পাচ্ছে পর্বতশিখররাজি । যার মধ্যে রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে শিখর সম্রাট এভারেস্ট । দু'পাশে লোৎসে আর ন্যুৎসে। এছাড়া রয়েছে আমা দাবলাম, থাম সারকু, কাংতেগা, কোয়াংদে এবং খুম্বিলা পর্বতশৃঙ্গ ।

থিয়াংবোচে মঠের নিচের তলায় প্রধান কক্ষটিকে বলা হয় দোখাং, যেখানে লামা উপাসকেরা জড়ো হন । এখানে প্রধান দেবমূর্তির নাম শাক্যমুনি। ওঁর ডানদিকে চেরেনসিগ, বাঁয়ে উরগ্যিয়েন। এই তিনজন দেবতার পাশে রয়েছে কিছু ধর্মপুস্তক। এখানে একটি কাঠের পিঁড়ি রয়েছে, যাতে রূপো এবং সোনার অক্ষরে খোদাই করা রয়েছে কিছু ধর্মীয় বার্তা তার পাশে আরেকটি কাষ্ঠখণ্ডে আছে হাতে লেখা কিছু বাণী । ডানদিকের দেওয়ালে একটি মূর্তি রয়েছে, আর্য মিটাজার । বাঁ–দিকের দেওয়ালেও রয়েছে খোদাই করা কিছু কারুকার্য এবং ওদের মাঝে ভগবান মিলিং মাকালা লোসেকের ছবি । খুম্বু অঞ্চলের প্রতিটি শেরপার কাছে থিয়াংবোচে মঠের দেবতারা পূজনীয় । উপরে ছাদেও অপরূপ হাতে আঁকা ছবি...ওদের মাঝে রয়েছে ন'জন দেবতার ছবি ।

দোতলায় প্রধান ঘরটিতে (নাম সারসাং লাখা) রয়েছে অনেকগুলো সোনার মূর্তি । এখানে প্রায় ৩০০টি ধর্মীয় গ্রন্থ রয়েছে। প্রতিটি দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে ভিন্ন রংয়ের ভিন্ন অবয়বের হাতে আঁকা চিত্র। এই ঘরটি উপাসনার জন্যে। এর ডানদিকে ছোট্ট একটি ঘর, নাম ঘোংখাং। এখানে কেবলমাত্র মঠের উপাসকরাই প্রবেশ করতে পারেন। এখানে
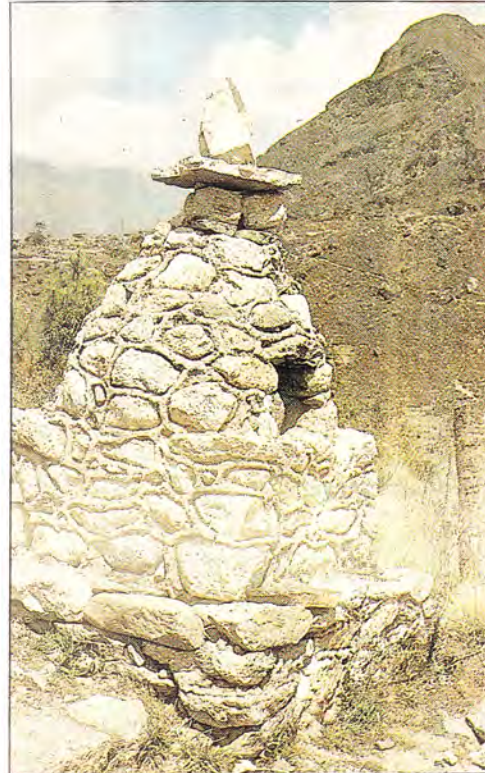
ছোর্থেন: থিয়াংবোচের প্রবেশদ্বার
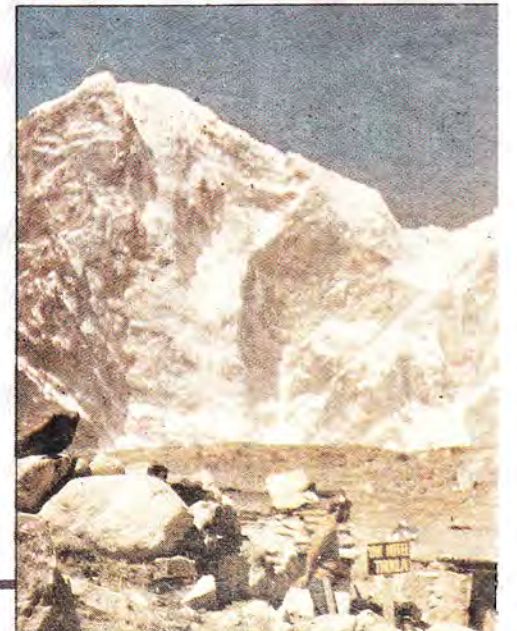
হিমালয় · প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে
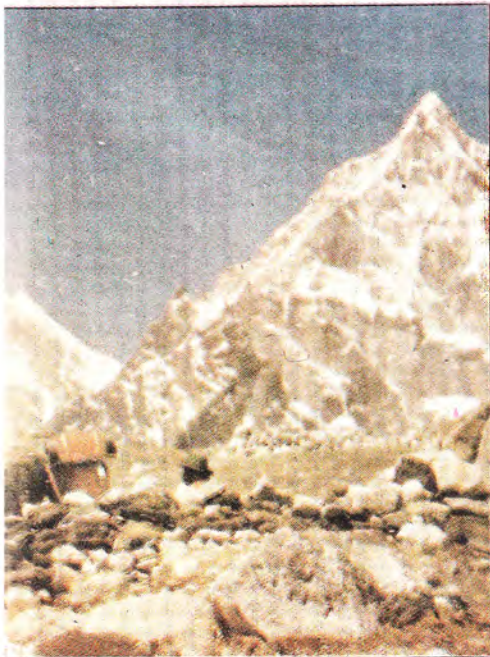
এভারেস্টের নিচে থিয়াংবোচের বৌদ্ধ–
মঠে লামাদের কাছে বসে পর্বতারোহী
লেখক রসিক পাল হিমালয়ের
অন্য হাতছানির দেখা পেলেন, যা এই রচনার
রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহস্যময়তার সঙ্গে
উচ্চারিত।

থিয়াংবোচের পথে যাত্রা

আরও দু'টো ঘর রয়েছে—এবং প্রতিটি ঘরের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে সুদৃশ্য দৃশ্যাবলী ।

তিনতলায় একমাত্র ঘর, ঔখাং—এ ভগবান টারতুগিয়াজুর চিত্র শোভা পাচ্ছে ।

নিচে মঠের বাইরে ছোট্ট উদ্যান (ওদের ভাষায় খিয়াম রি)। উদ্যানের ডানদিকে রান্নাঘর—রুখাং। মঠের বাইরে উপাসক এবং লামাদের বাসস্থান। মঠের ডানদিকে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লামা ছাত্রদের হোস্টেল ।

অতীতে একসময় থিয়াংবোচে ছিল নির্জন, পাহাড়ী অরণ্যে ঢাকা । তারপর লামা সাংওয়া দোরজী এখানে এসে ধ্যানে বসেন । একটি বড় পাথরের উপর বসে ধ্যান করবার সময়ে তিনি নাকি দেখতে পান ভবিষ্যতে এখানে একটি মঠ হবে—যা পৃথিবীর নামী মঠগুলোর মধ্যে হবে অন্যতম। থিয়াংবোচে মঠে সেই পাথরটি এখনও সুরক্ষিত আছে—যার উপর বসে তিনি ধ্যান করেছিলেন । পাথরটিতে তাঁর পায়ের ছাপও পাওয়া যাবে ।

এরপর ১৯১৪ সালে খুমজুং থেকে একজন লামা চাটাং চোটার তিব্বতের রংবুক মঠে আসেন। মঠ পরিদর্শন করেন এবং ওখানে সাক্ষাৎ পান লামাগুরু নোয়াং তেনজিং নরবুর। তেনজিং নরবু-লামা চাটাংকে নির্দেশ দেন খুম্বু অঞ্চলে একটি মঠ তৈরি করবার । কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের কথা ভেবে লামা চাটাং চিন্তিত বোধ করেন । যদিও সেকথা লামাগুরুকে বলার সাহস হল না। কিন্তু লামাগুরু শীঘ্রই সেটা বুঝতে পারলেন এবং চাটাংকে বললেন খুম্বুতে গিয়ে স্থানীয় লামাদের সাহায্য নিতে । লামা চাটাং এরপর চলে গেলেন খুম্বু অঞ্চলে । উনি শেরপাদের সাথে মঠের জন্যে জায়গা এবং মঠ তৈরির সাজ সরঞ্জাম ও অর্থাদির ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন ।

এরপর মঠ তৈরির কাজ শুরু হয় ১৯১৬ সালে। আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায় গেম্বুশেরাব, লামা কার্মা এবং খোকতো কুশান থেকে। স্থানীয় শেরপারাও এগিয়ে এসে আর্থিক সাহায্য ও কায়িক পরিশ্রম করে থিয়াংবোচেতে মঠ তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করেন। সময় লাগে তিন বছর।

নেপালে তখন রানারা রাজত্ব করতেন। তাঁদের প্রধান বিমান শামসার জানতে পারলেন থিয়াংবোচেতে মঠ তৈরির কথা। তিনি বেশ কিছু অর্থ পাঠিয়ে দেন মঠের উন্নতির জন্য। সেই অর্থ রেখে দেওয়া হয়েছে—প্রয়োজনে খরচ করবার জন্যে ।

আঠার বছর পরে ভয়াবহ ভূমিকম্পে মঠটি ধ্বংস হয়ে যায়! লামা চাটাং চোটার মারা যান সে রাতে । লামা সন্ন্যাসীরা তিব্বতে গিয়ে পুনরায় দেখা করেন লামাগুরু তেনজিং নরবুর সাথে । তিনি নির্দেশ দেন থিয়াংবোচেতে আবার নতুন করে মঠ তৈরি করতে । এবং বেশ কিছু অর্থ ওদের হাতে তুলে দেন ।

লামা উপাসক নোয়াং গেলজেন, লামা সন্ন্যাসী এবং স্থানীয় শেরপা অধিবাসীদের সাহায্যে পুনরায় মঠটি তৈরি হয়। লাসা থেকে একজন ছুতোর মিস্ত্রী-কে আনা হয় কাঠের কাজের জন্যে। মঠের ভেতরে রং এবং চিত্র আঁকার জন্যে তিব্বত থেকে আসেন কাপা কালদেন ।

মঠের লামারা সাধারণত শেরপা পরিবার থেকে আসেন । সাত বছর এবং তারপরের বয়সের শেরপাদের ছেলে সন্তান লামা হিসেবে যোগদান করতে পারে । প্রথমে ওদেরকে তিব্বতি ভাষায় লেখাপড়া শেখানো হয় । এরপর ওদেরকে হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষা পড়ানো হয় । সাথে থাকে ধর্মসংক্রান্ত কিছু বানী। এছাড়া ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপারেও জ্ঞান প্রদান করা হয়। পরিশেষে ধ্যান এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করতে হয় ।

থিয়াংবোচে মঠ থেকে খানিকটা দূরে ছোট পাহাড়ের মাথায় শেষপ্রান্তে খুদে লামাদের জন্যে কাঠের তৈরি বিদ্যালয় । বিদ্যালয়ের তিনদিক ঘিরে পাহাড়ি অরণ্য, অদূরে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী ইমজা খোলা ।

থিয়াংবোচে যেতে হলে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে বাসে যেতে হবে জিরি । সময় নেবে ১১ ঘন্টার মত । জিরি থেকে পায়ে হেঁটে লাগবে ১০ দিন । রাতে থাকবার জন্যে হোটেল বা পাহাড়িদের বাসস্থানে অল্প ভাড়ায় জায়গা পাওয়া যায় । খাবারও পাওয়া যাবে ওখানেই, কিন্তু খাবারের দাম একটু বেশি। জিরির পরে আসবে যথাক্রমে শিবালয়, ভাণ্ডার, সেথে, জুনবেসি, মণি,-ডিংমা, খারিখোলা, সুরকে, ফাকডিং এবং নামচে বাজার। কাঠমাণ্ডু থেকে ২১ মিটারের ছোট প্লেনে লুকলায় নেমেও যাওয়া যায় থিয়াংবোচেতে। লুকলা থেকে ৩ ঘন্টার ট্রেক ফাকডিং। ফাকডিং থেকে নামচে বাজার এবং তারপরদিন থিয়াংবোচে। থিয়াংবোচেতেও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে দু'তিনটে শেরপা লজে ।

নেপাল হিমালয়ের সোলো খুম্বু অঞ্চলের পাহাড়ী মানুষগুলির সরলতা অতি সহজে যে কোন আগন্তুককে আপন করে নেয় । ওদের দেশে বেড়াতে গিয়ে ওদের সংস্পর্শে এক অজানা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল ওদের সাথে । মিশেছিলাম লামা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। খুদে লামাদের সঙ্গেও। জেনেছিলাম ওদের জীবনের না বলা অনেক কথা । থিয়াংবোচে আমাকে তার পূর্ণতা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে ।

থিয়াংবোচের বৌদ্ধমঠ

স্ত্রী মিনতির সঙ্গে খেলানন্দ ঝা

ভালোবেসে অপরাধী

বিহারের মধুবনী জেলার ব্রাহ্মণ যুবক খেলানন্দ ঝা ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন হরিজন কন্যা মিনতিকে। প্রকারান্তরে একটি সরকারী নির্দেশই পালন করেছিলেন তিনি। কিন্তু জাতপাতের ভেদাভেদে দীর্ণ এই সমাজ এই সুখী দম্পতিকে ক্রমশই দুর্দশার দিকে ঠেলে দিয়েছে। খেলানন্দের টিকে থাকার সংগ্রাম এখনও চলছে। ন্যায়ের জয় কি এ সমাজে এখনও সুনিশ্চিত নয়!

মিনতির বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে আগুনে। মিনতি বাইরে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ে আকুল হয়ে চীৎকার করছে, ওগো আমার ছেলে আর মেয়ে যে ভেতরে রয়েছে, কেউ ওদেরকে বের করে আনো। আমার ছেলেমেয়ে কি দোষ করেছে, হে ভগবান!

কিন্তু ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রামের একটি লোকও এগিয়ে এল না! সবাই যেন অমানবিক একেকটি মূক জীব। শেষপর্যন্ত মিনতি আর পারল না। দৌড়ে ঢুকে গেল জ্বলন্ত ঘরের মধ্যে। বাচ্চাদুটিকে তখনো আগুনে সেভাবে আক্রমণ করতে পারেনি। মিনতি তার ছেলে কমল আর মেয়ে মঞ্জুকে বের করে আনল কোনক্রমে, কিন্তু নিজে পুড়ে গেল দারুণভাবে। হৃদয়হীন মানুষজন দূরে দূরেই থাকল, মজা দেখল তারা।

রাত আটটা নাগাদ ফিরে, খেলানন্দ ঝা এসব দেখে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মিনতির অবস্থা তখন খুব খারাপ। খেলানন্দ ব্যাকুল হয়ে জিগ্যেস করলেন এসব কি করে মিনু? কেন হল এমন? যন্ত্রণায় কাতর মিনতি কোনরকমে বলল, ওগো এরা আমাদের বাঁচতে দেবে না

খেলানন্দ কোনরকম করে একটি গরুরগাড়ি যোগাড় করে মিনতিকে ১০ কিলোমিটার দূরের লহেরিয়া সরাই মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে ইমার্জেন্সি–তে ভর্তি করে দিলেন। তার হাতে একটিও পয়সা নেই। অথচ, এসময় টাকার দরকার খুব। খেলানন্দ কয়েকজনের কাছে গেলেন, কিন্তু কেউ সাহায্য করল না। শেষে মাথাগোঁজার শেষ ঠাঁইটুকু তিনি বিক্রি করতে চাইলেন। সেটাও কেউ কিনতে চাইছিল না। অবশেষে বহু কষ্টে প্রতিবেশী গ্রামের জনৈক রহমত আলি খেলানন্দের এককাঠা বসত জমিটুকু হাজার পাঁচেক টাকায় বন্ধক নিলেন। মিনতিকে সারিয়ে তুলতে ৮,৫০০ টাকা বেরিয়ে গেল খেলানন্দের। নিঃস্ব হয়ে গেলেন তিনি।

খেলানন্দের বাড়ি বিহারের মধুবনী জেলায় টোলা সোনপুর গ্রামে। বাবার নাম ধ্রুবনারায়ণ ঝা। খেলানন্দ সবচেয়ে বড়। ধ্রুবনারায়ণের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। খেলানন্দ ১৯৭৪–এ ম্যাট্রিক পাশ করে পার্শ্ববর্তী মধেপুর গ্রামে একটি পানের দোকান খুলে বসলেন।

১৯৭৯ সালে বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর ঘোষণা করলেন, তাঁর রাজ্যে উচ্চ–বর্ণের কেউ যদি নিম্নবর্ণের জাতির সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে অবদ্ধ হয়, তাকে সরকারী চাকরি ও নগদ পুরস্কার ৫,০০০ টাকা দেওয়া হবে। সামাজিক কুসংস্কার ও বন্ধনমুক্তির উদ্দেশ্যে সরকার এই প্রচেষ্টা চালান। এই ঘোষণাটি সাড়ম্বরে প্রচারও করা হয়। খেলানন্দ মনে মনে তখনই নিজের কর্তব্য স্থির করে নিলেন।

মধেপুর নিবাসী ভুটন পাসোয়ানের বড় মেয়ে মিনতিকে ভালবাসতেন খেলানন্দ। মিনতি লাজুক ও নরম প্রকৃতির মেয়ে। মনে মনে সেও পছন্দ করত খেলানন্দকে। কিন্তু সে জানত হরিজন মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ছেলের বিবাহ এ সমাজে
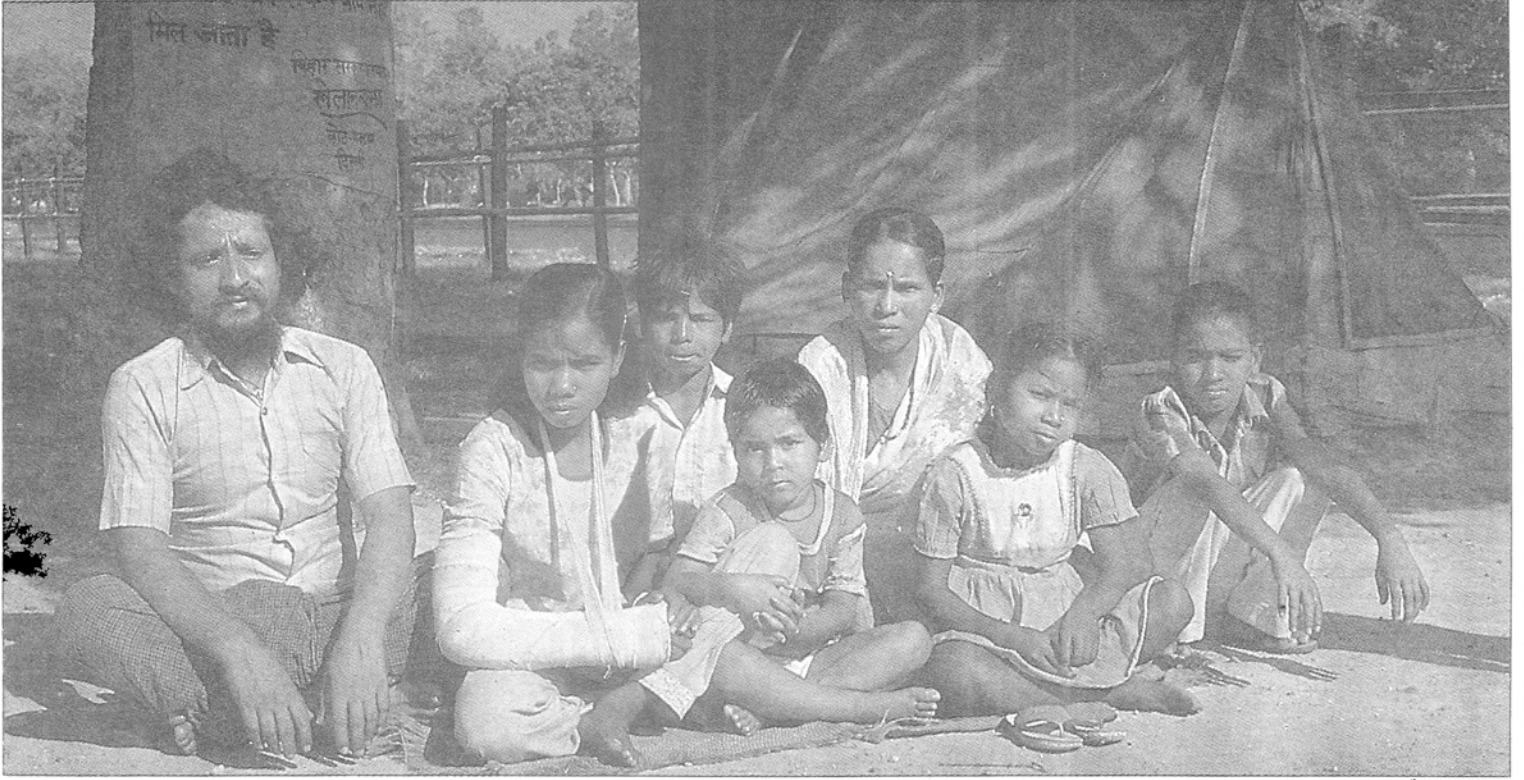
ঝা–এঁর পরিবার

কোনদিন সম্ভব নয়। একদিন খেলানন্দ একান্তে মিনতিকে বললেন, মিনু আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তোমার মত আছে ?

মিনতি লজ্জায় প্রথমে কিছু বলতে পারল না। খেলানন্দ বারবার জিজ্ঞেস করায় সে বলল, লোকে তো তাহলে সমাজে থাকতে দেবে না আমাদের। খেলানন্দ বললেন, সে সব আমি দেখব। তুমি রাজি তো ?

মিনতি লাজুক হাসে।

খেলানন্দ মিনতির বাবার কাছে গেলেন। ভুটনজী খেলানন্দকে বললেন, বাবা, তোমরা ব্রাহ্মণ। এবিয়ের পর তোমাকে ওরা জাতিচ্যুত করবে।

খেলানন্দ বললেন, আপনি সম্মতি দিন, বাকি সব আমি দেখছি।

ভুটনজী খেলানন্দকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু খেলানন্দের বাবা ধ্রুবনারায়ণ এ বিয়ে কিছুতেই স্বীকার করে নিলেন না। খেলানন্দ নিজের পরিবারের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৭৯–র ৭ অকটোবর মিনতিকে ঘরে নিয়ে এলেন।

খেলানন্দের বাড়িতে মিনতি ও খেলানন্দের সঙ্গে কেউ কথা বলত না। টিটকিরি দিত সবসময়। গ্রামের লোকেরাও খেলানন্দ ও মিনতির সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছিল। একটি হরিজন মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে ধ্রুবনারায়ণ নিজের পুত্র খেলানন্দকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণ ও হরিজন উভয় সম্প্রদায়ই এই বিবাহে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু খেলানন্দ ও মিনতি দুজনেই এসবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। পরস্পরের প্রতি প্রেম ও ভালবাসার জোরে এসব অপমান তারা তুচ্ছজ্ঞান করলেন।

ইতিমধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষকে খেলানন্দ নিজের বিবাহের কথা জানিয়ে পুরস্কার ও চাকরির জন্য আবেদন করে রেখেছেন। মধুবনী জেলার বি ডি ও এসে তদন্তও করে গেলেন। ১৯৮০ সালে মিনতির গর্ভে খেলানন্দের বড়ছেলে কমলের জন্ম হয়। খেলানন্দ দোকান চালিয়ে যা আয় করতেন, মোটা-মুটি চলে যেত। ১৯৮২ সালের জানুয়ারিতে বিহার সরকারের ৫,০০০ টাকা পুরস্কার খেলানন্দ আদায় করতে সমর্থন হলেন। ঐ টাকায় গ্রামেরই মধ্যে এককাঠা জমি কিনে খেলানন্দ সেখানে একটি থাকার মত ঘর বানিয়ে নিলেন। বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করলেন। সে বছরই মে মাসে দার-ভাঙ্গায় কমিশনারের অফিসে খেলানন্দ চতুর্থ-শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন।

মিনতির আনন্দ আর ধরে না। এত সুখ সে আশাও করেনি। কিন্তু তাদের অজ্ঞাতে ভাগ্যাকাশে জমছে কালো মেঘ। হরিজন মেয়েকে বিয়ে করার 'অপরাধে' অফিসের লোকজন খেলানন্দকে সব-সময় উত্ত্যক্ত করতে শুরু করল। কয়েকজন উত্তরওলা সহকর্মী তো নানাভাবে খেলানন্দকে হেনস্থা করতেও শুরু করলেন। খেলানন্দ সহ্য করতে না পেরে তৎকালীন কমিশনার জে এম লিংডো–র কাছে অভিযোগ জানালেন। লিংডোসাহেব সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাছে জবাবদিহি চাইলেন। এতে অফিসের উক্ত কয়েকজন অফিসার আরো ক্রুদ্ধ হলেন।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২। অফিসে একজন অফিসার মুকুল দেব ঘন্টা বাজালেন। খেলানন্দ দৌড়ে গেলেন। মুকুল দেব জল চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টা বাজালেন কমিশনার সাহেবের বিশেষ সচিব এম এস কুমার। খেলানন্দ দৌড়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত বিলম্বের জন্য কুমার সাহেব অকথ্য ভাষায় গালি দিলেন খেলানন্দকে। ওদিকে, মুকুল দেব ফের ঘন্টা বাজালেন। এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে খেলানন্দকে নিয়ে ওঁরা মজা কর-ছিলেন। কমিশনার সেসময় বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ ব্যাপারটা দেখার পর খেলানন্দকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন, অফিসার দুজনকে সামান্য ভর্ৎসনা করলেন। পাঁচ ছ'দিন পর, ৪ অক্টোবর, কমিশ-নার খেলানন্দকে ডেকে পুরো ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলেন।

খেলানন্দ সব কথা খুলে বললেন, তাঁর দুর্দশার কথা। হরিজন মেয়েকে বিয়ে করায় তাঁর ওপর যেসব সামাজিক অত্যাচার চলছে, সেসবও বল-লেন। কমিশনার বললেন, অফিসে কে কে তোমাকে বিব্রত করে, তাদের নাম লিখে দাও, খেলানন্দ ছ'জন অফিসারের নাম লিখে দিলেন। কমিশনার সাহেব অফিসে নোটিশ দিলেন, খেলানন্দকে যে কর্মচারী বিব্রত করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৯ অকটোবর ১৯৮২ খেলানন্দ ও মিনতির

একটি মেয়ে হয়, মঞ্জু। এরপর, ২৭ ডিসেম্বর তারিখে অফিসে ফের একটা গণ্ডগোল ঘটে। সেদিন কমিশনার সাহেব ছিলেন না। কুমার সাহেব ছিলেন তার চেয়ারে। তিনি খেলানন্দকে হঠাৎ নির্দেশ দিলেন, কমিশনারের চেয়ারে বসে চা খাওয়ার অপরাধে তোমার ৫ টাকা জরিমানা! খেলানন্দ নিজেকে কিভাবে নির্দোষ প্রতিপন্ন করবেন? সবাই যে তার বিরুদ্ধে। মিছেমিছি বেচারাকে ৫ টাকা দিতে হল। ৪ জানুয়ারি ১৯৮৩ কমিশনার জয়েন করার পর খেলানন্দ ঐদিনের ঘটনা তাঁকে অবহিত করলেন। কমিশনার সাহেব সবই বুঝলেন। তিনি কুমার সাহেবকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, খেলানন্দের ৫ টাকা ফেরৎ দিন। কিন্তু এই হৃদয়বান কমিশনার বদলি হয়ে গেলেন ৮৩'র মার্চে। নতুন কমিশনার এলেন এস পি এন সিনহা।

জুন মাসের ১৩ তারিখে খেলানন্দ অসুস্থ ছেলের জন্য ওষুধ কিনতে গেছেন অফিস থেকে। যাওয়ার আগে জনৈক অফিসার জগদীশ ঝা'র কাছে অনুমতি নিয়ে গেছেন। অফিসে ফিরে আসতেই জগদীশ ঝা খেলানন্দকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলে? তাড়ি খেতে নাকি? খেলানন্দ বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনাকে যে বলে গেলাম স্যর? জগদীশ ঝা বললেন, মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি? এম এস কুমারও ছিলেন ঘটনাস্থলে। বিনা অনুমতিতে অফিস ছেড়ে যাওয়া ও তাড়ি খেয়ে অফিসে আসার জন্য খেলানন্দের ফের ৫ টাকা জরিমানা হল। পরদিন, ১৪ তারিখে, খেলানন্দ কমিশনার সিনহার কাছে একথা জানালেন। সিনহা সব শুনে তাঁর জরিমানা মকুব করে দিলেন।

এরপর মিনতির শরীর খুব খারাপ হতে থাকে। তার চিকিৎসার পেছনে খেলানন্দের সব জমানো টাকা খরচ হয়ে গেল। অফিসও কামাই হত মাঝে মাঝে। ২৭ মে মিনতির অবস্থা খুব খারাপ—এর দিকে গেলে খেলানন্দের অফিস কামাই শুরু হয় আবার। ৩ জুন খেলানন্দ অফিসে গেলেন। ঐদিন মাইনেও হবে। খেলানন্দ গেলেন মাইনে নিতে।

ক্যাশিয়ার মহেন্দ্র মিশ্র ছুটিতে ছিলেন। বিল ক্লার্ক কৃষ্ণপ্রসাদ ছিলেন সে জায়গায়। তিনি মাইনে না দিয়ে উল্টে খেলানন্দকে অকথ্য গালি দিয়ে অফিস থেকে বের করে দিলেন। খেলানন্দ প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। ১২ জুন খেলানন্দ অফিসে গেলেন। মাইনে না নিয়ে চুপচাপ ডিউটি করে যেতে লাগলেন।

শ্রী কুমার তাঁকে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগও দিলেন না, কোনো দরখাস্তও খেলানন্দের কাছ থেকে নিলেন না। বললেন, তোমার চাকরি চলে গেছে। খেলানন্দ কিন্তু রোজই অফিস যেতে থাকলেন। কমিশনার অফিসের কয়েকজন অফিসার খেলানন্দকে উচিত শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁরা টোলা সোনপুরের কিছু লোকজনকেও সঙ্গে পেয়ে গেলেন। খেলানন্দ ২৪ জুন দ্বারভাঙ্গা গিয়েছিলেন, নিজের চাকরির ব্যাপার নিয়ে। ঐদিন সন্ধ্যেয় ফিরে দেখেন, তার বাড়িতে কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সেদিনকার ঘটনা আগেই বলা হয়েছে।

মিনতিকে সঙ্গে নিয়ে খেলানন্দ পাটনায় গিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রশেখর সিংহের সঙ্গে দেখা করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁর বিশেষ সচিব দ্বারভাঙ্গার কমিশনারকে চিঠি লিখলেন, খেলানন্দের সমস্ত মাইনে মিটিয়ে ওঁকে অবিলম্বে কাজে বহাল করুন।

এই চিঠি কুমার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা চেপে গেলেন। খেলানন্দ চাকরিতে বহাল হলেন না। বহু চিঠি তিনি বহু জায়গায় পাঠালেন। কিছুতেই কিছু হল না। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ খেলানন্দ সপরিবারে দিল্লি চলে এলেন। কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে দেখা করলেন। কোনো লাভ হল না।

অবশেষে, খেলানন্দ ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে বোটক্লাবে অনশন শুরু করলেন। ১৩ দিন পার হয়ে গেল। দিল্লিতে খেলানন্দকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। সংসদেও প্রসঙ্গটি ওঠে। অটলবিহারী বাজপেয়ী, চন্দ্রশেখর, জগজীবন রাম এঁরা খেলানন্দের সঙ্গে গিয়ে কথা বললেন। কিছু ব্যক্তি খেলানন্দকে নানাভাবে সাহায্যও করলেন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিশেষ পরামর্শদাতা এম এল ফোতেদার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বিন্দেশ্বরী দুবেকে দিল্লী ডেকে পাঠালেন। দুবেজী দিল্লী এসে খেলানন্দের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি খেলানন্দের সব দাবি মেনে নিলেন।

৮ অকটোবর ১৯৮৫ খেলানন্দ অনশন ভঙ্গ করলেন। ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে। দ্বারভাঙ্গা কমিশনারের অফিসে পৌঁছে তিনি ফের হতাশ হলেন। তৎকালীন কমিশনার শ্রী চক্রবর্তী বললেন, কই কোনো সরকারী আদেশ তো এসে পৌছায়নি! খেলানন্দ ছুটলেন সাহারসায়। তার দাবি অনুযায়ী এখানে তার বদলি হওয়ার কথা, কিন্তু সেখানেও কোনো সরকারী আদেশ পৌঁছয়নি। খেলানন্দ সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন ততদিনে। তিনি ফের ছুটলেন পাটনায়। মুখ্যমন্ত্রীর সচিব এ হরিহর সুব্রাহ্মণ্যম জানালেন, তোমার জন্য আর কিছু করা সম্ভব নয়।

ভেঙে পড়লেন খেলানন্দ। তিনি সপরিবারে শ্বশুর মশাই-এর কাছে জলপাইগুড়িতে চলে গেলেন। সেখানে ভুটন পাসোয়ান একটি চা-বাগানে কাজ শুরু করে ছিলেন। খেলানন্দ এস. ডি. ও অফিসের সামনে একটি পান সিগারেটের দোকান খুলে বসলেন। এস.ডি.ও. বলবীর রামদাস খেলানন্দকে ভালবাসতেন। এস.ডি.ও.কে একদিন খেলানন্দ নিজের দুঃখের কথা সব জানালেন। রামদাস বললেন, তোমার হেরে যাওয়া ঠিক হবে না খেলানন্দ। চালাও লড়াই। আমি আছি তোমার সঙ্গে। তোমায় ৫০০ টাকা দিচ্ছি, ফের দিল্লি যাও।

স্ত্রী ছেলেমেয়ে ও শ্যালিকা বাসন্তীকে নিয়ে নতুন উৎসাহে খেলানন্দ আবার দিল্লী এলেন। ২৭ জানুয়ারি থেকে ৬ জুন অবধি তারা বোটক্লাবে ধরণা দিলেন, কোনো লাভ হল না। ৭ জুন থেকে খেলানন্দ অনশন শুরু করলেন। প্রচণ্ড গরমে, তাপপ্রবাহে খেলানন্দ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ঘটনা শুনে বিহার-ভবনের পি.আর.ও. মুক্তিনাথ কিছু পুলিশসহ বোটক্লাবে এসে খেলানন্দকে নিয়ে গেলেন। রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাঁকে ফের বোট ক্লাবে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। এবং এভাবেই চলতে থাকল। যতবার খেলানন্দের অবস্থার অবনতি ঘটে, খবর পৌঁছে যায় মুক্তিনাথের কাছে। পুলিশ আসে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, ফের পৌঁছে দেওয়া হয় বোট ক্লাবে।

মাস ছয়েক পর কিছু নেতা দেখা করতে এলেন। কিছু সংস্থা টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করলেন। দিল্লিতে কর্মরত খেলানন্দের এক ভাই বেদনানন্দও হঠাৎ দাদার প্রতি এতদিনে সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠলেন। সৈফুদ্দিন চৌধুরী, অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রমুখ নেতাদের অনুরোধে শেষপর্যন্ত ২৪ নভেম্বর ১৯৮৮ খেলানন্দ অনশন তুলে নিলেন। ইতিমধ্যে ১৭ নভেম্বর রাত্রে তুঘলক রোড থানার পুলিশ এসে খেলানন্দকে সপরিবারে থানায় নিয়ে গিয়ে শাসায়, তাঁর বোটক্লাবের আস্তানা ভেঙে দেয়। পুলিশ গাড়ি করে নিয়ে চিত্তরঞ্জন পার্কে নামিয়ে দেয়। ঠাণ্ডায় সারারাত ছেলেমেয়েসহ খোলা আকাশের নীচে থেকে সকালে খেলানন্দ ফের ফিরে আসেন বোটক্লাবে।

৬ এপ্রিল ১৯৮৯। বিঠলভাই প্যাটেল ভবনে সি পি আই-সি পি আই-এম-এর বাসুদেব আচার্য, অনিল বসু, অনিল সাহা, গীতা মুখার্জী প্রমুখ নেতারা খেলানন্দ ও তার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন, কিভাবে এগনো যায়। এসময় বোটক্লাব ফাঁড়ির দুই সেপাই সতবীর সিংহ ও রামকুমার খেলানন্দের আস্তানায় গিয়ে তার শ্যালিকা ও ছেলেমেয়েকে বেদম পেটায়। টেন্ট তছনছ করে দেয়। ছেলে কমল কোনক্রমে পালিয়ে বোটক্লাবের কাছেই সৈফুদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে সবকথা জানায়। শ্রীমতী চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে বিঠলভাই প্যাটেল ভবনে টেলিফোন করেন স্বামীকে। সৈফুদ্দিন চৌধুরী অতঃপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংহকে এই ঘটনার কথা জানালেন। বুটা সিংহ অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার বিজয়-করণ এর কাছে জবাবদিহি চাইলেন টেলিফোনেই।

৬ এপ্রিল সৈফুদ্দিন চৌধুরী লোকসভায় প্রসঙ্গটি উত্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু স্পীকার বলেন, এটি বিহার রাজ্য-সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়।

এরপর এই বিষয়টি আবার পার্লামেন্টে ওঠে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে সহানুভূতি প্রকাশ করে বিবৃতি দেন।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত খেলানন্দের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতই রয়ে গেছে।

মুকেশ মধুর

সীতারাম ওঁকারনাথের মহামিলন মঠ

দিব্যপুরুষ সীতারাম ওঁকারনাথ মহাপ্রয়াণে গেলেও নামগানের অমৃতসৌরভে মহামিলন মঠের কর্মকাণ্ডে অমর হয়ে আছেন তাঁর উত্তরধারার মধ্য দিয়ে। ঠাকুর সীতারামের উত্তরপুরুষরা প্রান্ত কলকাতার মুখ্য কার্যালয় থেকে কিভাবে ওঁকার-আদর্শ বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন? মঠ ও মহামানবের কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে এক অর্নিবচনীয় ভক্তি-আলেখ্যর দিকে আলোকপাত।

প্রজ্ঞায় আকাশের তামাম নভঃমণ্ডল পরিব্যপ্ত। দৃষ্টি ব্যাপ্ত বিশ্বময়। স্থির মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল আভা। কপালে চন্দন চর্চিত দিব্যতা। ডান হাতে 'ওঁ' দণ্ড। শরীরের সর্বাংশ শ্বেতফুলে আবৃত। পা দুটি উন্মুক্ত। সিংহাসন পরিবেষ্টিত শ্বেতপদ্মে। সারা ঘরে বিরাজ করছে নীরবতা। শ্বেতফুলে আবৃত সিংহাসনে চলকে পড়ছে আলোকরশ্মি। বাতাসে ধীরে ধীরে অনুরণিত হচ্ছে সমবেত স্তোত্র। ভক্তদের মানস লোকে উদ্ভাসিত ওঙ্কারনাথ।

সেদিনটি ছিল জন্ম তিথি। বাতাসে ভেসে আসছে শংখধ্বনি। ভক্তদের কেউ কেউ মঙ্গল প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন। উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ চলছে। মন্ত্রোচ্চারণ শেষে নামসংকীর্তন। বিভোর ভক্তমণ্ডলীর মাঝে উঠে এলেন তিনি। প্রত্যেকের কপালে হাত ছুঁইয়ে দিলেন ওঙ্কারনাথ।

সহস্র অতিমানুষী কীর্তির নায়ক ওঙ্কারনাথকে ঘিরে রচিত হয়েছে অজস্র কাহিনী। ভক্তদের প্রেমের ঠাকুর ওঙ্কারনাথের তামাম জীবন মানুষের সেবাতে নিয়োজিত। কিংকর বিঠ্‌ঠল রামানুজের লেখা 'নব নব রূপে এসো' পুস্তকে ওঙ্কারনাথ মাহাত্ম্যের কথা লেখা আছে এমনি অনেক উদাহরণ দিয়ে। কিংকর বিঠ্‌ঠল 'তৃণাদপি সুনীচেন' অধ্যায়ে লিখেছেন, 'নাম আর নামী অভিন্ন। তার মানে? তার মানে এই–শ্রীভগবান যেমন পতিত পাবন, তাঁর নামও তেমনই পতিতপাবন। শ্রী ভগবান যেমন বাঞ্ছাকল্পতরু, শ্রী ভগবান যেমন সর্বশক্তিমান, তাঁর নামটিও তেমনি। ভিন্ন লোক, ভিন্ন রুচি। তাই দয়াময় জগতে অসংখ্য নাম প্রচার করলেন, আর তার প্রত্যেকটিতে অর্পণ করলেন 'নিজ সর্বশক্তি'। তিনি বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে, 'নামের দ্বারা সর্বসিদ্ধি হয় এই মহাবাক্য না হয় শিরোধার্য–কিন্তু নামে অনুরাগ আসবে কোথা থেকে?' প্রকৃত কথা হলো নাম ও নামীতে গাঢ় রতি।

কঠোর সাধনার আরেক নামই সিদ্ধি প্রাপ্তি। সাধনা করতে গেলে চাই সঠিক গুরুসেবা। সীতারামের গুরু সেবা উদ্দালককেও হার মানিয়ে ছিল। গুরুসেবাতে মগ্ন সীতারাম সমাধিতে বসে বিশ্বরূপ দর্শন করতেন। সেই সময় থেকে সমাধিস্থ সীতারাম আবিষ্কার করেছিলেন বিশ্বরূপ। বিশ্বের আপামর মানুষের কল্যাণ সাধনাই হবে তাঁর লক্ষ্য।

সমাধি ভঙ্গ হলে নাম মহিমা প্রচারে বেরিয়ে পড়া। ওঁ মন্ত্র উচ্চারণে ছিল পরম প্রাপ্তি। সীতারামের জীবনভূমি তাই নামমহিমাতে উদ্দীপ্ত। সবাইকে প্রেমদান করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এই প্রেম মহিমার আকর্ষণ রীতিমত দুর্নিবার। ওঙ্কারনাথের প্রেম মানুষ–ধর্ম নির্বিশেষে। বয়স জাত নির্বিশেষে তার ভাবোন্মাদ প্রেম। এই প্রেম অক্ষয় এবং সর্বজনকে বিলিয়েও অনিঃশেষ থাকে। শিশুর মত সারল্য ছিল তার ভাবোন্মাদ প্রেম বিনিময়ে। এ যেন সম্ভবামি যুগে যুগে।

অলৌকিকত্ব প্রদর্শনে সীতারাম তাঁর ভক্তদের বলতেন, 'তোদের কপাল খারাপ, সব সাধক মহাপুরুষেরা কত অলৌকিকত্ব দেখিয়েছেন, তোদের গুরুর কোন ক্ষমতাই নেই।' একথা ঠিক যে ওঙ্কারনাথ তথাকথিত অলৌকিক জারিজুরি দেখাতেন না। কিন্তু ভক্তদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বহু ক্ষেত্রে তিনি অসুস্থদের সারিয়ে তুলেছেন। অনেক সময় রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হবার পর রোগ সেরে গেছে। অলৌকিক ভোজবাজি সম্পর্কে তার সতর্ক বাণী, 'তাতে লাভ কি হবে? ম্যাজিক দেখতে হাজার হাজার লোক ছুটে আসবে। এমনিতে তোরা লোক ঠেকাতে পারছিস না। আর ওসবে কি আছে? শান্তি আছে ভগবানের নামগানে। দীক্ষা পেয়েছিস, জপধ্যান কর, গুরুসেবা কর। তার দ্বারাই পরমানন্দ লাভ করবি।'

অলৌকিকত্ব দেখা দিয়েছে অন্যরূপে। সেটা হলো নাম মহিমায়। তাঁর কাছে নাম যদি আধ্যাত্ম জীবনের অন্ন হয়, প্রণাম হলো তার সহকারী পানীয়। 'এই উৎকট ভবরোগের উপশম যদি হয় নামৌষধে, প্রণাম হলো তার অনুপান। সেই মন মাতাল দেশে প্রবেশাধিকার দেবার কর্তাব্যক্তি যদি হয় নাম বিগ্রহ, প্রণাম হলো তার নিত্য সহচর।' প্রেম আপ্লুত সীতারাম বলেছেন,

ব্রহ্মাদি স্তম্ভপর্যন্তং যস্য সে গুরু সন্ততিঃ।
তস্য মে সর্বশিষ্যস্য কো ন পূজ্য মহীতলে॥

এই সাধক বিশ্বগুরু নন, সর্বশিষ্য। শিষ্য ভক্তদেরই তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'তুমি যে দণ্ডরূপী ভগবান।' পিছু অনুসরণ করা কুকুরটিকে পর্যন্ত তিনি ইষ্টদেব বলেছেন।

সীতারাম সম্পর্কে কিংকর অভয়ানন্দ লিখেছেন, 'আক্ষরিকভাবে প্রায় জন্ম অবধি ওই রূপ দেখছি। খুব শিশুকাল থেকে খেলাচ্ছলে তাঁর ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি পেন্সিলে, চকখড়ি দিয়ে। এই দাড়ি গোঁফ আঁকলাম। এই আঁকলাম হাড় জিরজিরে শরীর, বুকে দুই টানে দিলাম দুটি খড়ম, মাথায় জড়িয়ে দিলাম হিজিবিজি জটার পাগড়ি। তারপর লম্বা চওড়া কপালে যত্ন করে এঁকে দিলাম তিলক। মাঝে লাল দিয়ে শ্রী'র দাগ। গলায় ঝুলিয়ে দিলাম তিন লহর তুলসির মালা। হয়ে গেল সীতারাম।'

সীতারামের চেহারা কেমন ছিল? কিংকর অভয়ানন্দ লিখেছেন, 'কখনো ফর্সা দেখেছি, কখনো রক্তাভ তামাটে, কখনো শ্যামল। চোখ দুটি কেমন ছিল? কখনো জ্বলজ্বল করতো, প্রখর রোদের মত। কখনো প্রায় বুঁজে আসা। কখনো কাঁচের মত স্বচ্ছ, ভাবহীন। কখনো উদাস, গম্ভীর–একটু বা বিষণ্ণ। কখনো চোখের মধ্যেই খিলখিল হাসির ফুলঝুরি।' কেমন ছিল তাঁর বেশবাস? অভয়ানন্দ লিখেছেন, 'হাঁটুর একটু ওপরেই তো শেষ ফর্সা সুতীর সাদা বহির্বাস। গায়ে দিতেন সাদা শুদ্ধ বস্ত্রের চাদর।' নামাবলী পরার ব্যাপারেও অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। কখনো সখনো মনে হতো জটাধারী শিব বুঝি সখ করে তিলক, পীতধরা আর মালা পরেছেন। আবার কখনো বা কৌপীনধারী।

তামাম ভারতবর্ষে অসংখ্য ভক্ত শিষ্য, ভারতের বহু জায়গাতেই ওঙ্কারনাথের মঠ আছে। তাঁর প্রেমভাবে সাড়া দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে। তাদের কেউ বিশিষ্ট, কেউ বা অতি সাধারণ। কলকাতার বহু মানুষ সীতারামের মহিমা উপলব্ধি করেছেন। কলকাতা দূরদর্শনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিভাগে কর্মরত বিশ্বজিৎ মিত্রর অভিজ্ঞতার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। বিশ্বজিৎ সীতারামের পরম শিষ্য। তাঁর কথায়, 'ছোটবেলা থেকে কখনই এই সব বিশ্বাস করতাম না। তবে আমার মা ঠাকুরের শিষ্যা ছিলেন। ঠাকুর বলতে তিনি অজ্ঞান। মাঝে মাঝে তাই মার সঙ্গে খুনসুটি করতে ছাড়তাম না। মা রাগ করতেন, তবে মাঝে-মাঝে বলতেন একদিন তোরও সময় আসবে দেখবি তখন ঠাকুরের পায়ে তোকে মাথা নোয়াতে হবে।' বিশ্বজিৎ জানালেন, 'মার কথাটা যে এভাবে সত্যি হয়ে যাবে ভেবে অবাক লাগে। সেই সময়টা আমার মন ভীষণ ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। চারদিকে এমন একটা অব্যবস্থা চলছিল যে নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ভাবছিলাম এর থেকে মরে যাওয়াই শ্রেয়।'

...পথ দেখালেন আমার দিদি। ঠাকুরের কয়েকটা বই দিলেন। বললেন, বইগুলো পড়িস মনটা ঠিক থাকবে। এরপর কেমন যেন হয়ে গেলাম। মাকে বললাম, আমি ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করব। মা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হয়ত আমার পরিবর্তনে। তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন শিষ্য হব বললেই তো আর হওয়া যায় না। আগে চিঠি দাও যদি উত্তর দেন তবে যেও। মায়ের কথায় প্রথমে ভীষণ অভিমান হয়েছিল। ভেবেছিলাম যদি সত্যিই সন্ন্যাসী হন তাহলে চিঠি দিয়ে অনুমতি নিতে হবে কেন? যাক মায়ের কথা মতন চিঠি লিখলাম। দুপৃষ্ঠার একখানা চিঠি। উত্তর এল। তাতে লেখা ছিল ক) জগদীশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। খ) একটা শ্বাসও যেন বৃথা না যায়। গ) এইসা দিন নেহি রহেগা।

একটু থেমে বিশ্বজিৎ আবার বললেন, 'চিঠি পাওয়ার পর কি যে হল কিছুই জানি না। ঠাকুরকে ২২ পৃষ্ঠার একখানা চিঠি লিখলাম। উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। '৭৮ সালের কথা–উনি পুরীর চক্রতীর্থে মৌনব্রত পালন করছেন। স্বামী স্ত্রী আর এক মেয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। ঠাকুরের কাছে কয়েকদিন থাকলাম। তারপর বললেন, তোকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমি বললাম, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

ওখানে আমার প্রায়শ্চিত্ত হল। উনি আমায় মন্ত্র দিলেন, সঙ্গে আমার স্ত্রী এবং কন্যাকেও মন্ত্র দিলেন। মন্ত্র নিলাম। যেন মনে হয় একটা অবলম্বন পেলাম। ঠাকুর মন্ত্র দেবার পর বলেছিলেন ডিম, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, মাছটা খাস না। সেই '৭৮ সাল থেকে আমি নিরামিষ খেয়ে যাচ্ছি। কোন

অসুবিধে নেই। এখন নিজেকে অনেক মুক্ত মনে হয়। কাজ কিংবা সাংসারিক চাপে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আসলে ঠাকুরের নাম করি। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

সীতারামের অতীন্দ্রিয় শক্তি মহিমার কথা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট পণ্ডিত, রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছেন, 'বহু বছর আগের কথা। এখন চোখের সামনে ছবির মতন ভেসে ওঠে। দেশ বিভাগের মর্মান্তিক পরিণতিতে আমাদের তখন চরম দুরবস্থা। জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত সেইসব দিনগুলি তখন অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। মনে হয় গভীর সমুদ্রে দিকচক্রবাল রেখার সন্ধানে আমরা তখন হাপিত্যেস নয়নে চেয়ে আছি। মাঝে মাঝে চোখটা ঝাপসা হয়ে আসে। চোখের সামনে থেকে সব কিছু মুছে যায়। কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে চোখের জল। জিভ ঠেকালে নোনতা স্বাদ।

পিতৃদেব বিত্তহীন হয়েও কেবলমাত্র চিত্তের ঐশ্বর্য্যকে অবলম্বন করে সংস্কৃত অধ্যাপনার মাধ্যমে মধ্যজীবনে নতুন ভাবে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ। এমন সময় হুগলী সরকারি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোজকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের (পিতা পুত্রকে) ডুমুরদহে নিয়ে এলেন। সেদিন ঠাকুরের পদতলে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা হলেন কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত রণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা উপস্থিত হওয়া মাত্রই পিতাপুত্রকে ঠাকুর দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন যেন আমরা কতদিনের পরিচিত। অভিভূত হলাম। এরপরই আমার আধ্যাত্ম রহস্যের উন্মোচন। শক্তি ও শান্তির জন্য দীক্ষার প্রয়োজন অনুভব করলাম। কুলগুরু বহু পূর্বে স্বর্গত। শাস্ত্রশাসিত ব্রাহ্মণ্য ধারায় চলতে চাই। শ্রী শ্রী ঠাকুরের পন্থাই আমার পরিবারিক পরম্পরায় অনুকূল। যেন জন্ম জন্মান্তর ধরে তাঁরই চরণচারণ করে আসছি। পিতৃদেবের অনুমতি নিলাম। আমার স্ত্রী ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ করতে চাইলেন। ঠাকুরের কাছে মনের কথা খুলে বলতেই তিনি বললেন, 'এক লক্ষ গায়ত্রী জপ করো। তারপর হবে।'

ধ্যানেশবাবু একটু থেমে আবার শুরু করলেন, 'ছেলেবেলা থেকে সকাল বিকেল সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করি। সন্ধ্যাহ্নিক না করে মুখে কিছু দিই না। আপনি বরং আমাকে মন্ত্র দিয়ে দিন। আমার মতে আমি তো যোগ্যই। স্নেহের সঙ্গে তিনি জানালেন দৈনিক হাজার করে জপ করলে তিন মাসের মধ্যেই লক্ষ গায়ত্রী জপ হয়ে যেতে পারে। এইটুকু সময় যদি না দিতে পার, তাহলে তোমার মন এখনও তৈরি হয়নি ধরে নিতে হবে। বাধ্য হয়ে তাঁর কথা মেনে নিলাম। তিন মাস পরে এক দোলপূর্ণিমার পুণ্যদিনে শ্রীক্ষেত্রে নীলাচল আশ্রমে তাঁর মৌন কুটিরে নিভৃতে এই দম্পতিকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করলেন।

এখন তাঁর অবর্তমানে তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি। আশ্রমের কাজে লিপ্ত। আশ্রমের কাজের মধ্যে দিয়ে ঠাকুরের ভাবধারাকে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছি সর্বসাধারণের মধ্যে।'

অভিজ্ঞতার শেষ নেই। সীতারামের মহিমা উপলব্ধি করার জন্য যেমন বর্তমানের শিষ্য শিষ্যাদের অভিজ্ঞতা তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, তেমনই অতীতের একটি ঘটনা সীতারামের অতীন্দ্রিয় শক্তির জ্বলন্ত পরিচায়ক। এটি ১৯৪২ সালের ঘটনা। এক শিষ্য পরীক্ষা দিতে গিয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব হলো না। অসুস্থ অবস্থাতে ফিরে এলেন শিষ্যটি। যেন শরীরের সর্বশক্তি ঝরে গেছে তার। ব্যর্থতাতে ভেঙে পড়েছেন তিনি। রাতে অঘোরে ঘুমিয়ে আছেন। এমন সময় মাথার সামনে একটা টোকা শুনতে পেলেন। আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলেন উজ্জ্বল আলোকশিখার মত তিনি দাঁড়িয়ে। একটি হাতে অভয়বাণী। অতঃপর শিষ্যটি আবার পড়াশুনো শুরু করলেন। সীতারামের অলৌকিক শক্তির এটি একটি জ্বলন্ত উদাহরণ বলা যেতে পারে।

ওঁকারনাথ, হিমালয়ের পথে

ওঙ্কারনাথের দর্শন কি? কিংকর বিদ্যানন্দ, যিনি স্কটিশ চার্চের অধ্যাপক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (পার্টটাইম) লেকচারার–যিনি বলেছেন, 'চার্বাক দর্শনে একটা কথা আছে তাহলো যাবৎ জীবেত সুখং জীবেত, ঋণং কৃত্বয়া ঘৃতং পিবেত। অনেকের কাছে ব্যাপারটা সত্য হলেও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে একটা কথা আছে, 'ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা।' এর সঙ্গে আর একটি কথা বলে রাখি, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। এখন কথা হচ্ছে কাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দেব। ঈশ্বরে ভক্তিটা হচ্ছে এমন একটা বস্তু যে যেভাবে গ্রহণ করে।'

'আজকের দিনে অনেকেই ব্যাপারটাকে তর্কের মাধ্যমে নিয়ে যেতে চায়। এবং তার মধ্যে থেকে একটা ফয়দা তুলে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু বিষয়টা ঠিক নয়। ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বা তর্ক করা ঠিক নয়। বর্তমান যুক্তি তর্কের সময়। আমরা যে কোন বিষয়কেই যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি। এমন কি ঐশ্বরিক শক্তির ব্যাপারেও।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। অর্থাৎ আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগতের আশেপাশে যা কিছু দৃশ্যমান সবই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা সেই মায়াবলে জগতের যা কিছু সব কিছুকেই রঙীন দেখছি। কিন্তু ব্রহ্ম হচ্ছে চির সত্য, এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রহ্মকে জানতে পারলেই আমাদের জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে। এর একমাত্র পথই সাধনা। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের পরিচয় ঘটান গুরু। তাই আমি ওঙ্কারনাথের শিষ্য। ঠাকুরের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আমার ভগবানের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। তর্ক বিতর্কের পথে কোন কিছুর পরিচয় ঘটে না। বিশ্বাসের পথই সব।'

বিদ্যানন্দর কথায়, 'ঠাকুরের কাছে মন্ত্র নেওয়ার পর আমি কিংকর বিদ্যানন্দ নামে পরিচিত। কেন মন্ত্র নিলাম? এ প্রসঙ্গে বলি প্রত্যেক মানুষের একটা অবলম্বন দরকার। মানুষ যখন সাংসারিক এবং পারিপার্শ্বিক চাপে অসহায় বোধ করে, যখন নিজের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে

কিঙ্কর বিঠঠল রামানুজ

তখন আশ্রয় চায় ঈশ্বরের কাছে। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। ঠাকুরের দেওয়া মন্ত্র জপ করে শান্তি পাই।

যে যাই বলুক, যে যাই ভাবুক, সত্য চিরকাল সত্য, সূর্য চিরকাল সূর্য। পূর্বদিগন্ত রক্তরাগ রঞ্জিত করে যখন স্বয়ং জ্যোতির পুণ্য আবির্ভাব ঘটে, তখন সেই আবির্ভাব কারও সমর্থন, কারও ঘোষণার অপেক্ষা রাখে না। সেই পুণ্যমুহূর্তে যারা দুয়ার রুদ্ধ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে, তারা ভাগ্যহীন।

আজকের দিনে অনেকেই ঈশ্বর নিয়ে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন, তাই সাধারণের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আস্তেআস্তে কমে যাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বর ব্যবসার বস্তু নয়। মানব সেবা ঈশ্বর সাধনার একমাত্র পাথেয়। আমরা সেই মানব সেবার পথে ঈশ্বর সাধনায় লিপ্ত। ঠাকুর আমাদের তাঁর পদতলে আশ্রয় দিয়েছেন সেই মানব সেবার উদ্দেশ্যেই।'

সীতারামের পরম মহিমার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ঠাকুরের নাতি পরাশর চট্টোপাধ্যায়–এর কথা

সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কথায়, 'ঠাকুর ছিলেন প্রেমের ঠাকুর। প্রেমানন্দে তিনি সকলকেই কাছে টেনে নিতেন। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার অবতারণা করি। ১৯৭৮ সাল, ডিসেম্বরের শেষ ভাগ। হল্যান্ড থেকে এক যুগলমূর্তি বহু অনুসন্ধানের পর সেখানে এসে উপস্থিত। ছেলেটির নাম বেসিন। মনস্তত্ত্ববিদ। বয়স ৩৬। আর মেয়েটির নাম লিউনি। বয়স ২৯। বসনভূষণে দারিদ্র্যের ছাপ। উভয়েই ঠাকুরের কাছে 'নারাধরা দীক্ষা প্রার্থী।' ঠাকুর তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন। তাদের দ্বিতীয় প্রার্থনা হল তারা দুজনেই অবিবাহিত। তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ঠাকুরের পুণ্য উপস্থিতিতে তারা বিবাহ করে।

ঠাকুর শুনে প্রসন্ন হলেন। কিন্তু চার্চে বিবাহ দেওয়ায় একটা অসুবিধা দেখা গেল। কারণ বর-কনে তাদের দেশের যে চার্চের অন্তর্ভুক্ত সেই চার্চের অনুমতি আনতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের অনুরোধে ফাদার অনুমতি দিলেন। এতদিন ঠাকুর গির্জায় গিয়ে কোন বিবাহ দেন নি। তিনি উৎসাহী হয়ে উঠলেন বিয়ের আসরে

মহামিলন মঠ ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

উপস্থিত থাকার জন্য। শেষে শুভ নববর্ষে ১ জানুয়ারি তাদের বিয়ে দিলেন ঠাকুর নিজে সামনে থেকে। চার্চের ফাদার বিবাহের আনুপূর্বিক ঘটনা বলে জন-লিখিত সুসমাচার থেকে এক পরিচ্ছদ পাঠ করলেন।

অবশেষে শপথ গ্রহণ। বেসিন ইংরেজিতে বললেন, আমি প্রভু যীশুর সামনে, আমার গুরুদেব ভগবানের সামনে লিউনিকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলাম। লিউনি বলল, ভগবানের সম্মুখে আমি এই বিবাহ-বন্ধন আকাঙ্ক্ষা করছি যাতে দিব্য প্রেম ও শক্তি উভয়ে আহরণ করতে পারি। সেই সঙ্গে দিব্য সত্তায় উভয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি।

অনুষ্ঠান শেষ হতে ঠাকুর একটি গরম শাল ও একটি সুন্দর নামাবলী ভগবান যীশুর পবিত্র অঙ্গে জড়িয়ে দিলেন পরম প্রেমের সঙ্গে। আর এক ঝুড়ি ফল মিষ্টি দিয়ে করলেন পুরোহিতবরণ। এরপর নবপরিণীতা পুত্র কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঘুরলেন জগন্নাথ মন্দির, গম্ভীরা, সিদ্ধকুল, ভারত সেবাশ্রম প্রভৃতি জায়গায়।

শুধু জাগতিক আনন্দই নয়। যোগক্রিয়া দান করে আনন্দ রাজ্যের নবদিগন্ত খুলে দিলেন ঠাকুর। তাঁদের নামকরণ করলেন যোগানন্দ ও যোগমায়া এই ধরনের বহু ঘটনাই তাঁর জীবনে ব্যাপৃত হয়ে রয়েছে। তাঁর সেই প্রেমের বাণী আমরা শিরোধার্য করে এখন এগিয়ে নিয়ে চলেছি সাধ্যমত। ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি দেশ থেকে দেশান্তরে।'

আরেকজন হলেন কিংকর মহিমানন্দ, যিনি দাদাজী নামে অভিহিত, তিনিও সীতারামের মহিমার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলেছেন, 'ঠাকুর সবসময় বলতেন তোরা আমার কি প্রচার করবি। আগে তোরা নিজেদের তৈরি কর। সব সময় মনে রাখবি আমার আদর্শ এবং পথে চললে নিজেকে তৈরি করতে পারবি। সদাচার, শুদ্ধ আহার, যথাকালে উপাসনা। এই তিনটি বিষয় কখনও ভুলিস না। ভুললে নিজেকে আদর্শ থেকে বিচ্যুত করবি।'

ঠাকুরের সঙ্গে সাধক মহাপুরুষদের আলোচনা প্রসঙ্গে দুটি কথা প্রধান হয়ে উঠেছে।
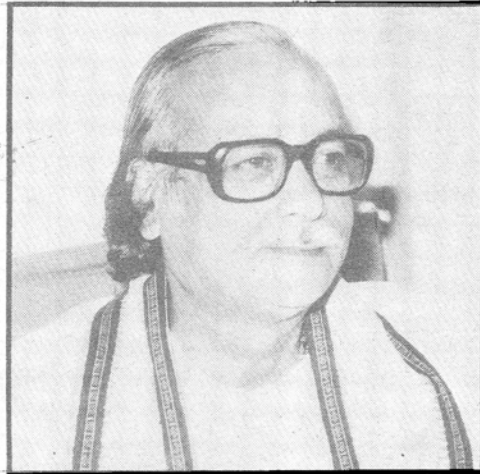
ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী

তাহলো—নামের কথা, আর নাদের কথা। এই নাম আর নাদকে যোগ করেছে প্রাণ। জগতের পরমতত্ত্বকে তিনি শেষপর্যন্ত ব্রহ্ম ঈশ্বর পুরুষ প্রকৃতি রাম কৃষ্ণ কালী আত্মা এইরূপ পক্ষপাত নিয়ে কিছুই বলেন নি, বলেছেন 'বাক' অথবা 'প্রাণ'। সীতারাম লিখেছেন—যেমন কানু ছাড়া গীত নেই, তেমনি প্রাণ ছাড়া কোন সাধন পদ্ধতি নেই। এই প্রাণই ভগবান।

জগতে যা কিছু সবই গুরু। সমস্ত জগতই গুরুময়। সেই এক এবং অদ্বিতীয়ের লীলাবিলাস বিশ্বভুবন। শ্রী ভগবানের এই বিশ্বরূপ দর্শন করে ভীত হয়ো না, বিষণ্ণ হয়ো না, মুগ্ধ বা ক্ষুব্ধ হয়ো না। জগতে যত রূপ সব তাঁরই রূপ, যত নাম সব প্রভুরই নাম। সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, বিরহ মিলন সবের মধ্যেই তিনি। সকল কিছুর মধ্যেই শ্বেতাম্বর—পরিহিত শ্বেত তিলক চর্চিত তুলসীমালা বিভূষিত শ্রীগুরু, পাদুকা ও ওঙ্কার দন্ডধারী সদাপ্রসন্ন মূর্তি শ্রী ভগবান গুরুদেবকে দর্শন করে তাঁর অমৃত ঝরানো পাদপদ্মে ধ্যানমগ্ন হয়ে যাও, তাঁর লীলাচিন্তনে বিভোর হয়ে যাও।

একই নিয়ম কানুনের বাঁধাধরা রাস্তায় চলতে চলতে দৈনন্দিন জীবন যখন প্রাণহীন রসহীন বোধ হয়, অবসাদগ্রস্থ মন নৈরাশ্যের বেদনায় যখন ভাবে এ পথ বুঝি ফুরোবার নয়, এ পথের লক্ষ্যস্থলে পৌছনো বুঝি সীমিত শক্তির সাধ্যাতীত, তখন সেই রসস্বরূপের সেই শ্রান্তিহারের শরণ গ্রহণ করো।

ঠাকুর এইভাবে মনসংযোগের কথা বলেছেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে নিজের চেতনায় প্রকাশ পেয়েছি। কর্মজীবনে নিজেকে একজন বিরাট কিছু বলে মনে হত। ভাবতাম আমার একটা কথায় একটা সিদ্ধান্তে এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে সে ভুল ভেঙে গেল। নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য বলে মনে হল। মাটির প্রদীপ যেমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সূর্যের দিকে আর নিজের ধৃষ্টতার পরিমাপ করে আমার অবস্থাও ঠিক সেই সময় তেমনি ঘটেছিল।

তামাম ভক্তমণ্ডলীর অভিজ্ঞতা সীতারামের মহিমাকে মহিমান্বিত করেছে, সন্দেহ নেই। তিনি লক্ষ ভক্তের আশ্রয়দাতা। ১৩৯০ সালে, ইংরেজির ১৯৪৩ সালের বৈশাখ মাসে পুরীধামে নাম সংকীর্তনের মাঝারি দল নিয়ে একজন সাধু জগন্নাথ দেবের মন্দির পরিক্রমা করছেন। বাঙালি, ডান পা খোঁড়া। সহসা কয়েকটি স্থানীয় উড়িষ্যাবাসী ছাপানো কাগজ বিলি করতে করতে তাঁর দলে যোগ দিল। কাগজে কি লেখা আছে, তা অবশ্য তিনি জানেন না। পরে জানতে পারলেন যে ওই প্রচারপত্রে তাঁর আবির্ভাবের কথা লেখা হয়েছে। বিস্মিত হলেন সাধুটি। এরা তাঁর পরিচয় জানল কি করে? সংবাদ নিয়ে তিনি আরও জানতে পারলেন, ওই ভক্তদের আশ্রমে রক্ষিত ৪০০ বছরের প্রাচীন পুঁথি থেকে তারা জানতে পেরেছেন পুরীতে এক মহামন্ত্র প্রচারকের আবির্ভাব এই সময় ঘটবে। এই কথা শুনে ভাব সমাধিতে ডুবে গেলেন। পরে পুঁথি থেকে পূর্বাশ্রমের নাম, জীবনের বর্ণনা, সম্প্রদায়ের কথা ইত্যাদি অবিকল বিবরণ জানা গেল। পুঁথিতে লেখা রয়েছে প্রভু স্বয়ং নরতনু ধারণ করে আবির্ভূত হবেন। পুঁথি অনুযায়ী সীতারামের আবির্ভাব ঘটেছিল বলে সাধারণ্যে পরিচিত।

দিব্যভাবে প্রেমোন্মাদ সীতারাম শুধু নাম মহিমায় ভাস্বর নন, প্রেমের পূজাতে তিনি এক পরম পূজারী। যে প্রেম অন্ধকে দৃষ্টি দান করে, অসহায়কে আশ্রয় দেয়। পুঞ্জীভূত যন্ত্রণাকে বিলীন করে দেয় তার প্রেমে। এখানে আত্ম নিবেদন করা মানে নিজের যাবতীয় যন্ত্রণাকে ভাসিয়ে দেওয়া। তিনি মুক্তির ডাক দিয়েছেন, এই পরম মুক্তিতে সাড়া যিনি দেবেন, তিনি আর পরমপ্রেমময় একাকার হবেন। এই প্রেম যে বিশ্বজনীন।

মণিশংকর দেবনাথ এবং
জ্যোতিপ্রকাশ ব্যানার্জি।

ছবি: সুস্মিতা চৌধুরী

৪৪ পৃষ্ঠার পর

দিন। এসময় আরেক রাজ্যসভা সদস্য রাম জেঠমালানীও এব্যাপারে খবরাখবর অর্থসচিবের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর চিঠির 'প্রাপ্তিস্বীকার' পর্যন্ত করা হয়নি। সন্দেহ করা হচ্ছে, অর্থমন্ত্রী এস বি চৌহান কিংবা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের থেকে ভেংকটরমনকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে জেঠমালানীর চিঠিটির প্রতি যেন নজর না দেওয়া হয়, স্বামীকেই বরং খবরগুলি জানিয়ে দেওয়া হোক।

আজ গোপীকৃষ্ণ অরোরা, মণিশংকর আয়ার, বি ভি কুমার কিংবা মোহন কাত্রের মত আমলাদের কি অবস্থা! প্রধানমন্ত্রী ও শাসকদলের সঙ্গে তাদের কাজকর্মের ধারা এমনভাবে চলেছে যে সরকার হঠাৎ বদলে গেলে ওঁদের চেয়ারের অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। সরকারী অফিসারদের গৌরবময় ভূমিকা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে চলেছে। অনেকে বলবেন, কয়েকজন দিয়ে পুরো ব্যাপারটিকে বিচার করা ঠিক নয়, বহু অফিসার রয়েছেন যাঁরা ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে স্বপদে বহাল রয়েছেন। কিন্তু ক্রম অবনতি ঘটছেই,

এইচ এল ভগৎ এবং গোপী অরোরা

একথা কেউ অস্বীকার করবেন না। আজ এল পি সিংহ, রাছোরপ্রসাদ কিংবা গোবিন্দনারায়ণের মত বিচক্ষণ আমলারাও এই পরিস্থিতিতে চুপচাপ। তাঁরা তো ভেংকটরমনের মত উত্তরাধিকারীদের এই কৌশলটুকু শেখাতে পারতেন যে, পদের মর্যাদাকে কিভাবে সবদিক বাঁচিয়ে রাজনৈতিক চাপ এড়িয়ে চলা যায়।

আমলাতন্ত্র স্থায়ী এবং বিধায়কতন্ত্র যেটা অস্থায়ী, এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কের সীমারেখা কোনটা। জনৈক সচিবের মতে, আচরণবিধি অনুযায়ী সাংসদদের সঙ্গে অফিসারদের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত নয়। অন্য এক সচিবের মতে 'সম্পর্কটা থাকা একদিক দিয়ে ভালই। যেমন যোজনা কমিশনের সদস্যরা সাংসদদের অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হতেও তো পারেন।' কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, এই সম্পর্কের অপব্যবহার ঘটছে। প্রাক্তন তথ্যসচিব এস এস গিল–এর মতে এমন সরকারী নির্দেশ আছে যে সাংসদ ও বিধায়কদেরকে সরকারী অফিসারদের সহযোগিতা করে চলতে হবে। তাতে জন প্রতিনিধিদের কাজকর্মে সুবিধে হয় অনেক। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, নেতাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কাজেও অফিসাররা সহযোগিতা চালিয়ে যাবেন। সেটা হলে তা হবে গণতন্ত্র ও প্রশাসন উভয়ের ক্ষেত্রেই আত্মঘাতী ব্যাপার। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর দিল্লির তৎকালীন মুখ্যসচিব সুশীলকুমারকে অন্ধ্রে বদলি করে দেওয়া হয়। তাঁর দোষ ছিল, তিনি নাকি জরুরী অবস্থার সময় গ্রেপ্তারী পরোয়ানার সাদা কাগজেই সই করেছিলেন। এই ডামাডোলে কখনো কখনো ভালো অফিসারদের কপালেও জোটে দুর্ভোগ। অর্থমন্ত্রকের সহসচিব ভুরেলালকে ভি পি সিংহের প্রস্থানের পর এনফোর্সমেন্ট ডাইরেকটরেট থেকে সরিয়ে অর্থমন্ত্রকের টাকশাল বিভাগের মত গুরুত্বহীন বিভাগে বদলি করে দেওয়া হয়। তিনি ভারত–সুইস বাণিজ্য বিভাগে ইন–চার্জ ছিলেন, অথচ তাঁকে সুইজারল্যান্ড যাবার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। রাজস্ব সচিব বিনোদ পাণ্ডেকে গ্রামীণ বিকাশ বিভাগে বদলি করাটা পদাবনতিই বলা যায়।

দিল্লিতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা স্পষ্টতত দুটি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেছেন। যাঁরা প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর অফিসের কাছাকাছি, দুই, যাঁরা স্বীয় যোগ্যতা অথবা বিশেষ কোন মন্ত্রীর কৃপায় উচ্চপদে আসীন। প্রথমশ্রেণীর কর্মচারীদেরই এখন রমরমা, সমালোচনাও শুনতে হয় তাঁদের। শোনা যায়, প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ এক সচিবের ছেলে ব্রিটেনের মেরিলিঞ্চ ফার্মে বার্ষিক ৬০ হাজার পাউন্ড বেতনে চাকরি করছেন, ঐ ফার্মটি এদেশের রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিস–এর উপদেষ্টা। ঐ চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে নাকি পদের প্রভাব খাটানো হয়েছে। রিলায়েন্সের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক আছে, এরকম আরেক সচিব মহোদয়ের জামাতা ঐ কোম্পানির কম্প্যুটার প্রিন্ট আউটের কাজের অর্ডার পেয়ে গেছেন।

ক্যাবিনেট সচিব বি জি দেশমুখ, বিদেশ সচিব কে পি এস মেননের ভাবমূর্তি আজও অম্লান। মেননের উত্তরাধিকারী এস কে সিংহকেও তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য প্রশংসা করা যেতে পারে। ডঃ স্বামী নাকি দেশমুখের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, দেশমুখ পাত্তা দেননি।

প্রাক্তন আই পি এস, কর্ণাটকের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল গোবিন্দ নারায়ণের মতে, 'রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাবার পর প্রশাসনে তাদের প্রভাব আবশ্যক হয়ে পড়ে। সৎ আমলা এবং অসৎ নেতা কখনো একসঙ্গে থাকতে পারে না। এস এস গিল সরকারী অফিসারদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। প্রথম, চলতি হাওয়ায় তাল মিলিয়ে চলেন যাঁরা, এঁরা চেয়ারের চেয়ে নিজের কথা ভাবেন বেশি। দ্বিতীয়, চুপচাপ বসে থাকেন যাঁরা, ভয়ে নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নেন না, অধীনস্থদের বলির পাঁঠা ভাবেন। আর তিন নম্বর, যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে কাজ করতে, পরিস্থিতি তাদেরকে সেরকম থাকতে দেয়নি।

দূরদর্শনের পূর্বতন মহানির্দেশক ভাস্কর ঘোষ নাকি দূরদর্শনের পর্দায় শাসকদল ও তার নেতাদের ব্যাপক কভারেজের ব্যাপারে আপত্তি জানানোয় ঐ পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। গিল–এর বক্তব্য, 'আমলাদের সামনে আদেশ পালন করা ছাড়া কোনো উপায় নেই, সেই আদেশ যদি অসাংবিধানিক কিংবা বেআইনি হয়, সেটা ভিন্ন।'

মুস্কিল হচ্ছে, অফিসারদের জন্য এমন কোন সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই যা দিয়ে তাঁরা বেআইনী নির্দেশ পালন করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। পদত্যাগ করা ছাড়া আর কি করতে পারেন তাঁরা। সে সাহস অল্প ক'জনেরই আছে।

ফেয়ারফ্যাক্স মামলার তদন্তকারী ঠক্কর–নটরাজন কমিশন এবং জরুরী অবস্থাকালীন অন্যায়গুলির তদন্তকারী শাহ কমিশনের কাছে প্রস্তাব এসেছিল, অফিসাররা শুধু লিখিত নির্দেশই পালন করবেন। এতেও অনেক অসুবিধে। সমাধানের একটা উপায় হতে পারে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এমন নিয়ম চালু করুন, অফিসারদের বদলি নিয়মিত রূপেই হোক, রাজনৈতিক কারণে নয়।

এসব সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে কেউ কেউ বলেন, মার্কিন ধাঁচে এখানেও অফিসার নিয়োগ চালু হোক। আমেরিকায় প্রতিটি নতুন রাষ্ট্রপতি নিজের পছন্দমতন শতকরা কুড়িজন অফিসার নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু জনৈক সচিবের মতে, এ ধরনের নিয়ম ভারতের মত বিচিত্র দেশে অচল, এতে জাতিবাদ, স্বজনপোষণ এসবই প্রশ্রয় পাবে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস–উপদেষ্টা সুমন দুবের মতে, 'আসলে প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক কম, এছাড়া প্রশাসন সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে বহু দূরে, এটাই সমস্যা।' কিন্তু তা তো সমস্যা নয়। উঁচুপদে পৌঁছানোর আগে অফিসারদের বহুদিন ধরে সাধারণ মানুষেরই কাছাকাছি থাকতে হয়।

প্রশাসনকে একবিংশ শতাব্দীর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে প্রচার করা হচ্ছে, আসলে ফেলে আসা ব্রিটিশযুগের দিকেই প্রশাসনের ঝোঁক, যাদের কাজ ছিল শাসকশ্রেণীর হাত শক্তিশালী করা। জনসেবাও নয়, দক্ষ প্রশাসনও নয়।

–পদ্মা শাস্ত্রী, সুধা ভাটিয়া

Casuals or Formals, That's Great Style !
An all occasion fabric that is crafted to finery. From awe inspiring range of formals to fun filled fabrics of casual wear. Mayur drapes all.
MAYUR®
Suitings • Shirtings
THAT'S GREAT STYLE!
A product of the Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd.
Mudra:A:RSW:4587
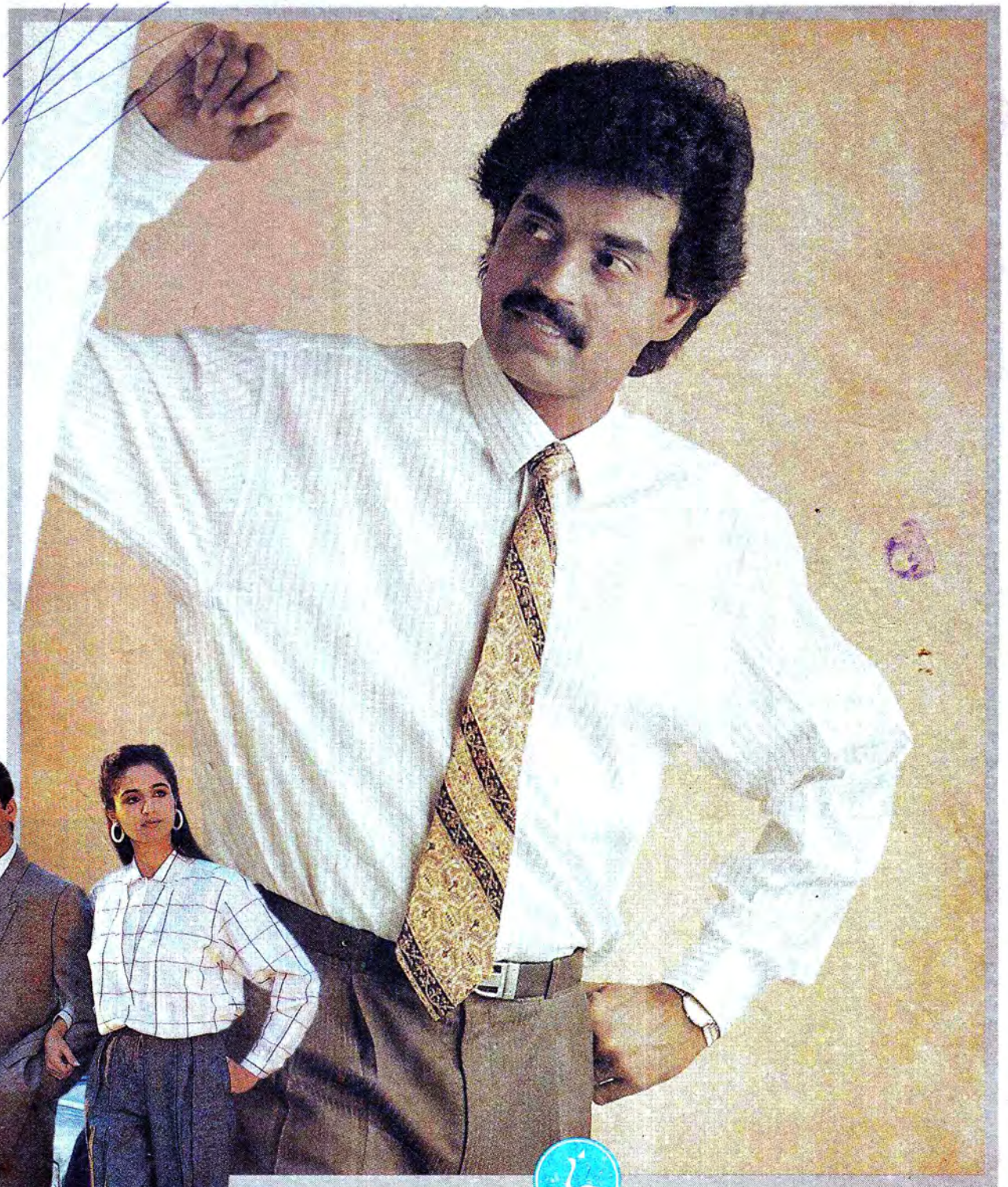
Regd. No. AD-212
Lic. No. U/AD-1
ALOKPAAT
June 1989
RNI No. RN 42171/86
Rs. 6.00 Per Copy